জন ও জনতা

(উপন্যাস)

মনোজ গুপ্ত

দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাবা ও মা'কে দিলাম

—এক—

নবাগত ব্যারিষ্টার অবনী গুপ্তর ছোট্ট মরিস গাড়ীখানা চৌরঙ্গির ওপর দিয়ে একটু আস্তেই যাচ্ছিল—অত আস্তে তার বয়েসের কোন ছেলেই চৌরঙ্গি দিয়ে গাড়ী চালায় না। ষ্টিয়ারিংএর ওপর একটা হাত রেখে অবনী তার সাগরপারের অভিজ্ঞতার কথা বলছিল—শ্রোতা অলকা—শ্রীমতী অলকা চৌধুরী, লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরীর মেয়ে আর অবনীর ভাবী স্ত্রী। অলকা একমনে শুনছিল অবনীর কথা, কতদিন সে তার কথা শোনে নি। এক একবার তার মনে হচ্ছিল স্মরণাতীত কোন যুগের শোনা কথার রেশ স্মৃতির সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আজ তার কানে এসে পৌঁচচ্ছে। অবনী ভাবতেই পারেনি অলকা এতটা নীরব শ্রোতা হতে পারে; সে আশা করেছিল আধুনিক যুগের চঞ্চল মেয়ে অলকা তার সজীবতা দিয়ে, তার উচ্ছলতা দিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে, তার একান্ত অবসরকে পরিপূর্ণ করে তুলবে; তবু তার বেশ লাগছিল। কথার মধ্যে কথার সূত্র হারিয়ে ফেলে অবনী বললে, "অমন করে মুখের দিকে চেয়ে থেক না, লোকে দেখলে কি ভাববে?"

"যা ভাবে ভাবুক, তুমি একটু সামনে দিকে চেয়ে গাড়ী চালাও—দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তো কোন লাভ নেই।"

"দুর্ঘটনা স্বেচ্ছায় ঘটাতে হলে জীবনের ওপর যেটুকু উদাসীনতা থাকা দরকার আমার তা নিশ্চয় নেই—তোমায় পাশে নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারতাম যদি এটা আমাদের "একসঙ্গে শেষ গাড়ী চড়া" হত। কবির নায়কের মত আমি ভাগ্যকে নির্ব্বিচারে মেনে নিতাম না; দু'জনে একসঙ্গে মরার মধ্যে কাব্য জগতে সার্থকতা হয়তো আছে কিন্তু…" তার কথা শেষ করা হল না, সামনে অনেক গাড়ী দাঁড়িয়েছিল তাই তাকে থামতে হল। তার গাড়ী থামতে একটী মেয়ে একটা টিনের বাক্স তার গাড়ীর মধ্যে

এগিয়ে দিলে; টিনের বাক্সের গায়ে লেখা ছিল, "শ্রমিকদের সাহায্য করুন।" যেদিক দিয়ে মেয়েটা বাক্সটা এগিয়ে দিলে সেদিকে অলকা বসেছিল। সে তার ছোট পার্সটা খুলে কি দিতে গেল, অবনী জিগেস করলে, "কি ব্যাপার ?"

মেয়েটা বললে, "শ্রমিক দিবস সাহায্য।"

অবনী বললে, "আমরা শ্রমিক নই।"

"সেই জন্যেই তো সাহায্য চাইছি—শ্রমিক শ্রমিককে কতটুকু সাহায্য করতে পারে ? আপনারা না দিলে···· " অলকা তার বাক্সে একটা টাকা দিয়ে দিলে—উদ্দেশ্য ঘটনার পরিসমাপ্তি কিন্তু তা হ'ল না। মেয়েটা নিচু হয়ে "ধন্যবাদ" বলতে তার মুখটা অবনী স্পষ্ট দেখতে পেলে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হওয়ায় এবং এই মেয়েটা তর্ক করায় সে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু তার বিরক্তি বিস্ময়ে পরিণত হ'ল মেয়েটাকে দেখে। সে বললে "ক্ষমা করবেন, আপনি কি মিস দত্ত নয় ?"

"আমার নাম মলিনা দত্ত কিন্তু আপনি আমাকে কি করে চিনলেন ?"

"অবনী গুপ্ত বলে কাউকে ··"

বাধা দিয়ে মলিনা বললে, "অবনী বাবু ? কি করে চিনব বলুন ? আপনাকে তো এ সাজে কখন দেখিনি।"

অবনী হাসতে, হাসতে বললে, "তাহলে তো আমারও আপনাকে না চেনাই উচিত ছিল—আপনাকে এ অবস্থায় দেখবার কল্পনা···"

অবনীর কথা শেষ হবার আগেই একজন সার্জেন্ট এগিয়ে এসে মলিনাকে বললে, "পয়সা সংগ্রহ করছেন করুন কিন্তু সে জন্যে গাড়ী চলাচল বন্ধ করতে পারেন না।" তার জবাব দিলে অবনী; সে বললে "দোষটা আমার এবং সে জন্যে আমি দুঃখিত।"

"আচ্ছা, এবার চলতে আরম্ভ করুন" বলে সার্জেন্ট চলে গেল। অবনী গাড়ীর দরজা খুলে বললে "আসুন"।

মলিনা আপত্তি করলে কিন্তু অবনী শুনলে না, মলিনাকে গাড়ীতে উঠতে হল। সামনের সিটে দু'জনের বেশী বসা যায় না তাই মলিনা ভেতরে বসল; অলকা নেমে তাকে সামনে জায়গা করে দিতে চেয়েছিল কিন্তু মলিনা রাজি হল না। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে অবনী বললে, "অলকা ইনি আমাদের কলেজে পড়তেন—অবশ্য আমার চেয়ে দু'বছরের জুনিয়ার ছিলেন। মলিনাদেবী, এর নাম অলকা—কুমারী অলকা চৌধুরী।"

তারা দু'জনে দু'জনকে হাত তুলে নমস্কার করলে; অবনী গাড়ীখানা বাঁদিকে একটা রাস্তায় রেখে মলিনার দিকে ফিরে বললে, "অনেকদিন পরে দেখা হ'ল, না?"

"হাঁ, কলেজের পর একবার ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের একটা মিটিংএ দেখা হয়েছিল, তারপর আর দেখা হয় নি।"

"এখন কোথায় যাবেন?"

"অক্‌টারলনি মনুমেন্টের তলায় মিটিং আছে।"

"কিসের মিটিং? শ্রমিকদের না কি?"

"হাঁ।"

"তাতে আপনার কি? আপনি তো আর শ্রমিক নয়?"

"সেই জন্তেই তো আমাদের যাওয়া দরকার—ওরা জানে কি?"

"ওদেশে কিন্তু শ্রমিকেরা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নেয় তাই তাদের আন্দোলনের মধ্যে দৃঢ়তা আছে, শক্তি আছে। আচ্ছা, আপনারা এদেশের শ্রমিকদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াতে চান কেন? আপনাদের কি অধিকার আছে?"

"অধিকার আমাদের নেই, আছে ওদের, আমাদের কাছ থেকে জোর

করে কাজ আদায় করবার। যুগের পর যুগ আমরা ওদের বঞ্চিত করে এসেছি ; আজ…" বাধা দিয়ে অবনী বললে, "ওটা আপনাদের নিজেদের কাজের কৈফিয়ৎ। আপনারা মনে করেন ওরা ওদের নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা বোঝে না, আপনারা বোঝেন ; তাই ওদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াতে চান। যারা ওদের খাটায় তারাও তাই মনে করে তাই ওদের কাজে লাগিয়ে লাভ করে, আপনারাও তাই করেন অবশ্য অন্য দিক দিয়ে, অন্য কারণে কিন্তু প্রভেদটা কি ? দুই তো এক্সপ্লয়টেশান। ওদেশে শ্রমিক সঙ্ঘের মধ্যে বাইবের লোকের প্রবেশ করবার উপায় নেই।"

"আপনারা এসব বিষয়ে ইউরোপে অনেক দেখছেন, আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জানেন ; আপনাদের উচিত আমরা, যারা জানি না, তাদের সাহায্য করা, শিখিয়ে দেওয়া ; তা তো করবেন না। আপনি এ দেশের শ্রমিকদের অবস্থা জানেন না তাই আমরা তাদের মধ্যে আছি বলে আপত্তি করছেন, তাদের সঙ্গে পরিচয় হলে আর তা বলবেন না। কি করে বেঁচে থাকতে হয় তাই ওরা জানে না, নিজেদের মানুষ বলে ভাববার সাহস পর্য্যন্ত ওদের নেই। যদি কোনদিন কুলি লাইনে কিংবা বস্তিতে ঢোকেন তাহলে বুঝতে পারবেন।"

"হতে পারে আপনি যা বলছেন সবই সত্যি কিন্তু আমি বলতে চাই পরোপকারটাই আপনাদের আসল উদ্দেশ্য নয় ; তা যদি হত তাহলে যেখানে লোকের হাততালি পাবার আশা নেই, ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই সে সব দিকেও আপনাদের দেখতে পাওয়া যেত। বাঙালী গৃহস্থের অবস্থার কথা আপনারা কখন ভেবে দেখেছেন ? তাদের দুঃখ কা'র চেয়ে কম নয়। তাদের কথা ভাববার……"

"আপনি ভুল করেছেন অবনী বাবু। তাদের শিক্ষা আছে সংস্কার

আছে, সমাজ আছে, যোগ্যতা আছে; তারা যদি নিজেদের চালিয়ে নিয়ে যেতে না পারে তাহলে দোষ তাদের নিজেদের।"

"দোষ কাদের সে কথা বলছি না, বলছি তাদের অবস্থার কথা। তাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনের দরকার আছে অস্বীকার করতে পারেন?"

"না তা পারি না" বলে মলিনা ঘড়ি দেখলে।

অবনী জিগেস করলে, "দেরী হয়ে গেছে না কি?"

"না দেরী হয় নি তবে আর সময় নেই।"

অবনী গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে বললে "আসল কথা আপনাদের শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের জন্যে থোড়াই কেয়ার করেন; তাঁরা চান শ্রমিকদের সাহায্যে ক্ষমতা; তাদের কাজে লাগান্—যেমন আগেকার যুগে কংগ্রেসের নেতারা লাগাতেন ছাত্রদের।"

একখানা প্রকাণ্ড গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগতে, লাগতে বেঁচে গেল। অলকা বললে, "গাড়ী চালান আর তর্ক করা একসঙ্গে সম্ভব এমন কথা নেপোলিয়নও বলেন নি।"

অবনী আর মলিনা একসঙ্গে হেসে উঠল। বড় গাড়ীখানা একটু আগে গিয়ে থামল। মলিনা বললে, "আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমায় নামিয়ে দিন, ঐ গাড়ীখানায় যেতে পারব। উনি আজকের সভার সভাপতি, আমাদের শ্রমিক সঙ্ঘের ও সভাপতি।"

অবনী গাড়ী থামাতে মলিনা নেমে গেল। অবনী আর অলকাকে নমস্কার করে সে বললে, "আপনার ঠিকানাটা কি অবনীবাবু? বলতে আপত্তি নেই তো?"

"না আপত্তি আর কি? তবে কাজে লাগবে না।"

"কোনটা কোন সময় কাজে লাগে তা কি বলা যায়?"

অবনী তার একখানা কার্ড মলিনাকে দিলে, সে আর একবার নমস্কার

করে চলে গেল। মলিনা সেই বড় গাড়ীখানায় ওঠার সঙ্গে, সঙ্গে সেখানা খুব জোরে বেরিয়ে গেল।

মলিনাদের অপস্রিয়মান গাড়ীখানার দিকে চেয়ে অবনী বললে, "আশ্চর্য্য মেয়ে। এতবড় পরিবর্ত্তন ওর জীবনে কি করে এল? কলেজে ছিল নাম-জাদা ভাল ছাত্রী; রোজ বাড়ী যাবার সময় একগাদা করে বই লাইব্রেরী থেকে নিয়ে যেত, আমরা অর্থাৎ শয়তান-মার্কা ছেলেরা বলতাম নাড়ুগোপাল যাচ্ছে, চুপ করে শুনে যেত। কোনদিন কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলে নি। একদিন একজন একটা ক্যামেরা নিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'ফটো তুলব', তখন যদি ওর অবস্থা দেখতে। না পারে তাকে কিছু বলতে, না পারে পালাতে, কেঁদে ফেলেছিল আর কি।"

অলকা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। একটু খোঁচা দেবার জন্যে বললে, "স্মৃতির সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছ দেখছি, কোথাও কোন কাঁটা নেই তো?"

অবনী হাসতে, হাসতে বললে, "ভয় নেই, অতদূর পর্য্যন্ত যায় নি। গেলে কি আর ফিরে আসতে পারতাম?"

অলকা বললে, "ভয়টাই বা কি?"

"নিঃসন্দেহ থাকতে পার; ও নিজেই ছিল তার প্রতিষেধক—আসল কথা কি জান? ওর মধ্যে একটা সচেতন মানুষ আছে এ কথা একবারও মনে হত না আর তার কোন চিহ্ন ও খুঁজে পেতাম না।"

"পেলে কি হত বলা যায় না; কি বল?"

এবার অবনী অলকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বললে, "বলা সত্যিই যায় না। সে রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারত—জীবনটা কতকগুলো অস্বাভাবিক ঘটনার সমষ্টি ছাড়া তো কিছু নয়।"

অলকা হাসতে, হাসতে বললে, "তা জানি না, তবে তুমি আজ যে

রকম অতীতের মধ্যে ডুব দিয়েছ তাতে গাড়ী চালাবার সময় দুর্ঘটনা না ঘটালে বাঁচি।"

অবনী কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বললে, "তুমি দেখছি বেজায় দুষ্টু হয়েছ।" একটু থেমে বললে,—"চল না গড়ের মাঠে ওদের মিটিং দেখে আসি।"

অলকা হাসতে, হাসতে বললে, "জানতাম শেষ পর্য্যন্ত এ খেয়াল হবে। একটা কথা বলে দি, এ দেশটা ইউরোপ নয়, এখানে শ্রমিক নিয়ে বেশী লাফালাফি করা বেশ নিরাপদ নাও হতে পারে।"

"আমার সে ইচ্ছে মোটেই নেই আর আমার এই ছোট্ট গাড়ীখানা তার উপযুক্ত স্থানও নয় নিশ্চয়।"

"আমার মনে হয় না যাওয়াই ভাল।"

"এক সময়কার নাড়ুগোপাল আজকাল সত্যিই মিটিংএ বক্তৃতা করে কিনা আর করলে তাকে কি রকম দেখায় তা দেখবার লোভ সামলাতে পারছি না। ভয় নেই গাড়ী থেকে নামব না।"

"তবে গিয়ে কি হবে? কথাই যদি শুনতে না পাও..."

"শোনবার আছে কি? কি বলবে এখানে বসে তা সব বলে দিতে পারি—দরকার হলে ও রকম ডজন, ডজন বক্তৃতা আমি ও যে না দিতে পারি তা নয়।" অবনী গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলে।

অক্‌টারলনি মনুমেন্টের তলায় অসম্ভব ভিড; দেখা যাচ্ছে শুধু মানুষের মাথা, কত হাজার তা বোধহয় খবরের কাগজওয়ালারা ও আন্দাজ করে উঠতে পারবে না। অবনী তার গাড়ীখানা উত্তর দিকের রাস্তায় দাঁড করালে কিন্তু কিছু দেখতে পেলে না। গাড়ী থেকে নেমেও একবার চেষ্টা করলে কিন্তু কোন লাভ হল না। শেষে সে বিরক্ত হয়ে বললে, "না, তাকে দেখতেই পেলাম না, চল।"

অলকা কোন কথা বললে না। তাদের গাড়ী গড়ের মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

—দুই—

লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরীর বাড়ী সেদিন একটা ছোট, খাট পার্টির ব্যবস্থা হয়েছিল। খুব ছোট পার্টি, অতি নিকট আত্মীয় বন্ধু নিয়ে; বাড়ীর বাইরে থেকে কোন উৎসবের সন্ধান পাওয়া যায় না। দরজার সামনে রাস্তায় অজস্র গাড়ী দাঁড়ায় নি, লোকের ভিড় নেই, কোলাহলও নেই। লক্ষ্মীকান্তকে যারা জানে তারা এ রকম একটা পার্টির আয়োজন তাঁর বাড়ীতে হচ্ছে শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, বিশেষ যদি শোনে এ পার্টির সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ে অলকার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকখানি সম্বন্ধ আছে।

পার্টি লক্ষ্মীকান্তর বাড়ী প্রায়ই হয় আর সে পার্টিতে আসে না কলকাতায় এ রকম বড় লোক খুব কমই আছে। আয়োজন তার যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, অপব্যয় ও তেমনি প্রচুর; তাতে তাঁব আসে যায় না। তিনি তো আর সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে অবসরের সময় সরকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শ'কতক টাকা পেন্‌সানের ওপর ভরষা করে বালিগঞ্জে বাড়ী করেন নি··· যাক্, সে ইতিহাসের প্রয়োজনও এখানে নেই আর এটা তার উপযুক্ত জায়গাও নয়। তাঁর বাড়ীতে একটা ছোট পার্টি হচ্ছে আর সে পার্টিতে আছেন তাঁর কয়েকজন বন্ধু, অলকাব কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবী আর একজন পুরোহিত।

প্রকাণ্ড হল ঘরটা নতুন করে সাজাবার চেষ্টা করলেও তাকে নতুনত্ব দেওয়া যায় নি কারণ যতদূর সম্ভব দামী জিনিষ দিয়ে সেটা অনেক আগে থেকেই বোঝাই করা হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড অয়েল· পেন্‌টিং থেকে আরম্ভ করে, ঝাড় লণ্ঠন, হাতির দাঁতের জিনিষ, ল্যাসারাসের বাড়ীর আসবাবপত্র কিছুরই অভাব নেই। এত বড় ঘরটায় এই ক'জন লোক যেন মানাচ্ছিল না।

লক্ষ্মীকান্ত ব্যস্ত হয়ে বাব কতক ঘড়ি দেখেছেন, চাকরদের ডেকে

জিগেসও করেছেন, নিজেও ঘরের বাইরে গিয়ে খোঁজ করে এসেছেন কিন্তু যাকে নিয়ে আজকের এই উৎসব আয়োজন সেই অবনী এখনও এসে পৌছয় নি। আর একবার ঘড়িটা দেখে লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "আচ্ছা ছেলে তো। অন্য দিন ঠিক সময়ে আসে আর আজ পাঁচজন ভদ্রলোক আসবেন, একটা বিশেষ ওহে ভট্‌চায্‌ একবার পাঁজিখানা দেখ না, আর কতটুকু সময় আছে।"

পুরোহিত মশায় পাঁজির পাতা ওল্‌টাতে আরম্ভ করলেন, যেন কতটুকু সময় বাকি আছে তা তাঁর জানা নেই। লক্ষ্মীকান্ত নিজের মনে বলে যেতে লাগলেন, "দেরী করা বাঙ্গালীর স্বভাব, তা সে বিলেতই যাক আর···"

ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু মিষ্টার দত্ত বললেন, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন হে? সে ঠিক সময়েই আসবে। আগ্রহটা তারও তো বড় কম নয়।"

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "তা হলে কি হয়, ছেলে ছোকরার কাজ, বললেই হল একটু দেরী হয়ে গেল। ক্রিয়া, কর্ম্মের যে একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম আছে, পাঁজি, পুঁথি আছে তা তারা মানতেই চায় না।"

ব্যারিষ্টার মিষ্টার সেন বললেন, "আশ্চর্য্য, লক্ষ্মীকান্ত আমরা আর সব ছেড়েও এখনও ঐ পাঁজি, পুঁথিগুলো ছাড়তে পারলাম না।" ৮/৯৩

বাইরে গাড়ী থামার আওয়াজ হল। লক্ষ্মীকান্ত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন; সঙ্গে, সঙ্গে অবনী এসে ঘরে ঢুকল। লক্ষ্মীকান্ত বললেন, 'এত দেরী করলে যে?" জবাব দিলেন মিষ্টার রায়, লক্ষ্মীকান্তর আর একজন বন্ধু; তিনি বললেন, "দেরী এক মিনিটও হয় নি, সাড়ে পাঁচটায় আসবার কথা তো, সাড়ে পাঁচটায়ই এসেছেন।" বিরক্ত হয়ে লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "ও সব সাহেবিআনার কোন মানে হয়? এতগুলো ভদ্রলোক অপেক্ষা করে বসে রয়েছে, দু' পাঁচ মিনিট আগে এলে আর ক্ষতিটা কি হয়েছিল? এটা তো আর বিলেত নয়। নাও হে ভট্‌চায্‌ সব ঠিক করে নাও, আর

দেরী নয়। কৈ, অলিও তো এখনও আসে নি। না, জ্বালালে।" তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, একটু পরেই মিনতি, অণিমা, লিলি, সুমিত্রা প্রভৃতি অলকার বান্ধবীরা তাকে নিয়ে এল ; তাদের পেছনে এলেন লক্ষ্মীকান্ত।

অজয়, অনিল, সুরেশ, রমেন যারা অলকাকে হাজার বার দেখেছে তারাও তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। অবনী ভাবলে অলকা আজ তার কাছে নতুন করে আত্ম-প্রকাশ করছে।

মিনতি বললে, "কোথায় ভাবলাম অবনীবাবু আজ সকাল থেকে এসে বসে থাকবেন তা নয় একেবারে · "

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে লিলি বললে, "শারীরিক উপস্থিতিটাই তো আর সব চেয়ে বড় জিনিষ নয়।"

সুমিত্রা বললে, "বলিস কি ? কায়া ছাড়া ছায়ার কোন দাম আছে না কি ?"

লক্ষ্মীকান্ত তাদের মাঝখানে এসে বললেন, "তোমরা আবার দেরী করে দিচ্ছ কেন ? একেই তো নাও না হে রায় যা বলবার বলে নাও না ! আসল কাজটা·· " মিষ্টার রায় উঠে দাঁড়িয়ে, গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "আপনারা সকলেই জানেন অবনী বিলেত যাবার আগে থেকে অলকার সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। তার বিলেত যাওয়ার জন্যেই বিয়েটা এতদিন স্থগিত ছিল ; এখন আর কোন বাধা নেই। আমাদের সকলের ইচ্ছে এন্‌গেজ্‌মেন্টটা অর্থাৎ আশীর্ব্বাদটা আজই হয়ে যাক।"

সকলে হাততালি দিয়ে উঠল। লক্ষ্মীকান্ত পুরোহিতকে বললেন, "তাহলে তুমি আরম্ভ করে দাও ভট্‌চায্‌ !" প্রথমে পুরোহিত, তারপর লক্ষ্মীকান্ত অলকা আর অবনীকে আশীর্ব্বাদ করলেন, তারপর অবনী

অলকাকে আশীর্বাদ করে নিজের হাতের আংটীটা খুলে তার হাতে পরিয়ে দিলে। অলকা তাকে প্রণাম করতে সে পেছিয়ে গিয়ে বললে, "ও গুলো বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে অলকা, আজকাল ওভাবে ভক্তি না দেখালেও চলে।" লক্ষ্মীকান্তব বন্ধুরা অবনীর করমর্দ্দন করে তাকে শুভেচ্ছা জানালেন।

মিনতি বললে, "পুরুষ হলে আমি আপনাকে হিংসে করতে বাধ্য হতাম অবনীবাবু। অলকার মত মেয়েকে স্ত্রীরূপে লাভ করা ভাগ্যের কথা।"

লিলি বললে, "তুই না করলেও হিংসে করবার লোকের অভাব হবে না। যারা ওর হৃদয়ের রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করে ব্যর্থ হয়েছে তারা তো হিংসেয়…"

অজয় এগিয়ে এসে বললে, "নিশ্চয় নয়। অবনীবাবুর সৌভাগ্যটা সহজভাবে উপভোগ কববার ক্ষমতা আমাদের আছে ; তা না হলে আজকের এ নিমন্ত্রণ নিতাম না। অদূর ভবিষ্যতের নব-দম্পতিকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

অজয়, অনিল, সুরেশ, রমেন ও আরও অনেকে অবনী আর অলকার করমর্দ্দন করলে।

পুরোহিত মহাশয় বললেন, "তাহলে বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেললে হ'ত না ?"

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "যে ক'দিন নেহাৎ অপেক্ষা না করলে নয়, কি বল অবনী ?"

অবনী বললেন, "আপনারা যেমন ঠিক করবেন।"

মিষ্টার রায় বললেন, "তার আগে তোমায় একবাব অবনীর মা'র কাছে যেতে হবে হে।"

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "তা তো যাবই। খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে তোমার মা'র অমত নেই তো?" অবনী মাথা নেড়ে জানালে যে তার মা'র অমত নেই।

পুরোহিত মশায় বললেন, "তাহলে ২১শে তারিখটাই কি ঠিক হবে?"

মিষ্টার রায় বললেন, "২১শে কি বার?"

পুরোহিত একটু হেসে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ সে ঠিক আছে, রবিবার।"

সকলেই ২১শে তারিখটা পছন্দ করলেন। লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "তাহলে একটু মিষ্টি মুখ…"

মিষ্টার রায় বললেন, "সেটা আর তোমার বাড়ীতে কবে না হয়? চল হে চল।" তিনি এগিয়ে গেলেন, তাঁর পিছনে অতিথিরা, শেষে অলকা, অবনী আর লক্ষ্মীকান্ত।

বাগানে অনেকগুলো ছোট, ছোট টেব্ল পাতা, তার ওপর সাদা টেব্ল ক্লথ, ফুলদানে টাটকা ফুল, টেব্লের দু'দিকে দু'খানা করে চেয়ার। প্রত্যেক টেব্লে একজন করে পুরুষ আর একজন করে মহিলা, 'বয়' খাবার দিতে আরম্ভ করলে, পিছনে হালকা যন্ত্র সঙ্গীত সুরু হল। পরস্পরের মৃদু গুঞ্জন, টুকরো কথা, চাপা হাসি, দামী সেণ্ট আর সিগারেটের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসতে লাগল, আস্তে আস্তে বাগানে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। সকলের অসাক্ষাতে অলকা আর অবনী সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ীর পিছনের বাগানে এসে অলকা বললে, "পালিয়ে এলে যে?"

অবনী বললে, "সেই কথাটা তো তোমায়ও জিগেস করতে পারি।"

"ওখানে অত লোকের মধ্যে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। লোকাচারের রূঢ়তা এ সময় সহ্য হয় না। মনে হচ্ছিল শুধু তোমাতে, আমাতে সম্পূর্ণ লোকাতীত কোন জায়গায় গিয়ে বসে থাকি, যেখানে পৃথিবীর কোলাহল নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, সংশয় নেই।"

"তুমি যে কবি হয়ে উঠলে অলি। আমার জীবন কিন্তু নীরস বাস্তব নিয়ে, তার মধ্যে কবিতার স্থান নেই, হয়তো তোমার কবিতাও শুকিয়ে যাবে।" তারা দু'জনে পাশাপাশি একখানা বেঞ্চে বসল। অলকা বললে, "কাব্যের কবিতা হয়তো সহজে শুকিয়ে যায়, কিন্তু জীবনের কবিতা অত সহজে শুকিয়ে যায় না সে বিশ্বাস আমার আছে; আর যদিই যায় বুঝব তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে দেবেনা বলেই সে শুকিয়ে মরেছে।"

অবনী বললে, "তোমায় একটা অপ্রয়োজনীয় কথা জিগেস করব?"

অলকা হাসতে, হাসতে বললে, "বিলেত থেকে এসে পর্য্যন্ত তো কত কথাই জিগেস করছ, সবই কি তোমার মতে প্রয়োজনীয় কথা? না হয় তার সংখ্যা আর একটা বাড়ল; ক্ষতি কি?"

একটু চুপ করে থেকে অবনী বললে, "আমায় তুমি নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পেরেছ?"

অলকা জোরে হেসে উঠে বললে, "না মেনে উপায় কি বল? সামনে ছ'ফুট লম্বা একজন পুরুষ বসে, তাকে না মেনে নিলে চলে?"

অবনী অলকাব হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, "দুষ্টুমি কোর না।"

অলকা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললে, "দুষ্টুমি কে করছে? অন্ধকারে যা শোভন, আলোয় তা লজ্জা পায়।"

"অন্যায় তো কিছু করি নি।"

"ঠিক জান অন্যায় কর নি?"

"আমার অনুপস্থিতিতে যদি আর কার কাছে ধরা দিয়ে না থাক।"

"সে উপায় রেখেছিলে কি? কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথা বলতে পার?"

"সন্দেহ হয় না কি? দেখ, যে যুগে বিলেত গেলে ছেলেরা মাথায় ঠিক

রাখতে পারত না, আমরা সে যুগের ছেলে নই ; আমরা চশমা পরি বটে তবে সাদা কাঁচের চশমা।"

বাগানের আলোগুলো জ্বলে উঠল।

অলকা বললে, "কতদিন পরে এইখানে, এমনিভাবে পাশাপাশি বসেছি বল তো ?"

"সে অন্য এক যুগের কথা বলে মনে হয়। সেদিন আর এদিনে কি তফাৎ বলতে পার অলকা ?"

"সেদিন তুমি ছিলে দৈনন্দিন সূর্য্যোদয়ের মত নিশ্চিত আর আজ দূরত্বের মধ্যে দিয়ে হয়েছে সুন্দর।"

অবনী অলকাকে কাছে টেনে বললে, "সত্যিই তুমি কবি হয়ে উঠেছ। লিখছ না কি ? আয়োজন তো সবই ছিল—কলেজে পড়া, প্রবাসী বন্ধু, এয়ার মেলের চিঠি।"

হাসতে, হাসতে অলকা বললে, "কিন্তু আসল জিনিষটাই ছিল না—লেখবার ক্ষমতা। সে যাই হোক—ঠিক বলেছি কি না বল ?"

"না বলতে পার নি ; সেদিন তুমি ছিলে আমার কাছে সাধনার বস্তু, অনিশ্চিত আকাঙ্খা..."

তাকে বাধা দিয়ে অলকা বললে, "আর আজ হয়েছি সুনিশ্চিত অভিশাপ, না ?"

অবনী বললে, "তোমাকে অভিশাপ ভাববার মত অন্তরের দৈন্য যেদিন আমার আসবে সেদিন আমি হয়ে উঠব তোমার জীবনের সত্যিকার অভিশাপ। আজ মনে হচ্ছে তোমায় চাইবার অধিকার আমার আছে, সেদিন একথা ভাববার সাহস পর্য্যন্ত ছিল না।"

"তোমার দাম কি তোমার ঐ সাগর পারের ছাপগুলো দিয়ে ঠিক করে নেওয়া হবে ?"

"তোমার কাছে আমার দাম কি দিয়ে ঠিক হবে তা জানি না, তবে অনেকের কাছে ঐ ছাপগুলো দিয়েই হয়। ওর পেছনে অনেক কথা আছে, বাবার বিলেত পাঠাবার যোগ্যতা, আমার ভবিষ্যৎ "

অলকার মনে পড়ে গেল লক্ষ্মীকান্ত অবনীকে বিলেত যাবার জন্যে জোর করেন। সে বললে, "এখনও আগের মত খোঁচা দিয়ে কথা বলা অভ্যেস আছে দেখছি।"

অবনী বললে "স্বভাব অত সহজে বদলায় না—এই সহজ সত্যটা আজও শেখ নি? বাইরের সংঘাতে স্বভাবের পর্দায় রং হয়তো একটু লাগে কিন্তু সে রং জল লাগলেই উঠে যায়।"

"সুন্দর করে কথা বলতে শুধু আমিই শিখিনি তাহলে?"

অলকা আবার হেসে উঠল।

অবনী সে হাসিতে যোগ দিয়ে বললে, "সেটা কি আমার অপরাধ? সুন্দর লোক পাশে থাকলেই সুন্দর করে কথা কইতে হয়।"

"শেষে কি খোসামোদ আরম্ভ করলে?"

"আর সব অস্ত্র যখন শেষ হয়ে যায় তখন ঐ তো হচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্র, মেয়েদের মন জয় করবার।"

"তোমার তো আর তার দরকার নেই।"

"নিজের ভাগ্যের ওপর বেশী বিশ্বাস থাকা ভাল নয়, ভাগ্য-বিপর্য্যয় হতে মোটেই সময় লাগে না।"

"তাই না কি?"

"তা ছাড়া আর কি?" জান তো চাণক্য··"

"যথেষ্ট হয়েছে থাম; চাণক্য এ যুগে অচল; এটা রবি-শরৎ-শ'-রাশেলের যুগ। যাক্ তোমার সে বান্ধবীটার খবর কি?"

"কি কোরে জানব?"

"কার্ড নিয়ে গেল, আসে নি ?"

"এলে নিশ্চয় জানতে পারতে।"

তাদের একাকিত্ব আর বজায় রইল না—

মিনতি, লিলি, সুমিত্রা, অজয় অনিল প্রভৃতি সকলে এসে উপস্থিত হল ; এ রকম করে পালিয়ে আসার জন্যে অনুযোগ করতে লাগল, শেষে তাদের টেনে নিয়ে গেল উৎসবের কোলাহলের মধ্যে।

—তিন—

অবনী মলিনাকে সেদিনকার মিটিংএ না দেখতে পেলেও সে সেখানে ছিল। শ্রমিকদের মধ্যে তার স্থানটা যে ঠিক কি তা হয়তো কেউই জানত না তবে তাকে না নিয়ে ব্রজেশ দত্ত এ সব কাজে বড় একটা এগুতেন না। লোকে বলত মলিনা ব্রজেশ দত্তর ডান হাত; "নিখিল ভারত শ্রমিকোন্নয়ন সঙ্ঘের" স্থায়ী সভাপতি ব্রজেশ দত্তর ডান হাত হওয়াটা অনেক শ্রমিক নেতাই ভাগ্যের কথা বলে মনে করেন, এমন কি বাঁ হাত হতে পারলেও অনেকের আপত্তি ছিল না—এ হেন ব্রজেশ দত্ত না কি সব বিষয়ে মলিনার মতামত নিয়ে কাজ করেন। কাজেই কর্ম্মী ও নেতা মহলে মলিনার বেশ একটু প্রতিপত্তি ছিল।

মলিনা না গেলে এত বড় শ্রমিক সভাটা যেন প্রাণহীন হয়ে যেত। সে শুধু যায়নি, বক্তৃতাও করেছিল—অবনীদের কলেজের নাড়ুগোপাল বেশ চমৎকার বক্তৃতাই করেছিল। সেদিনকার সভার উদ্দেশ্য ছিল কিছু টাকা সংগ্রহ করা ; একটা কাপড়ের মিলের শ্রমিক প্রায় একমাস ধর্ম্মঘট করেছে—অবশ্য নিখিল ভারত শ্রমিকোন্নয়ন সঙ্ঘের পরামর্শ নিয়ে

এমন কি তাদের ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য করা হয়েছিল বললেও অন্যায় হয় না। অন্য শ্রমিকদের সাহায্যে এতদিন কোন রকমে চলে এসেছে কিন্তু আর চলে না। তারা কোন সময়েই সুখে থাকে না এ কথা ঠিক কিন্তু নিজেদের রোজগারে যে,টুকু স্বাচ্ছন্দ্য তাদের থাকে, অন্যের সাহায্যের ওপর' নির্ভর করে থাকতে হলে সেটুকুও ছাড়তে হয়, তাছাড়া যারা তাদের সাহায্য করছিল তাদের অবস্থাও এমন নয় যে এতগুলো লোককে বেশীদিন সাহায্য করতে পারে। তার ওপর রেলের শ্রমিকরাও ধর্ম্মঘট করেছে, তাদেরও সাহায্য করতে হচ্ছে অথচ মিলের মালিকরা একটুও নামে নি। মালিকদের সঙ্গে তাঁর যা কথাবার্ত্তা হয়েছিল ব্রজেশ দত্ত সেদিনকার সভায় তা সকলকে জানালেন ; তাতে আশার চেয়ে নিরাশার উপাদানই বেশী ছিল ; অবশ্য তিনি এ কথাও বললেন যে মালিকদের এ মনোভাব বেশী দিন বজায় থাকতে পারে না যদি শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট চালিয়ে যেতে পারে।

বিপদ হচ্ছে ধর্ম্মঘট চালিয়ে যাওয়া। শ্রমিকদের এমন কিছু সঞ্চয় থাকে না যার ওপর নির্ভর করে তারা মালিকদের জব্দ করবার চেষ্টা করতে পারে অথচ আরও কিছুদিন ধর্ম্মঘট না চালাতে পারলে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হবে না। ধর্ম্মঘট চালাতে হলে অর্থের প্রয়োজন তাই ব্রজেশ দত্ত সকলের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা প্রায় সকলেই শ্রমিক আর বেশীর ভাগ হচ্ছে সেই ধর্ম্মঘট-করা মিলের শ্রমিক, তাই যা আদায় হ'ল তা অতি সামান্য, তাতে অতগুলি শ্রমিকের বেশীদিন চলে না।

ক'দিনের মধ্যে এমন অবস্থা এল যে শ্রমিকদের আর বোঝান যায় না ; তারা ধর্ম্মঘট শেষ করে দিতে চায়, তাতে তাদের বরাতে যাই থাক। ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখে মানুষ বর্ত্তমানের অভাব ভুলতে পারে কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। লোকে কথায় বলে 'পেটের দায় বড় দায়'—

অনাহার ততক্ষণই সহ্য করা যায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেটা মানুষের সহ্য করবার শক্তির মধ্যে থাকে, তার বাইরে গেলে মানুষ তার শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি, বিবেক সব ভুলে যায়। তখন তার সঙ্গে জানোয়ারের আর কোন পার্থক্য থাকে না। এ দেশের শ্রমিকদের জীবনে সব চেয়ে বড় প্রহসন হচ্ছে এই যে, যে অন্নের অভাবে তারা ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য হয় সেই অন্নেরই অভাবে তাদের ধর্ম্মঘট বন্ধও করতে হয়।

এ শ্রমিকদের ও সেই অবস্থা এসেছে, সে কথা শ্রমিকরা জানে, তাদের নেতারাও জানে আর মিলের মালিকরাও জানে, জানে বলেই মালিকরা হাজার, হাজার টাকা ক্ষতি সহ্য করেও চুপ করে বসে আছে—অন্ততঃ ব্রজেশ দত্ত তাই বলেন। তিনিও তাই আরও ক'দিন ধর্ম্মঘট চালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কিন্তু মলিনা আগের দিন রাত্রে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছে তাতে তারা সাহায্য না পেলে আর একদিনও ধর্ম্মঘট চালাতে পারবে না। খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে তারা মিলে ফিরে যাবে আর এ অবস্থায় ফিরে গেলে তাদের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকবে না।

ব্রজেশ দত্তকে সে রাত্রেই মলিনা খবর দিয়েছিল, তিনি সারা রাত ভেবে একটা কিছু ঠিক করবেন বলেছিলেন; কি ঠিক করেছেন জানবার জন্যে মলিনা সকাল বেলাই তাঁর বাড়ীতে এল—তার সঙ্গে ছিল সঙ্ঘের সম্পাদক কমল।

ব্রজেশ বাবুর তখনও চা খাওয়া শেষ হয় নি; একবার মলিনা আর কমলকে চা খাবার জন্যে অনুরোধ করলেন, তারা চা খাবে না বলতে নিজে খেতে আরম্ভ করলেন—টোষ্ট, ডিম, স্যাণ্ডউইচ্ কিছুরই অভাব ছিল না, শ্রমিক নেতা হলেও তিনি তো আর শ্রমিক নন।

তাঁর খাওয়া শেষ হতে কমল বললে "একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে তো চলে না সার। যদি ধর্ম্মঘট চালাতে হয়…"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ব্রজেশ দত্ত বললেন, "যদি কি হে? চালাতেই হবে। একবার যদি শ্রমিকরা বিনা সর্ত্তে কাজে ফিরে যায় তাহলে মালিকরা আর কখন তাদের কোন দাবী মানবে ভেবেছ? ধর্ম্মঘট চালাতেই হবে, যেমন করেই হোক।"

ভয়ে, ভয়ে কমল বললে, "কিন্তু সার কি করে চলে? আধপেটা খেয়েও এতদিন এরা আমাদের কথা শুনেছে, এখন যে আর তাও জুটছে না।"

"সবই জানি, সবই বুঝি কিন্তু কি করব বল? আজ যদি খেতে পাচ্ছে না বলে এরা মালিকদের কাছে মাথা নীচু করে তাহলে সে মাথার ওপর জুতো শুদ্ধ লাথি মারতে মালিকদের একটুও দেরী হবে না।"

কথাগুলো বলতে, বলতে ব্রজেশ দত্তর গলা ভারি হয়ে উঠল।

মলিনা বললে, "অনাহার ভুলে হুজুগ করবার ক্ষমতা ওদের নেই। হয় ওদের সাহায্য করবার ব্যবস্থা করুন আর না হয় ওদের কাজে ফিরে যেতে দিন; ওদের দিকে আর চাওয়া যায় না। রাস্তার কলের জল খেয়ে মানুষ কদিন কাটাতে পারে? না খেতে পেয়ে ছেলে মেয়ে চোখের সামনে মরছে, কোন বাপ-মা দেখতে পারে? ওরা তাও পেরেছে কিন্তু ওরাও মানুষ।"

ব্রজেশ দত্ত রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, "সব জানি মলিনা, সব জেনেও জড়ের মত চুপ করে বসে আছি। কোন উপায় নেই—বসে, বসে শুধু চোখের জল ফেলতে পারি আর পারি ঈশ্বরের অবিচারের জন্যে তাঁরই কাছে নালিশ করতে। ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়, ওদের সঙ্গে কথা বলতে আমার গলা বন্ধ হয়ে আসে, ওদের দিকে তাকালে চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। খেতে বসতে হয় দু'বেলা বসি কিন্তু

গলা দিয়ে খাবার নামে না, মনে পড়ে যায় ক্ষুধার্ত্ত কাতর মুখ! রাত্রে ঘুমুতো পারি না, তন্দ্রা এলে মনে হয় ওরা আমার কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে…"

তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইল।

তারপর মলিনা বললে, "শুধু ভাবলেই তো আর উপায় হবে না। আজ যা হয় একটা কিছু করতে হবে; ওরা আর সহ্য করতে পারছে না।"

গলাটাকে প্রায় কান্নার সুরে নামিয়ে এনে ব্রজেশ বললেন, "আমিও যে ওদেরই মত গরীব—বাড়ীখানাও যদি নিজের হত না হয় তাই দিয়েই……"

কান্নায় কথাগুলো অসমাপ্তই রয়ে গেল।

কমল বললে, "আপনার থাকলে কি আর ভাবনা ছিল স্যার। ভগবানের কি অবিচার! আপনাদের মত লোকের কিছু নেই আর‥"

বাধা দিয়ে মলিনা বললে, "আমার মনে হয় মালিকদের সঙ্গে একটা রফা‥"

একটু হেসে ব্রজেশ বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ মলিনা, বাঘের সঙ্গে হরিণশিশুর রফা হয় না, হতে পারে না।" একজন চাকর এসে খবর দিলে ক'জন শ্রমিক এসেছে, দেখা করতে চায়। ব্রজেশ দত্তর মুখে চোখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল কিন্তু তা মুহূর্ত্তের জন্যে; তাদের সেখানে নিয়ে আসতে বললেন। তারা এসে সকলকে সেলাম করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল; তাদের সে অবস্থায় দেখলে কেউ ভাবতেও পারত না যে তারা শ্রমিক নেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অন্নদাতা মিলের মালিকদের সামনে নয়। ব্রজেশ জিজ্ঞেস করলেন, "কি খবর?"

একজন শ্রমিক বললে, "বাবুজি আজ কুছ্ বন্‌বস করিয়ে; আওর তো নেহি চল্ সেক্‌তা।"

দ্বিতীয় শ্রমিক বললে, "হর্ মজ্দুর আজ কামমে জানে মাংতা।"

তৃতীয় শ্রমিক বললে, "বোলতা হ্যায় ক্যা নসীবমে যো হ্যায় সো হোগা লেকিন্ এসে বিনা খা' পিকে মর্ নেহি সেকেগা।"

ব্রজেশ বললেন, "অভি তো মলিনা দেবী আওর কমল বাবুকে সাথ ঐ সব্ বাৎ হোতা রহা। হাম্ সব্ কুছ্ জানতা হ্যায় লেকেন করেগা কেয়া? আউর দো রোজ কৈ ফিকিরসে ··"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই একজন শ্রমিক বললে, "মাফি কি জিয়ে বাবুজী আব্ কৈ ফিকির নেহি চলে গা! কৈ সুরজ সে কুছ্ মিল যায় তো···"

ব্রজেশ বেশ একটু কষ্ট করে নিজেকে সংযত করে বললেন, "মালিককো পাশ এসে লোটনেসে মজ্দুর কো মরনে হোতা হ্যায়। আউর কভি ··"

আর একজন শ্রমিক বললে, "আজ কোহি ইয়ে সব বাৎ শোচনে কি ভি লায়েক নেহি হ্যায়।"

ব্রজেশ দত্ত নিজের মনে বলে উঠলেন, "ভগবান, একটু আলো, একটু আলো দাও, অন্ধকারে পথ চিনতে পারছি না। আর সব বিপদে আমায় যে রকম করে চালিয়ে নিয়ে গেছ সেই রকম এবারও নিয়ে যাবে সে বিশ্বাস আমার আছে।" মলিনা তার হাতের চুড়িগুলো এক, এক করে খুলতে লাগল। কমল বললে, "ও কি করছেন মলিনাদি?" তার কথার কোন জবাব না দিয়ে মলিনা সেগুলো একজন শ্রমিকের হাতে দিলে। সে খানিকক্ষণ মলিনার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, "আপ হামারা মায়ী, হর্ মজ্দুরকা মায়ী।" ব্রজেশ রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, "আমার ওপর তোমার এত দয়া ভগবান? আলো চাইতেই আমার পথের অন্ধকার দূর করে দিলে?" তারপর শ্রমিকদের বললেন,

"ভাই, হামারা তো জাদা কুছ্ নেই হ্যায়, হাম্ভি গরীব ; হ্যায় খালি এক্ হাওয়া গাড়ী, উও ভি তোমি লোক দিয়া থা ; আব হাম হর্ মজদুরকো রোটী কে লিয়ে ও লোটা দেতা—মলিনা দেবী হামকো রাস্তা দেখলায়া।"

শ্রমিকেরা সেলাম করলে। কমল বললে, "আপনার পায়ের কাছে বসতে পাই এ যে আমাদের কত বড় সৌভাগ্য··"

মলিনা তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বললে, "গাড়ীখানা কি এখনি বিক্রী করা যাবে ?"

ব্রজেশ বললেন, "আমি রামকিষণ দাসকে বলে দিচ্ছি—সে হয় তো আমাদের দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে কিছু কম দেবে তবে টাকাটা এখনি পাওয়া যাবে।"

একজন শ্রমিক বললে, "কমলবাবু থোড়া মেহেরবাণী করকে চলিয়ে, হাম্ লোক তো ইয়ে সব কুছ্ নেহি জান্তা।"

মলিনা ব্রজেশকে বললে "তাহ'লে গাড়ী কেনার রসিদটা আর আপনার একখানা চিঠি দিয়ে দিন।" ব্রজেশ আলমারী থেকে রসিদখানা বার করে সেটা আর একখানা চিঠি মলিনার হাতে দিয়ে বললেন, "তোমরা যাও, আমি ফোন করে দিচ্ছি।"

ব্রজেশ ছাড়া আর সকলে চলে যেতে তিনি টেলিফোন করলেন। অপর দিক থেকে জবাব পেয়ে বললেন, "রামকিষণ বাবুকে দিন" তারপর এই রকম কথাবার্ত্তা চলল :—

ব্রজেশ, "রামকিষণ বাবু না কি ? আমি ব্রজেশ দত্ত।"

রামকিষণ, "নমস্কার বাবুজী, কি হুকুম হয় ?"

"আপনাকে হুকুম করব, বলেন কি ? আপনি হলেন একজন মহাশয় ব্যক্তি···"

"আরে মশায় আপনার কাছে হামরা কি আছে? কি দরকার বোলেন।"

"আমার গাড়ীখানা আপনার ওখানে পাঠাচ্ছি।"

"কি হয়েছে? নতুন গাড়ী তো—এই তো সেদিন "

"কিছু হয় নি, আপনি ওটা কিনে নিন।"

"মস্করা করছেন বাবুজী! আপনি কেন গাড়ী বিক্রী কোরবেন?"

"না, ঠাট্টা করছি না; ওটা শ্রমিকদের দান করেছি।"

"সাচ্ কইছেন?"

"হাঁ; শুনুন মলিনা আর কমল গাড়ীখানা নিয়ে গেছে—কত দেবেন?"

"গাড়ীখানা ভালই আছে—হাজার টাকা দিতে পারি।"

"বড্ড কম হচ্ছে—নতুন দাম তিন হাজার, অন্ততঃ অর্দ্ধেক "

"মাফ্ করবেন, অত দিতে পারব না। আজকাল সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ীর দাম কি বোলেন? ঐ তে হয় তো বোলেন…"

"দেখুন চোদ্দ শো দিন—তার মধ্যে পাঁচ শো টাকা মলিনার হাতে দেবেন আর বাদ বাকিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, ওদের এ সব কিছু বলবার দরকার নেই, বলবেন পাঁচ শো'তেই কিনছেন। আসল দাম জানলে ওরা এখনই সব টাকাটা খরচ করে ফেলবে, আমি তা চাই না তাই…"

টেলিফোনে এখনও লোকের চেহারা দেখতে পাওয়া যায় না তাই, তা না হলে ব্রজেশ রামকিষণ বাবুর মুখে হাসি দেখতে পেতেন। রামকিষণ বললে, "ওরা এসে পড়েছে, দেখুন এগার শো'র বেশী আর একটী পয়সাও দিতে পারব না।"

ব্রজেশ দত্ত বললেন, "আমার নিজের টাকা হলে এত জোর করতাম না, তের শো' দিন…"

"না, এগার শো। আমাদেরও তো ব্যবসা করে খেতে হয় বাবুজী—এই যে কমলবাবু, মলিনাদেবী আসুন, ব্রজেশবাবু ফোন করছিলেন।"

বাধ্য হয়ে ব্রজেশকে ফোন ছেড়ে দিতে হল। তিনি জানতেন না রামকিষণ দাস তাঁর চেয়ে অনেক চতুর; তাঁর কথায় ভোলবার ছেলে সে নয়। আর বেশীক্ষণ সময় দিলে হয় তো আরও এক শো টাকা উঠতে হবে এই ভেবে সে মলিনা আর কমলের কাল্পনিক আবির্ভাবের কথাটা ব্রজেশকে জানিয়ে দিলে।

একটু পরেই তারা এল। রামকিষণ বললে, "ব্রজেশবাবুর সঙ্গে সব কথা হইয়ে গেছে, রসিদখানা দিন।" রসিদখানা নিয়ে সে একজন কারিকরকে গাড়ীখানা দেখতে বললে। একটু পরে কারিকর এসে রিপোর্ট দিতে সে একখানা পাঁচ শো টাকার চেক্ লিখে দিলে। মলিনা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "মাত্র পাঁচ শো টাকা? নতুন দাম…"

রামকিষণ বললে, "এর বেশী কেউ দিবে না। ব্রজেশবাবুর সঙ্গে সব কথা হইয়েছে। ইচ্ছা হয় তো আওর ভি দুকানে যাচাই করেন।"

মলিনা বললে, "বেশ তাই‥" কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিলে না কমল আর শ্রমিকরা; কমল বললে "দিদি, কিছু লোকসান হলেও আমাদের ছাড়তে হবে, টাকাটার বিশেষ দরকার। তাছাড়া ব্রজেশবাবু যদি বোঝেন কম হয়েছে বাকিটা আদায় করে নেবেন।" শ্রমিকেরাও তাইতে রাজি কাজেই মলিনাকে চুপ্ করে যেতে হল। তারা টাকাটা নিয়ে চলে গেল, রামকিষণও আর একখানা ছ'শ' টাকার চেক্ ব্রজেশ দত্তর নামে লিখে বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

মলিনারা ব্রজেশের ঘর থেকে চলে যাবার পর একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তার কাছে এলেন। তাঁকে দেখে ব্রজেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে 'আসুন, আসুন' বলে অভ্যর্থনা করে বসালেন। তিনি বসতে

ব্রজেশ পাখাটার জোর বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি কষ্ট করে কেন এলেন? একটা ফোন করলেই তো হত!"

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন, "এমন করে আর কতোদিন চালাবেন? কোত টাকা হামাদের লোকসান তোইছে বোলেন তো? হামরা ব্যব্সা কোরিয়ে খাই; যিখানে দু'পয়সা মুনাফার আশা আছে সিখানে হামাদের ইজ্জৎ বোলিয়ে কুছু নাই। আপনার বাড়ী আসছি তো কি হোইছে? আজ একটা যো কুছ্ মিট্‌মাট্‌ কোরিয়ে লেন্।"

ব্রজেশ বললেন, "আমি তো অনেকদিনই রাজি হয়েছি, এখন আপনারা মেহেরবাণী করলেই হয়।"

"টাকাটা কিছু কোম কোরেন—দেখেন⋯"

"বিশ হাজার কি খুব বেশী চেয়েছি? রোজ আপনাদের কত টাকা লোকসান হচ্ছে?"

"সে কোথা আর বোলেন কেন? দেখেন আপনার টাকা ছোড়েও তো খোরচ আছে। এবার ওদের জন্তে ভি কুছু খোরচ কোরতে হোবে!"

"সে ভারটাও আমার ওপর দিন না। মাইনে কিছু বাড়াতে হবে তবে তার সবটাই আপনাদের কাছে ফিরে আসবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, "সাচ্?"

ব্রজেশ হাসতে, হাসতে বললেন, "একবার আমার কথা মত কাজ করেই দেখুন না। আমার টাকাটা ফেলে দিলেই আমি সব ব্যবস্থা করে দি।"

"আপনি বোড় কোড়া লোক আছেন। আপনারা বোলেন মাড়োয়ারী লোক এক্ পয়সা ছোড়ে না, আপনি তো মাড়োয়ারীকে দাদা আছেন। কুছ বোলেন তো—ক্যায়সে ঘরকে টাকা ঘরমে আসবে।"

"তাহলে বিশ হাজারে রাজি তো ?"

"আওর কি কোরবো ? রাজি না হইলে··"

"টাকাটা কখন পাচ্ছি ?"

"বোলেন তো এখ্‌নই একখানা চেক্‌···"

"না চেক্‌ নয়, সব দশ টাকার নোট চাই।"

"আচ্ছা কব্‌ কাজ আরম্ভ হোবে ?"

"টাকা আজ পেলে কালই।"

"বহুৎ আচ্ছা, বিকালে টাকা মিলে যাবে। এবাব আপনার মোৎলোব বোলেন তো।"

"দু' পয়সা করে রোজ বাড়িয়ে দিন।"

"ওরে বাবা ! সে তো ওনেক টাকা হোয়ে যাবে।"

"দাঁড়ান। দিগম্বর মিলের পেছনে অনেক জায়গা পড়ে আছে, সেখানে থাকবার জায়গা করে দিন··"

"আপনি হামাদের গোলায় ছুরি দিবেন।"

"আঃ সবটা শুনুন। মিলের মজুররা ওখানে থাকবে তার জন্যে কিছু করে ভাড়া দেবে। তারপর কোম্পানী থেকে একটা টিফিন দেবার ব্যবস্থা করে তার জন্যেও কিছু করে কাটা চলবে। চাই কি একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী করে··"

"হামার তো একটা ইন্সিওর কোম্পানী আছে। সাবাস্‌ ব্রজেশবাবু। আপনি এক কাম্‌ কোরেন। ও সব মজ্‌দুর, কজ্‌দুর ছোড়ে দিন, হামাদের সঙ্গে লাগেন, টাকার উপর বৈঠ্‌বেন··"

একটু হেসে ব্রজেশ দত্ত বললেন, "তা হয় না। এদের ছাড়লে আপনারা আমায় পাত্তাই দেবেন না। আচ্ছা তাহলে ঐ কথাই রইল।"

"হাঁ, চার বাজের ভিতর আপনি টাকা পেয়ে যাবেন। নমস্কার।"

"নমস্কার, নমস্কার" বলে ব্রজেশ সঙ্গে, সঙ্গে গিয়ে মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে গাড়ীতে পৌছে দিয়ে এলেন।

শ্রমিকদের মধ্যে একটা ভয়ানক হৈ চৈ সুরু হল—ব্রজেশ দত্ত গাড়ী বিক্রী করে তাদের খাবার খরচা জোগাচ্ছেন, তারা আরো কিছুদিন ধর্ম্মঘট চালাতে পারবে। খবরটা সারা ক'লকাতায় ছড়িয়ে পড়ল; একখানা দৈনিক কাগজের বিশেষ সংখ্যাও বার হল। মিলের মালিকরা আর রামকিষণদাস কাগজ পড়ে একটু হাসলে।

—চার—

অবনী তার বস্‌বার ঘরে টাইপ্ করছিল। এখন তার অখণ্ড অবসর, বিলেত থেকে এখনও অনুমতি আসে নি তাই নিয়মিত কোর্টে যাচ্ছে না, অবশ্য আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সেজন্যে তাকে মুক্তি দেন নি। তাঁদের যে সমস্ত কাজ কোর্টে না গিয়েও করা যায় তার ভিড়ে তার টেবলে জায়গা ছিল না। সেই রকম কোন একটা বিষয় নিয়েই সে টাইপ্ করছিল; এ সব কাজ করে দিতে তার বিশেষ কোন আপত্তিও ছিল না। আদালতে গিয়ে সত্যিকার বাদী প্রতিবাদীর কাগজ পত্র যে কতদিনে দেখতে পাবে সে সম্বন্ধে তার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অবশ্য দু'দশ বছর মক্কেলের পয়সা না পেলেও হতাশ হবার মত অবস্থায় তার বাবা তাকে রেখে যান নি তাই অন্য হাজার, হাজার ছেলে যে বয়েসে পয়সা রোজগার করবার চেষ্টায় দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়ায় ও তখন নিশ্চিন্ত হয়ে পাইপ্ মুখে দিয়ে বিনা পয়সায় কাগজ পত্র দেখে নিজের মতামত টাইপ্ করতে থাকে। আজও তাই করছিল, বেয়ারা এসে একখানা স্লিপ্ দিলে। নামটা পড়ে সে চিনতে পারলে না তবুও নিয়ে আসতে বললে, বেয়ারা এক

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বললেন, "তোমার চাকর কার্ড চাইলে—অমি গরীব মানুষ কার্ড কোথায় পাব বাবা? অনেক্ বড়, বড় বাঙালীর বাড়ীও গেছি, কখন কেউ কার্ড দিতে বলে নি। তোমার বাবার সঙ্গে এক সময় যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল তাই ভাবলাম একবার যাই।"

অবনী পাইপ্‌টা নামিয়ে রেখে বললে, "তা আসবেন বৈ কি! আপনাদের আশীর্ব্বাদ না হলে পথ চলব কি নিয়ে?" ভদ্রলোক বললেন, "এই তো বাবা কেমন পাইপ্‌ নামিয়ে রাখলে। অনেকে বলে ছেলেরা বিলেত থেকে ফিরলে আর বাপ কাকার সামনে সিগারেট খেতে লজ্জাবোধ করে না। তা বাবা আদালতে যাচ্ছ তো?"

"আজ্ঞে হাঁ যাচ্ছি, তবে এখনও প্র্যাক্‌টিস্ করি না।" ভদ্রলোক একটু খোসামোদের সুরে বললেন, "দরকারই বা কি? তোমার বাবা যা রেখে গেছেন তাতে দু'এক পুরুষ ·· "

অবনী কষ্ট করে বিরক্তিটা চাপা দিয়ে বললে, "না সে জন্তে নয়; বিলেত থেকে হুকুম না এলে এখানে প্র্যাক্‌টিস্ করা যায় না, তাই।"

ভদ্রলোক একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "তুমি পাশ করে এসেছ তো বাবা?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

ভদ্রলোক আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "তাহলে আমার এই কাগজপত্র গুলো একটু দেখে রেখ বাবা। একজন বড্ড ধরেছে, তাকে কিছু টাকা দিতে হবে; সামান্ত কি জমি আরাৎ বিক্রী করতে চায়···"

"ওসব কাজ এটর্নী হলেই ভাল হয়···"

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন "তুমিই আমার এটর্নী বাবা—এটর্নীর কাছে যাওয়া নয়তো সর্বস্বান্ত হওয়া।"

বাইরে একখানা গাড়ী দাঁড়ানোর আওয়াজ হল, বেয়ারা আবার একখানা স্লিপ্ নিয়ে এল। অবনী সেটা দেখে বললে, "আচ্ছা নিয়ে আয়।"

ভদ্রলোক জিগেস করলেন, "তোমার মা তোমার বিয়েব কি ব্যবস্থা করলেন বল। আর তো দেরী কবা উচিত নয় ···"

অবনীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। সে বললে; "আমার বিয়ের সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।" মলিনা এসে ঘরে ঢুকে, অবনীকে হাত তুলে নমস্কার করলে; ভদ্রলোক বললেন, "শুনে খুব সুখী হলাম। এই মেয়েটাকেই বিয়ে করছ না কি?"

মলিনা ভয়ানক বকম বিব্রত হয়ে পড়ল আর অবনী উঠল চটে। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, "না; আমার এখন একটু কাজ আছে, আপনি কাগজপত্রগুলো রেখে যান।"

"আমার সামনে দেখলেই ভাল হত বাবা সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিতে পারতাম। বিধবাটী সম্পর্কে আমার নাতবৌ, বড্ড টানাটানি যাচ্ছে তাই আমাব কাছে এসেছে·· "

"আচ্ছা দেখে রাখব; আপনি এখন তাহলে আসুন।"

নিতান্ত অনিচ্ছায় ভদ্রলোক উঠে পড়লেন কিন্তু আশ্বাস দিয়ে গেলেন তার পর দিন আসবেন।

ভদ্রলোকটী চলে যেতে মলিনা বললে, "লোকটীর তো অসীম দয়া বলে মনে হচ্ছে! বিধবার বিপদে তার সম্পত্তি রেখে টাকা দিচ্ছেন···"

"হাঁ, আর বলেন কেন, কোনদিন দেখছি বলে মনে পড়ে না অথচ উনি বাবার বন্ধুত্বের দাবী করে এসে হাজির হলেন, যেতেও চান না।"

মলিনা বললে, "এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ঠিকানাটা মনে পড়ে গেল তাই·· "

"বেশ করেছেন, আসবেন বলেই তো ঠিকানা নিয়েছিলেন? না এলে ভাবতাম আমার সেদিনকার কথার জন্তে রাগ করেছেন।"

"রাগ করব কেন? আপনি তো অন্যায় কিছু বলেন নি।"

কিছুক্ষণ হু'জনেই চুপ করে রইল। কথা খুঁজে না পেয়ে অবনী বললে "চা খাবেন?"

মলিনা হাসতে হাসতে বললে, "না, ছেড়ে দিয়েছি—আগে খুবই খেতাম…"

"হঠাৎ চায়ের ওপর বৈরাগ্য হল কেন? শ্রমিকরা কি চা খায় না?"

"না তা নয়! জেলে গিয়ে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।" রীতিমত রকম চমকে উঠে অবনী জিগেস করলে, "জেলে গিয়েছিলেন? কেন?"

মলিনা আগের মত হাসতে, হাসতে বললে, "ভয় নেই চুরি ডাকাতি করে জেলে যাইনি, গিয়েছিলাম পিকেটিং করে। কলেজ থেকে বেরিয়ে করবার মত কিছু খুঁজে পেলাম না তাই আইন—অমান্য আন্দোলনে যোগ দিলাম। লাভের মধ্যে হল জেলের অভিজ্ঞতা, খবরের কাগজে উঠল নাম আর চাকরী জুটল কর্পোরেশানেব একটা স্কুলে। অবশ্য কাজ বেশীদিন করতে পারলাম না। নিজের কথাই বলে যাচ্ছি—আপনার কথা বলুন শুনি।"

"বলবার মত ঘটনা এখনও জীবনে কিছু ঘটে নি। এম্, এ পড়তে ভাল লাগল না তাই বিলেত গেলাম ব্যারিষ্টার হতে—এই ক'দিন হল ফিরেছি।"

আবার কিছুক্ষণ হু'জনে চুপ করে রইল। নেহাৎ অশোভন দেখায় তাই মলিনা বললে, "এখানে আর কে, কে আছেন?"

"মা আর আমি ছাড়া আত্মীয় স্বজন কেউ নেই।"

"মা এখানে আছেন, এতক্ষণ বলতে হয়। চলুন মা'র সঙ্গে আলাপ করে আসি।"

অবনী হাসতে হাসতে বললে, "মা কিন্তু বড্ড সেকেলে। বিলেত ফেরতার মা হবার মত তাঁর কোন · " শেষ করতে না দিয়ে মলিনা বললে, "তবু তিনি বিলেত ফেরতারই মা—ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা দেখুন তো। মা'রা সাধারণ বিলেত ফেরতা হয় না, সেকেলেই হয়, মা না থাকলেও এ কথা আমার জানা আছে।"

কথার স্রোত ফেরাবার জন্যে অবনী বললে, "সেদিন থেকে ভাবছি কলেজের সেই নিরীহ মেয়েটি হঠাৎ এত মুখর হয়ে উঠল কি করে?"

"কথাটা যে আমিও ভাবি না তা নয়। সত্যি, নিজের সম্বন্ধে আর যাই কেন ভেবে থাকি না এমনটা যে হবে তা কখন স্বপ্নেও ভাবি নি।"

"কি ভেবেছিলেন?"

"সত্যি বলতে গেলে বলতে হয় কিছুই ঠিক ভাবি নি, জীবনের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, থাকলে হঠাৎ ওরকম একটা দমকা হাওয়ায় টেনে নিয়ে যেতে পারত না।"

"তখন না হয় ভাবেন নি তাই ওপথে গিয়েছিলেন কিন্তু এখন তো ভাবেন, এখন ফেরেন না কেন?"

"ফিরে কি করব?"

"কেন? আরও হাজার, হাজার মেয়ে সারা পৃথিবীতে যা করছে তাই। বিয়ে করুন, সংসারের চাপ পড়লেই···"

বেশ জোরে হেসে উঠে মলিনা বললে, "কে আমাকে বিয়ে করবে আর আমি কাকে বিয়ে করব এই দু'টো কথার জবাব পেলেই বিয়ে করতে পারি। জেল ফেরতা ছেলের চাকরী পাওয়া যদি শক্ত হয়, জেল ফেরতা মেয়ের বিয়ে হওয়া একেবারেই অসম্ভব।"

কথাগুলো মলিনা হাসতে, হাসতে বললেও অবনী হাসতে পারলে না;

তার মনে হল অন্যায়ভাবে আঘাত করেছে তাই বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মলিনা তার অবস্থা বুঝতে পেরে বললে, "চলুন মা'র সঙ্গে দেখা করে আসি।"

অবনী বললে, "চলুন।" মলিনাকে জুতো খুলতে দেখে অবনী আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে, "জুতো খুলছেন কেন?"

"মা'র কাছে জুতো পরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?"

"কেন? আমি তো যাই।"

"আপনার কথা আলাদা, আপনি তো আর মেয়ে নয়। জানেন না আমাদের দেশে ছেলেরা যা পারে মেয়েরা তা পারে না?"

অবনী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। তার নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না, সন্দেহ হচ্ছিল এ কলেজের সেই মলিনা কিনা। এত অল্প দিনে যে মানুষ এত বেশী বদলে যেতে পারে তা সে জানত না।

মলিনা অবনীর মা'র কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলে। তিনি তাকে আশীর্ব্বাদ করে জিগেস করলেন, "মেয়েটী কে রে অবনী?"

অবনী বললে, "এঁর নাম মলিনা, এক সময় আমাদের কলেজে পড়তেন, অবশ্য আমার সঙ্গে নয়। বি, এ, পাশ করেছেন ··"

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে অবনীর মা বললেন, "বি, এ, তো পাশ করেছ মা কিন্তু বিয়ে করনি কেন? মাথায় সিঁদুর না হলে হিঁদুর ঘরের বয়স্থা মেয়ে কি মানায়?"

একটু দুষ্টুমি করবার লোভ সামলাতে না পেরে অবনী বললে, "তুমি কি করে ধরে নিলে উনি হিন্দু?"

অবনীর মা দু'পা পেছিয়ে গিয়ে তার দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে জিগেস করলেন, "সত্যি হিন্দু নয়?"

মলিনার পক্ষে তাঁর দুর্ব্বলতাটুকু ধরতে দেরী হল না—অন্য অনেককে

গোঁড়ামীর জন্যে সে বিদ্রূপ করেছে কিন্তু এই সাদাসিধে লোকটীর এ দুর্ব্বলতাটুকু সে বেশ সহজে মেনে নিয়ে বললে, "না মা, আমি হিন্দু।"

অবনীর মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তাই বল।"

নিজের বিয়ের কথা নিয়ে মলিনা অবনীর সঙ্গে যে রকম সহজভাবে তর্ক করেছিল তার মা'র সঙ্গে তা পারলে না, কোথায় যেন বাধল। অবনীর মা জিগেস করলেন, "তোমার বাড়ীতে কে, কে আছেন মা?"

"বিশেষ কেউ না; বরাবর হোষ্টেলেই কাটিয়েছি··"

"তোমার মা কোথায় থাকেন?"

"আমার মা নেই।"

কথাগুলো মলিনা বেশ সহজভাবেই বলেছিল কিন্তু অবনী আর তার মা আহত হলেন। অবনীর মা বললেন, "আহা, তাই বল! মা থাকলে কি কখন মেয়ের বিয়ে না দিয়ে চুপ্ করে থাকতে পারেন? মা নেই তাই তোমার বাবারও এ বিষয়ে মাথা ঘামে না—লোকে কথায় বলে মা'র সোহাগে বাপের আদর।"

"খুব ছোট বেলাতেই বাবা-মাকে হারিয়েছি।"

. এবার অবনীর মা'র চোখে জল এসে গেল; না জেনে দু' দু'বার আঘাত দেওয়ার লজ্জা তাঁকে ভয়ানক রকম অপ্রস্তুত করে দিলে। মলিনা বুঝতে পেরেছিল তিনি খুব অপ্রস্তুত হবেন কিন্তু সেই সঙ্গে যেটুকু সহানুভূতি সে পাবে তার লোভ সে ছাড়তে পারে নি তাই নিজের ব্যক্তিগত কথা অত সহজে তাঁদের কাছে বললে, অন্য জায়গায় হলে সে হয়তো কথার জবাব দিত না।

অবনীর মা বললেন, "তাহলে মা'র কাছে কিছুক্ষণ থাকতে খারাপ লাগবে না, কি বল? দেরী হলে হোষ্টেলে কিছু বলবে না তো?"

"সারাদিন না ফিরলেও কিছু বলবে না—কেবল রাত্রে ঠিক সময়ে ফিরলেই হল। আচ্ছা, তাহলে গাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে আসি।"

অবনী বললে, "আপনাকে যেতে হবে না, আমি বলে দিচ্ছি।"

অবনী বাইরে এসে তার বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড গাড়ীখানা দেখে অবাক হয়ে গেল। মলিনা অতবড় গাড়ী পেলে কোথায়? তাকে বড়লোকের ঘরের মেয়ে বলে মনে হয় না, থাকে হোষ্টেলে অথচ অতবড় গাড়ী চড়ে; তারপর তার মনে পড়ল ঐ গাড়ীখানাতেই মলিনা সেদিন উঠেছিল।

গাড়ীতে কমল বসেছিল, অবনী তাকে বলে দিলে মলিনা পরে যাবে।

অবনী একটু বিপদে পড়ল। তার মা মলিনাকে নিমন্ত্রন করে বসলেন কাজেই সে এখন কিছুক্ষণ তাদের বাড়ী রইল কিন্তু অবনী করে কি? মলিনা আসলে তারই অতিথি অথচ সে কিছু বাড়ীর ভেতর গিয়ে তার কাছে বসে থাকতে পারে না। আধুনিক মেয়েদের সঙ্গে মেশা মোটেই শক্ত নয় যতক্ষণ না তার মাঝে মা, মাসীকে আনতে হয়। তাঁরা না এলে বেশ সমানে, সমানে আলাপ, আলোচনা চলতে পারে, যেমন চলে সিনেমায় অপেক্ষা করবার জায়গায়, চোরঙ্গীর হোটেলে, ষ্টিমারে কিন্তু মা, মাসী এলেই মনে পড়ে যায় এঁরাও মেয়ে আর এই দুই শ্রেণীর মেয়ের মধ্য অনেক প্রভেদ। দু'দিকের আদর্শ বজায় রেখে কথা কওয়া ছেলেদের পক্ষে বেশ একটু কঠিন হয়ে পড়ে অথচ মেয়েরা নিজেরা তা মোটেই মনে করে না। বেশীর ভাগ লেখাপড়া জানা মেয়ে অশিক্ষিতার দলেও বেশ মিশে যেতে পারে, ছেলেরা সেটা বুঝতে পারে না তাই বিব্রত হয়ে পড়ে।

অবনী আর বাড়ীর ভেতর ফিরে গেল না কিন্তু বাড়ীর বাইরেও যেতে পারলে না, সেটা দেখতে মোটেই ভাল হয় না। অলকাকে হয় তো সে খবর দিতে পারত আর আসতে বললে সে হয় তো আসতেও আপত্তি করত না কিন্তু সে যে বেশ খুসী হয়ে আসত না অবনী তা জানত। অলকার প্রথম দিনের আচরণেই সে বুঝতে পেরেছিল মলিনাকে সে ভাল চোখে

দেখে নি ; আরও অপ্রিয়তা সৃষ্টির সুযোগ না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ মলিনার জন্যে অলকাকে বিরক্ত হতে দেওয়ার কোন অর্থই হয় না তাই সে তাকে খবর দিলে না।

নিজের ঘরে বসে অবনী আবার কাজে মন দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারলে না ; এই মেয়েটীর অদ্ভুৎ আচরণগুলো তাকে বেশ একটু চিন্তিত করে তুলেছিল। মলিনার সঙ্গে অবনীর যেটুকু পরিচয় ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী পরিচয় অন্য অনেক মেয়ের সঙ্গে ছিল কিন্তু এ দু'দিন মলিনা যে ভাবে কথা বলছে, মিশছে, অন্য কোন মেয়ে তা করে নি—তার বাড়ী আসবার কথা হয় তো কেউ ভাবতেও পারে নি। তাছাড়া তাদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল কলেজী জীবনে, সে জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে, সঙ্গে তাদের সঙ্গে সব সম্পর্কও শেষ হয়ে গেছে, তাদের কা'র কথা আজ আর মনেও পড়ে না ; সে জীবনের সঙ্গে আজ আর কোন সম্বন্ধ নেই। সে জীবনে যাতে চমকে উঠতে হত, আজ আর তাতে চমকে উঠতে হয় না ; সে দিন যা অসম্ভব বলে মনে হত আজ আর তা অসম্ভব বলে মনে হয় না।

অবনী মনে, মনে তার কলেজী জীবনের মধ্যে ফিরে যাচ্ছিল। বেয়ারা এসে একখানা কার্ড দিলে ; কার্ডখানা দেখে সে যে খুব খুসী তা বলা যায় না, তবু বেয়ারাকে বললে, "পাঠিয়ে দে।" একটু পরেই দ্বিজেন এসে ঘরে ঢুকল ; গায়ের রংটায় বাঙ্গালীত্ব প্রকাশ না পেলে তাকে সাহেব বলে ভুল করা চলে—তার বেড়াতে যাবার পোষাক, কাঁধে একটা ক্যামেরা, মুখে পাইপ। ঘরে ঢুকে বললে, "সুপ্রভাত! অসময়ে এসে কাজের ক্ষতি করলাম না তো ?"

অবনী বললে, "না, একাই তো ছিলাম, এমন কোন কাজও ছিল না। বোস, তারপর কোথা থেকে ?"

"আসাম থেকে; চা বাগানগুলো একটু দেখে আসবার জন্যে অফিস থেকে পাঠিয়েছিল।"

একখানা চেয়ার টেনে তারপর সেটাকে ঠেলে রেখে দ্বিজেন টেব্লেরই এক কোণে বসে পড়ল। মলিনার জুতো জোড়া লক্ষ্য করে বললে, "না, বড্ড খারাপ সময়ে এসেছি দেখছি—শ্রীমতী কখন এলেন? গেলেন কোথায়? কাগজে তোমাদের এন্‌গেজ্‌মেণ্টের খবরটা পড়ে—অভিনন্দন জানাতে এলাম; তুমি ভাগ্যবান!" অবনী বললে, "কাগজে ও দিয়েছেন না কি? এ সব বেশী বাড়াবাড়ি! বাঙ্গালীর ঘরের বিয়ে ········"

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দ্বিজেন বললে "আরে এ কি যে সে বিয়ে? লক্ষীকান্তর মেয়ে তো বাঙ্গলা দেশের একমাত্র মেয়ে! দেখ, কাল কত ছেলের মৃতদেহ লেকের জলে ভেসে ওঠে। আমি অবশ্য খারাপ কিছু বলছি না! মেয়েটী যাকে বলে একটী রত্ন। আজ তোমায় বলতে আপত্তি নেই বিলেত থেকে ফিরে অলকার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনি—মানে খারাপ কিছু নয়, যাকে বলে যশ-সৌরভ আর কি—দু'চার দিন ওখানে গিয়েও ছিলাম।"

অবনী বেশ নির্লিপ্তভাবে বললে, "তারপর?"

"খুব বেঁচে গেছি। তোমার কথা কিছুই জানতাম না, প্রোপোস করেছিলাম আর কি! ও প্রেম, ট্রেম করা আমার পোষায় না; চোখে ভাল লাগল, দেখলাম বিয়ে করলে মন্দ হয় না ব্যাস্! তাছাড়া ও রকম নামজাদা মেয়ে বিয়ে করার মোহ আছে। কিছু মনে করছ না ত?"

"এতে মনে করবার কি আছে?"

দ্বিজেন হাসতে, হাসতে বললে, "আমার চেয়ে গাধা আছে। কে এক রঞ্জন একদিন প্রোপোস্ করে বসল। অলকা তার উত্তরে বললে, 'অবনীবাবু ফিরে এসে যদি আমায় না চান, তাহ'লেও আর

কাউকে গ্রহণ করতে পারব না'—আজকাল এরকম বড দেখা যায় না! ভাগ্যিস শুনতে পেয়েছিলাম—সাবধান হয়ে গেলাম, সেই থেকে ওপথ আর মাডাই নি।"

"বিয়ে করছে?"

"না, এখনও দরকার হয় নি—অবশ্য হতাশ প্রেমিক বলে আমায় নিশ্চয় ভুল করবে না। কলেজে পড়তে, পড়তে কোন্ একটা থিয়েটার না বায়স্কোপে যেন শুনেছিলাম, 'বিয়ে করি নি, তবে ভীষ্মদেব নই'—ওটা খুব সত্যি কথা! বিয়ে না করে ভীষ্মদেব থাকা, ওসব স্রেফ্ ধাপ্পাবাজী" বলে দ্বিজেন পকেট থেকে একটা ফ্লাস্ক বার করলে। ছিপিটা খুলে বললে, "তোমার বাড়ীতে তো এ সব পাঠ নেই, কিছু মনে করবে না তো ...."

জোর করে হেসে অবনী বললে, "কিছু মনে করলেই কি তুমি থামবে?"

দ্বিজেন হাসতে, হাসতে ফ্লাস্কটা মুখে তুললে, মলিনাও সঙ্গে, সঙ্গে ঘরে ঢুকল। মলিনা অপ্রস্তুত হয়ে পেছিয়ে যাচ্ছিল, দ্বিজেন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললে, "আসুন, আসুন। আমি এখনই উঠছি। অন্য সময় তোমার সঙ্গে দেখা করব অবনী; চললাম" বলে সে চলে গেল।

মলিনা বললে, "ঘরে লোক আছে জানতাম না।"

অবনী বললে, "তাতে কি হয়েছে? আপনি এসে বরং ভালই হয়েছে, ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া একটা কম লাভ নয়। বিলেতে এমন কোন ভারতীয় ছাত্র ছিল না যে ওকে দেখে বিরক্ত না হত।"

"এবার যাই"

আশ্চর্য্য হয়ে অবনী বললে, "তার মানে?"

হাসতে, হাসতে মলিনা বললে, "মানে খুবই সহজ! যাই কথাটার মানে বুঝতে সময় লাগে, না অভিধান দরকার হয়? যাওয়ার মধ্যে তো কোন নতুনত্ব নেই, যাব বলেই তো আসা!"

"এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলে গেলেন; অত ভেবে আমি কথা বলি নি। মাঝখানে আমার ঘরে তো আর আসেন নি তাই ভেবেছিলাম যাবার এখনও দেরী আছে।"

"এসে কি করব বলুন? আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল কিছুতেই হবে না; শুধু, শুধু আপনার সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই অথচ মা'র কাছে সময়টা কাটল চমৎকার। মা না থাকলে লোকে বড় হ্যাংলা হয়ে যায়, না?" কথাগুলো মলিনা খুব সহজভাবেই বলতে চেয়েছিল কিন্তু অবনীর মনে হল শেষের দিকে তার গলাটা যেন ভারি হয়ে উঠল। মলিনা আবার বললে, "মাকে বলে গেলাম মাঝে, মাঝে আসব অবশ্য বিনা নিমন্ত্রনে, যতদিন না আপনার বিয়ে হয়।"

অবনী আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে, "ও রকম একটা সীমা নির্দ্দেশ করবার উদ্দেশ্য?"

"তখন তিনি হবেন এ বাড়ীর একমাত্র লোক, তাঁর অনুমতি না নিয়ে আসব কি করে? অনুমতি নিয়ে কোন কাজ করার মধ্যে যে দৈন্যটুকু আছে তা মানুষের আত্ম-সম্মানকে আঘাত করে।"

অবনী হাসতে, হাসতে বললে, "একটু ভুল করলেন। তিনি এ বাড়ীতে এলে আমি হয়তো একান্ত অনুগত হয়ে আমার সব অধিকার তাঁর হাতে তুলে দিতে পারি—যেমন আগেকার দিনে স্ত্রীরা দিত—কিন্তু মা কেন তা করবেন?"

মলিনাও হাসতে, হাসতে জবাব দিলে, "যে শাশুড়ী বৌএর সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায় তাকেই তা করতে হয়, অস্বীকার করতে পারেন?"

"স্বীকারও করতে পারি না কারণ এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ বললে একটুও অন্যায় হবে না। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি; আমার অবশ্য আপনার মত অতবড় গাড়ী নেই।"

আশ্চর্য্য হয়ে মলিনা বললে, "আমার গাড়ী? থাকবারই একটা জায়গা জোটে না তা গাড়ী। ও গাড়ীখানা এক বড লোকের যিনি স্রেফ্ তাঁর সম্পত্তির খাতিরে রাজনৈতিক মহলে একটা উঁচু জায়গা দখল করে বসে আছেন। আপনার সঙ্গে একদিন পরিচয় করে দেব।"

কোন রকম আগ্রহ না দেখিয়ে অবনী বললে, "সেটা আমার সৌভাগ্য।"

অবনীর গাড়ীতে উঠে মলিনা বললে, "সেদিন জিগেস করেছিলেন না শ্রমিকদের হয়ে মাথা ঘামাই কেন? তার জবাব যদি পেতে চান তাহলে আমাদের সঙ্গে কয়লার খনির অঞ্চলে চলুন—কুলিদের থাকবার জায়গা দেখতে যাব। ক্যামেরাটা সঙ্গে নেবেন, আপনার বেশ একটু বেড়ান হবে।"

"গিয়ে কি হবে?"

"ও দেশ আর এ দেশে তফাৎ দেখবেন। পারেন তো আপনার ভাবী স্ত্রীটীকেও সঙ্গে নেবেন। তিনি কি আমাদের মত লোকের সঙ্গে যেতে চাইবেন?"

"তাঁকে এর মধ্যে আবিষ্কার করলেন কি করে?"

"কেন? তিনি কি আত্ম-গোপন করেছিলেন না কি? অলকা দেবীই তো আপনার ভাবী স্ত্রী?"

"মা এর মধ্যে সব বলে দিয়েছেন?"

"এ সব কথা বলে দিতে হয় না। যেতে হবে কিন্তু—আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।"

"দেখি" বলে অবনী চুপ করে রইল।

অবনী মলিনাকে তার হোষ্টেলের দরজায় নামিয়ে দিলে।

মলিনা তাদের বাড়ী এসেছিল একথা অবনী অলকাকে জানালে; জানাবার যে এমন কিছু প্রয়োজন ছিল তা নয় তবে অবনীর মনে

হল না জানাবার কোন কারণ নেই, এমন কি পরে কোন সূত্রে জানতে পারলে সে হয়তো ক্ষুণ্ণ হবে। সে ভেবেছিল মলিনার সেদিনকার আচরণের কথা শুনে অলকা খুসী হয়ে উঠবে, তা হলনা দেখে সে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে আশা করেছিল অতীতের এবং বর্ত্তমানের মলিনার আচরণের মধ্যে যেটুকু অসঙ্গতি আছে তাতে শুধু সে নয়, সকলেই যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করবে।

মলিনার কথা বলতে, বলতে অবনী একটু বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। অলকা বললে, "কিছু মনে কোর না, তোমার এ বান্ধবীটীর সম্বন্ধে আমি বেশ নিঃসন্দেহ হতে পারছি না।"

অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে অবনী বললে, "ওকে সন্দেহ করবার মত কি থাকতে পারে? আর যদি সন্দেহ করবার মত কিছু কোন দিন ঘটেই তাহলে তার জন্যে দোষী ও হবে না, হব আমি।"

"না, আমি সেদিক থেকে বলছি না। সে দুর্ভাগ্য যদি আসেই তাহলে তাকে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেবার ক্ষমতা আমার আছে; তার জন্যে কা'র কাছে কা'র নামে নালিশ করব না, এমন কি ভগবানের কাছেও না; সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

"বাঁচা গেল, ভয়ানক ভাবনা হয়েছিল" বলে অবনী হেসে উঠল তারপর বললে, "তবে ওকে সন্দেহ করবার আর কি থাকতে পারে?"

একটু ইতস্ততঃ করে অলকা বললে, "ওকে ঠিক আমাদের সমাজের লোক বলা যায় না।"

অবনী প্রায় বিরক্ত হয়ে বললে, "ও গরীব তা জানি।"

বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে অলকা বললে, "তুমি আজ আমার সব কথাই উল্টো করে ধরছ। কা'র আর্থিক অবস্থার ওপর কটাক্ষ করবার মত নীচ আমি নই।" অবনী তার ভুল বুঝতে পেরে বললে, "সত্যি তোমার ওপর অবিচার করেছি, বল কি বলছিলে।"

•"তুমি বা আমি কেউই কংগ্রেস বা শ্রমিক দলের লোক নই; তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই, তাদের নিয়ে মাথা ঘামাই না আর তার প্রয়োজনও দেখি না। তুমি তোমার কাজের জীবনে ওসব নিয়ে ব্যস্ত হবার অবসর পাবে না; তাই বলছিলাম ও পর্ব্ব এখানেই শেষ করে দাও।"

কথাগুলোর সোজা জবাব না দিয়ে অবনী বললে, "সেদিন মলিনা কি বলেছিল মনে আছে? বলেছিল আমাদের যদি ভুল হয় তাহলে আপনাদের সে ভুল শুধরে দেওয়া উচিত। আমার মনে হয় ওরা অনেক ভুল করছে।" অলকা ঠাট্টার সুরে বললে, "তুমি কি ওদের সে সব ভুল শুধরে দেবার ভার নিচ্ছ না কি?"

অবনী সহজভাবে জবাব দিলে, "না তা নিচ্ছি না কারণ সে যোগ্যতা আমার নেই—হয়তো ইচ্ছের ও অভাব। তাছাড়া কাজটা ঠিক আমার মত লোকের জন্যে নয়।"

"আমি ও তো তাই বলছি, ওদের কাজ ওদের করতে দাও। যদি ওরা ভুল করে তাহলে সে ভুল শুধরে দেবার লোকের অভাব হবে না আর যদিই হয় তাহলে সে ভুলের জন্তে যারা ভুগবে তাদের মধ্যে আর যেই থাকুক, তুমি, আমি নিশ্চয় থাকব না।"

"থাকব না নিঃসংশয়ে বলা যায় না। ওদের ভুলের ফল যে ওদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তা কে বলতে পারে? খোলা মাঠে আগুন লাগলে সে আগুন ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না আর ছড়িয়ে পড়লে চার পাশের গ্রামের লোক বেশ নিরাপদ নয়।"

"ওদের সে পর্দ্দায় উঠতে এখনও অনেক দেরী আর কখন যে উঠবে তাও মনে হয় না।"

"তাই যদি হয় তাহলে ওদের সঙ্গে মিশতেই বা ভয় কি? চল

না, ওদের সঙ্গে কয়লার খনির অঞ্চলে ঘুরে আসি। মলিনা নিমন্ত্রণ করেছে—তোমাকেও।"

"তাই না কি ? সেখানে গিয়ে কি হবে ?"

"ওরা যাবে সেখানকার কুলিদের অবস্থা দেখতে আর তার প্রতিকারের উপায় ঠিক করতে। আমাদের পক্ষে হবে একটু ঘুরে আসা আর একটা নতুন অভিজ্ঞতা।"

"আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার বিশেষ মোহ নেই আর থাকলেও ওদের সঙ্গে যেতে চাই না। আশা করি তুমিও যাবে না।"

"কেন ? গেলে কি হবে ?"

অলকা বুঝলে অবনী তার মনের কথাটা ধরতে পারছে না, বা ধরতে চাইছে না। সে বললে, "তোমার তো ও রকম করে কোথাও যাওয়া অভ্যেস নেই, ওতে অনেক ঝঞ্ঝাট, খুব কষ্ট সহ্য করতে হবে।"

অবনী হেসে উঠে বললে, "তুমি কি বলতে চাও মলিনাকে আমি না যাওয়ার এই কৈফিয়ৎ দোব ?"

"কৈফিয়ৎ দিতে যাবে কেন ? তুমি তো কথা দাও নি ?"

"আইনত কথা দিইনি তবে যাবনা বলিনি আর না যাবার ইচ্ছেটাও কোন রকমে প্রকাশ করিনি। আমি ভেবেছিলাম তুমিও যাবে, ক'ঘণ্টা বেশ কাটবে। একাই যেতে হবে দেখছি।"

অবনীর শেষের কথাগুলো শুধু অলকাকে রাগাবার জন্যে বলা ; তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল না। অবনী যে এত কথার পরও যাবার কথা ভাবতে পারে অলকার সে ধারণা একেবারেই ছিল না। সে বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, "তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলে এটা বিলেত নয় আর আমি মেম সাহেব নই। সব জায়গায়, সব অবস্থায় বাঙ্গালীর মেয়ে যেতে পারে না।"

"আজকের বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে অন্য দেশের মেয়ের যে কোন তফাৎ আছে তা তো আমার মনেই ছিল না; আমি ভাবতাম তোমরা সে সব পার্থক্য তুলে দিয়েছ—তা ছাড়া আমার সঙ্গে কোথাও যেতে যে তোমার আপত্তি থাকতে পারে তা জানতাম না।"

"থাকতে পারে বৈ কি। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন তোমার সঙ্গে সব জায়গায় যাওয়া চলে না—অবশ্য বিয়ের পর যদি হুকুম কর তাহলে কি করব বলতে পারি না।"

"তুমি বেশ ভাল করেই জান অলকা আমি কোনদিনই তোমায় কোন বিষয় হুকুম করব না—অন্ততঃ আজ পর্যান্ত করি নি।" অবনীর গলার আওয়াজ করুণ হয়ে উঠল কিন্তু অলকা তা লক্ষ্য না করে বললে, "আজও কর নি সেকথা সত্যি তার কারণ আজও তুমি তা পার না, সামাজিক নিয়মে বাধে তা না হলে……"

"তা না হলে কি? সামাজিক বাধা না থাকলে হুকুম করতাম এই তো? তুমি তাহলে আমায় একটুও চেন নি অলকা। সামাজিক নিয়ম কানুনের ভয়ে আমি কোন দিন কোন কাজ করি নি কারণ সমাজকে মানবার আমার এখন পর্য্যন্ত কোন দরকার হয় নি।"

"তুমি পুরুষ, সমাজকে অস্বীকার করতে পার, আমি পারি না।"

"তোমার আমার মধ্যে সমাজিক ব্যবধানটা যে এত বড হয়ে আছে তা আমি জানতাম না।"

অলকা দেখলে অবনী খুব বেশী আহত হয়েছে, অতটা তার ইচ্ছে ছিল না। অবনী মলিনাদের সঙ্গে ওখানে যায় তা সে চায় না তাই তার নিজের অনিচ্ছাটা জোর করে প্রকাশ করতে চেয়েছিল কিন্তু কথার গতি ক্রমশঃ যে দিকে যাচ্ছিল তা বেশ বাঞ্ছনীয় নয় তাই অলকা বললে, "দেখ, আবার তুমি আমার ভুল বুঝছ! আচ্ছা, আগে তো কৈ আমাকে এত সহজে ভুল

বুঝতে না ?" তিক্ত কণ্ঠে অবনী জিগেস করলে, "অর্থাৎ ? এর জন্যেও কি তুমি সে বেচারীকে দায়ী করছ না কি ?"

অবনীর বিরক্তি উপেক্ষা করতে না পেরে অলকা বললে, "আমি তা বলতে চাই নি কিন্তু তার প্রতি দরদটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না কি ?"

অবনী তার বিরক্তি চেপে রাখবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করে বললে, "এই রকম একটা বিশ্রী পাড়াগেঁয়ে কথা বলতে একটুও বাধল না ? কোন মেয়ের সঙ্গে এক সময় আমার সামান্য পরিচয় ছিল আর আজ সে আমায় কোথাও যেতে নিমন্ত্রন করেছে এ জন্যে তুমি এত বিরক্ত হয়ে উঠবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। এই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নমুনা হয় তাহলে তো আমার চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

"আমারও ভেবে দেখবার যথেষ্ট কারণ আছে। সামান্য একটা পিকেটিং-করা মেয়ে যদি তোমার মনের স্থিরতা এতটা নষ্ট করতে পারে যে তুমি তার হয়ে আমার সঙ্গে......" তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অবনী বললে, "তুমি যে সব কথা বলছ তা বোধ হয় মানে বুঝে বলছ না। আমার মনের স্থিরতা এত জলীয় নয় যে এত সামান্য কারণে চল্‌কে যাবে। তা যদি হ'ত তাহলে অজস্র সুযোগ যেখানে ছিল অথচ বাধা দেবার কেউ ছিল না সেখানে চার বছর কাটিয়ে আবার আগের মত তোমার কাছে ফিরে আসতাম না।"

"সে জন্যে কি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে বল ?"

অবনী আশ্চর্য্য হয়ে অলকার মুখের দিকে চেয়ে রইল। যে অলকাকে সে জানে এ যেন সে নয়, সেই অলকা যে কথা বলছে এ কথা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মলিনার পরিবর্ত্তন দেখে যদি সে আশ্চর্য্য হয়ে থাকে, অলকার আজকের আচরণে তাহলে তার বিস্ময়ের সীমা থাকা উচিত নয়। অলকা যে কখন, কোন কারণে এ ভাবে কথা বলতে পারে অবনী

তা ভাবতেও পারত না। সে জানত অলকা সাধারণ মেয়ে ছাড়া কিছু নয়, তার কাছে সে অসাধারণ কিছু আশা করে নি। তার বিশ্বাস ছিল আধুনিক শিক্ষা যদি অলকাব জীবনে কোন পরিবর্ত্তন এনে থাকে তো তাকে সুন্দরই করেছে—অলকাকে তার ভাল লেগেছিল কারণ কলেজী জীবন তাব মধ্যে কোন অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আনে নি। সে জানত অলকা তাকে নির্ব্বিচারে মেনে নিয়েছে—তার সমস্ত দোষ গুণ জেনেই, তাকে দেবতা বলে ভুল করবার কোন সুযোগ সে দেয় নি। সেও অলকাকে সাধারণ মেয়ে বলেই মনে করছে, তার কাছে অস্বাভাবিক কিছু আশা করে নি। তার কাছে তাদের পবস্পরের এই সহজ, স্বাভাবিক, মানসিক স্বীকারোক্তিটাই গৌরবের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

সে যে সত্যিই মলিনার কথায় তাদের সঙ্গে যেত তা বলা যায় না বরং বলা যায় যাবাব তার বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না কিন্তু অলকা তাকে দৃঢ়তা দিলে। তার মনে হল অলকা তাকে ভুল বুঝেছে বলে সে যদি না যায় তাহলে তাকে অযথা প্রাধান্য দেওয়া হয় আর সেই সঙ্গে নিজেকে করা হয় ছোট। সে ঠিক করলে মলিনাদের সঙ্গে যাবে, অন্ততঃ অলকার অসঙ্গত আচরণকে আঘাত করবার জন্যে সে যাবে—অলকার জানা দরকার তার যে কোন অন্যায় বা অসঙ্গত দাবী সে মেনে নিতে রাজি নয়। যে বয়েসে ছেলেরা মেয়েদের সব কথা নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়াটাই গৌরবের বলে মনে করে অবনীর সে বয়েসটা কেটে গেছে। সে চায় অলকাকে বিয়ে করে সংসার করতে, সে জন্যে যতটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সে তা করতে প্রস্তুত; কাব্য-জগতের প্রেমেব অভিনয় সে কখনও করতে চায় নি আর তার দাবী মেটাতেও সে প্রস্তুত নয়। অলকার দুর্ব্বলতার শেষ সীমা দেখবার জন্যেই যেন সে বললে, "তাহলে তুমি যাবে না ?"

অলকা তার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বললে, "এ কথার কোন মানেই হয় না। আমি যাব না তা কি তুমি এতক্ষণ বুঝতে পার নি?"

বেশ সহজভাবে অবনী বললে, "অনেক কিছুই আজ পর্য্যন্ত বুঝে এসেছি, তার সবটাই যে ঠিক বুঝি নি তা আজ প্রথম বুঝলাম। আর বেশী ভুল করতে চাই না।" অলকা একটু মেজাজের ওপর জবাব দিলে, "ভুল না করলে আমিও সুখী হব; আমি চাই না আমার সম্বন্ধে তোমার কোন ভুল ধারণা থাকে। তোমার সঙ্গে আচরণে কোনদিন কোন ভুল করবার অবকাশ দিয়েছি বলে মনে হয় না, যদি ভুল করে থাক, সে জন্যে আমায় দায়ী করতে পার না।"

"না, তোমায় দায়ী করতে চাই না, নিজের ভুল শুধরে নিতে চাই।"

"খুব ভাল কথা। নিজের ভুল শোধরাবার যদি চেষ্টা কর তাহলে দেখবে অপরের ভুল ধরবার সময়ও পাবে না, আর সে ইচ্ছে ও হবে না।"

ঘরের হাওয়াটা বিষিয়ে উঠেছিল, অবনী এতক্ষণ নিজেকে তা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল কিন্তু আর পারলে না। অলকার ভঙ্গী অনুসরণ করে বললে, "আমার পক্ষে কি করা উচিত তা হয়তো আমার জানা থাকাই সম্ভব আর নাই যদি থাকে তাহলে অন্ততঃ তোমার কাছে শিখতে আত্ম-সম্মানে বাধবে।"

অলকা বেশ একটু চড়া গলায় বললে, "আমার কথা মানতে যদি তোমার আত্ম-সম্মানে বাধে তাহলে তোমার কথা মানতেও আমার লজ্জা করা উচিত। তোমার স্ত্রী হতে চেয়েছি এ কথা সত্যি কিন্তু তাই বলে মনে কোর না তোমার সব হুকুম নির্ব্বিচারে মেনে নেবার মত স্ত্রী হতে চেয়েছি।"

"আমিও চাই না আমার স্ত্রী হবে বলেই তোমার নিজস্ব সব কিছু ছেড়ে আমার হুকুম মত বেঁচে থাকবে। তবে বেঁচে থাকতে গেলে সব সময় নিজের মত খাটানো যায় না এটাও মনে রাখা দরকার; দু'দিক থেকে

খানিকটা করে ছেড়ে একটা রফা না করলে সংসার করা যায় না। যাক্ বসে থাকলেই কথা বাড়বে, চললাম।"

সে উঠে দাঁড়াতেই বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত ঘরে এলেন ; তাঁর হাতে কতকগুলো গয়নার ক্যাটালগ্ ; সেগুলো অলকার সামনে ধরে বললেন, "আমি নিজে থেকে কতকগুলো পছন্দ করেছি, তুই একবার দেখে রাখিস তারপর সেগুলো তোর শাশুড়ীকে দেখিয়ে নিয়ে আসব। তাঁর মতামত জানা দরকার। ওহে আজ বিকেলে তোমার মা'র কাছে একবার যাব।"

অবনী বললে, "আমার মনে হয় এত তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই, আরও কিছু দিন যাক্।"

লক্ষ্মীকান্ত অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে জিগেস করলেন, "সে কি হে ? সব ঠিক হয়ে গেছে, আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবকে জানান হয়ে গেছে, কার্ড ছাপতে দিয়েছি হল কি বলত ?"

অবনী বললে, "না, বিশেষ কিছু নয়। আচ্ছা, আমি এখন চললাম।" সে চলে যেতে লক্ষ্মীকান্ত অলকাকে জিগেস করলেন, "কি হয়েছে বলত ? হঠাৎ ওর হল কি ? আমার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্য্যন্ত বললে না··"

সে কথার জবাব না দিয়ে অলকা বললে, "আমারও মনে হয় এখন কিছুদিন অপেক্ষা করা দরকার। এত দিন পরে বিলেত থেকে এসেছে ··"

রীতিমত রকম ভয় পেয়ে লক্ষ্মীকান্ত জিগেস করলেন, "সেখানকার খবর কিছু পেয়েছিস না কি ? বিয়ে থা' করে আসে নি তো ?"

ভয়ানক রকম বিরক্ত হয়ে অলকা বললে, "কি যে বল।"

অপ্রস্তুত হয়ে লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "তবে ? এমন কি হল যার জন্যে বিয়ে বন্ধ রাখতে হবে ?"

"অত কৈফিয়ত দিতে পারি না" বলে অলকা ঘর থেকে চলে গেল।

লক্ষ্মীকান্ত কিছু বুঝতে না পেরে সেই ক্যাটালগ গুলোর পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

—ছয়—

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই অবনীর মনে পড়ল দিনটা মলিনাদের সঙ্গে যাবার দিন ; গাড়ীর বেশীক্ষণ দেরীও নেই, যেতে হলে তাড়াতাড়ি করতে হবে। একবার ভাবলে যাবে না কিন্তু অলকার কথাগুলো মনে পড়ে গেল। খুব ইচ্ছে না থাকলেও তাকে যেতে হবে ; অলকাকে সে ভালবাসে সত্যি কিন্তু সে জন্যে তার ইচ্ছে মত নিজের মতামত গুলো গড়ে তুলতে রাজি নয়—ভালবেসে নিজে থেকে কিছু ছাড়া আর অন্য লোকের ইচ্ছেয় ছাড়া এক নয়।

মলিনা এ কদিন আর আসে নি, টেলিফোনও করে নি কিন্তু তাদের সঙ্ঘের সভাপতি ব্রজেশ দত্ত নিজে তাকে যাবার জন্যে অনুরোধ করে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন ; তারপর আর কোন খবর সে পায় নি—শেষ পর্য্যন্ত তারা যাচ্ছে কিনা তারও ঠিক নেই। তারা না গেলেই সে বেঁচে যায়, তাকে যেতেও হয় না অথচ অলকার ইচ্ছেকেও প্রধান্য দিতে হয় না। সে চায় না অলকা তাকে ভুল বুঝুক কিংবা তাদের মধ্যে কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটুক। আসল কথা সে একান্ত শান্তি প্রিয় লোক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভব সে শান্তি বাঁচিয়ে চলতে চায়।

একটা কিছু করতে হয়, এভাবে শুয়ে থাকলে চলে না ; হয় তাকে মলিনাদের খবর দিতে হবে সে যেতে পারবে না আর না হয় উঠে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে কিন্তু কোনটা করবার মত শক্তি সে যেন খুঁজে পাচ্ছিল না তাই সময় খুব কম থাকলেও সে শুয়েই রইল।

বেশীক্ষণ শুয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হল না; টেলিফোনটা বেজে উঠতেই সে উঠে পড়ল। তার একটা ক্ষীণ আশা হচ্ছিল—এত সকালে টেলিফোন করতে পারে শুধু এক অলকা, মনটা তার খুসী হয়ে উঠল—নিশ্চয় অলকা তার ভুল বুঝতে পেরেছে। সে যদি হার মেনেই নেয় তাহলে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা থেকে সে বেঁচে যায়। দ্বিতীয়বার টেলিফোনটা বেজে উঠতেই রিসিভারটা তুলে নিয়ে সে জিগেস করলে, "কে ?"

অপর দিক থেকে প্রশ্ন হল, "অবনী বাবু তো ?"

অবনীর মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল, সে বললে, "হাঁ, আপনি কে ?'

"মলিনা। আপনি প্রস্তুত তো, না কিছুই মনে নেই ?"

"মনে আছে।"

"তাহলে এখনই বেরিয়ে পড়ুন, ষ্টেশনে দেখা হবে, কেমন ?'

"ক' নম্বর প্ল্যাটফর্ম ?"

"দশ, আচ্ছা, চললাম।"

"আচ্ছা।" রিসিভারটা রেখে দিয়ে অবনী বাধ্য হয়ে তৈরী হতে গেল, আর দেরী করা চলে না। বাড়ী থেকে বেরুবার আগে পর্য্যন্ত সে আশা করেছিল অলকা ফোন্ করবে। ঠিক যে কি জন্যে ফোন্ করবে তা সে ভেবে দেখে নি তবু প্রতি মুহূর্ত্তে একটা ফোন্ আশা করছিল।

অবনী এসে যখন ষ্টেশনে পৌঁছল তখন স' ন'টা, ট্রেণ ছাড়তে পনের মিনিট দেরী। দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই মলিনাদের দলের সঙ্গে তার দেখা হল। মলিনা বললে, "বেশ লোক তো আপনি! ট্রেণ ছাড়বার তো সময় হয়ে গেল।"

অবনী হাসতে, হাসতে, বললে, "ছেড়ে দেয় নি তো এখনও ? তাহলেই হ'ল।"

"ভুলে গিয়েছিলাম আপনি ক'দিন হল বিলেত থেকে ফিরেছেন। হাঁ, ইনি হ'চ্ছেন ব্রজেশ দত্ত আর ইনি অবনী গুপ্ত।"

তাঁরা দু'জনে দু'জনকে নমস্কার করতে মলিনা বললে, "আলাপ গাড়ীতে উঠে হবে, চলুন" কিন্তু তাদের তখনই যাওয়া হল না। একদল কলেজের ছেলে এসে সামনে দাঁড়াল, তাদের মধ্যে একজনের হাতে ফুলের মালা। ব্রজেশ বাবু বললেন, "না, ভাল বিপদেই পড়া গেল! ঐ দেখ মলিনা ওরা আবার ফুল নিয়ে হাজির হয়েছে।"

মলিনা বিরক্ত হয়ে বললে, "ওদের ও রকম হুজুক করতে বারণ করেন না কেন?"

"কতবার তো বারণ করেছি, শোনে কৈ?"

মলিনা ছেলেদের দিকে ফিরে বললে, "এ সব আপনারা কেন করেন বলুন তো? বাইরের সাজ সজ্জা যত বেড়ে যায় আসল কাজে তত ফাঁকি পড়ে। আপনারাই তো নেতাদের মাথা খারাপ করে দেন। এই রকম সম্মান পেয়ে, পেয়ে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে যান, মনে করেন এ তাঁদের প্রাপ্য।" একটা ছেলে বললে, "প্রাপ্যই তো, আর আমাদের হচ্ছে কর্তব্য। তাঁরা দেশের জন্যে, জাতির জন্যে সব ছেড়ে কত নিগ্রহ সহ্য করছেন, তাঁদের যদি আমরা উপযুক্ত সম্মান না দি, তাতে আমাদেরই দৈন্য প্রকাশ পায়। ওদের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন বীর-পূজা · · " বলতে, বলতে ছেলেটার একটু ভাব লেগে গিয়েছিল; তাকে থামাবার জন্যে মলিনা বললে, "আপনি তো বেশ বক্তৃতা করেন।" ছেলেটী লজ্জায় মাথা চুলকোতে লাগল। আর একটী ছেলে বললে, "ওর বক্তৃতা কাগজে বেরিয়েছিল। ঐ তো বলেছিল ব্রজেশ বাবু হচ্ছেন বাঙলা দেশের লেনিন।"

ব্রজেশ বললেন, "তোমাদের সব ভাল, এক দোষ কি জান? তোমরা একটু বেশী ভাবপ্রবণ। যে কাজে আমরা ব্রতী হয়েছি তাতে ভাবপ্রবণ

হলে চলে না—এতে চাই কর্ম্মশক্তি, চাই দৃঢ়তা, চাই নিস্পৃহতা। তোমারা আমায় সম্মান দিয়ে, দিয়ে এমন স্তরে নামিয়ে নিয়ে আসছ সে শেষ পর্য্যন্ত আমিও ধণিক সম্প্রদায়ের মত সম্মান দাবী করব।"

গাড়ী ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ল। ছেলেরা ব্রজেশের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে 'ইংক্লাব্ জিন্দাবাদ্' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ব্রজেশের দল ট্রেণের কামরার দিকে এগিয়ে গেল, ছেলেরাও পিছু, পিছু গেল। গাড়ীতে উঠ্তে, উঠ্তে ব্রজেশ বললেন, "কমল কৈ মলিনা?" মলিনা চারিদিক চেয়ে বললে, "এখানেই ছিল তো, কোথায় গেল আবার। আপনি উঠে পড়ুন, সে আসবে অখন। আর নাই যদি এসে পৌঁছয়, সেখানকার সেক্রেটারীই চালিয়ে নেবে।" সকলে গাড়ীতে উঠে বসলেন।

গাড়ী ছাড়বার শেষ ঘণ্টা হওয়ার সঙ্গে, সঙ্গে ছুটতে, ছুটতে কমল এল, ব্রজেশ আর মলিনা এক সঙ্গে বলে উঠলেন, "এই যে, এখানে।" সে গাড়ীতে উঠল। ব্রজেশ বললেন, "আচ্ছা ছেলে তো তুমি! কোথায় গিয়েছিলে কোথায়? গাড়ী তো প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল! তোমায় না পেলে কি করতাম বলত?"

গাড়ী ছেড়ে দিলে। কমল একটু বিপদে পড়ল, এটা প্রথম শ্রেণীর কামরা, তার টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর। সে জানত না গাড়ী অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে তাহলে উঠতো না। পরের ষ্টেশনে সে নেমে যাবে, কিন্তু বাড়তি ভাড়া দিতে হবে আর ব্রজেশবাবু বিরক্ত হবেন। সে ভয়ে, ভয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল। মলিনা বললে, "বোস না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কোথায় গিয়েছিলে?"

কমল দাঁড়িয়েই রইল, বললে, "একটা তার করে দিতে গিয়েছিলাম।"

মলিনা আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে, "কাকে তার করতে গিয়েছিলে?"

"সেখানকার লোকদের।"

"তার দরকার কি ছিল ? তারা তো সব জানে।"

"তাহলেও ব্রজেশবাবু যাচ্ছেন, সব ব্যবস্থা .... "

ব্রজেশ হাসতে, হাসতে বললেন, "তুমি বড্ড ছেলে মানুষ, তারা সব ঠিক করে রাখতই। আর না রাখলেই বা কি ? একটু, আধটু কষ্ট সহ্য করতে আমিও শিখেছি যে তা না হলে আর এই বুড়ো বয়েসে তোমাদের সঙ্গে শ্রমিক নিয়ে লাফালাফি করতে পারতুম না। কাজটা অবশ্য তুমি ভালই করেছ ; অবনীবাবু যাচ্ছেন, ওঁর তো এসব অভ্যস্ত নয়।'

কমল অবনীকে হাত তুলে নমস্কার করলে, অবনী প্রতি-নমস্কার করলে।

এতক্ষণ সে নীরব শ্রোতা ও দর্শক হয়ে অনেক কিছু শুনলে ও দেখলে। তার আগেকার ধারণাগুলো আরও দৃঢ় হয়ে উঠছিল ; শ্রমিক নেতারা যে শ্রমিকদের জন্যে মাথা ঘামান না, ঘামান নেতা হয়ে থাকবার জন্যে আর তার সহজাত ক্ষমতাগুলো উপভোগ করবার জন্যে এ বিষয় তার আর বিশেষ কোন সন্দেহ ছিল না। প্রথমেই তার চোখে কটু ঠেকল প্রথম শ্রেণীর কামরা রিসার্ভ। তার নিজের সঙ্গে ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিন্তু তাকে জোর করে প্রথম শ্রেণীতে তোলা হল। সে বেশ ভাল করেই জানত এ সব খরচা কেউ নিজের পকেট থেকে করে না—করে সমিতি বা সঙ্ঘের পয়সা থেকে।

তাকে বেশীক্ষণ ভাববার সুযোগ না দিয়ে মলিনা বললে, "দেখুন ব্রজেশবাবু, সেদিন অবনীবাবু অনেক কথা তুলেছিলেন, তার জবাব আমি দিতে পারি নি। কথাগুলো ভেবে দেখা দরকার ; এই যেমন ধরুন শ্রমিকদের হয়ে বলবার আমাদের কি অধিকার আছে ?" অবনী এভাবে আক্রান্ত হবে আশা করতে পারে নি ; সে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

ব্রজেশ অমায়িকভাবে হেসে বললে, "ঠিকই বলেছেন। ওঁরা ছাড়া

এ সব কথা বলবার, বা এ সব বিষয় ভাববার আর কা'র অধিকার নেই। ওঁরা কত পড়েছেন, কত দেখেছেন ; ও দেশের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে ; যতদিন ওঁরা এ কাজের ভার না নেন ততদিনই কেবল আমরা আছি।"

অপ্রস্তুত হয়ে অবনী বললে, "আমি এ রকম কোন কথা বলি নি ; আমি বলেছিলাম যাদের সমস্যা তাদের নিজেদের ভেবে দেখতে দিন। তাদের বিষয় তারা নিজেরা যা ভেবে ঠিক করবে তাতে তাদের আসল উপকার হবে। আমরা, যারা তাদের স্তরের লোক নই, যত চেষ্টাই করি না কেন তাদের দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অভিযোগ ঠিক তাদের মত করে বুঝতে পারব না কাজেই তার যা প্রতিকার করব তাও হবে অসম্পূর্ণ।"

কথাগুলো ঠিক সমালোচকের নির্লিপ্ততা নিয়ে অবনী বলতে পারে নি তা ব্রজেশ লক্ষ্য করেছিলেন। শ্রমিকদের সত্যিকার সমস্যার সঙ্গে অবনী তার সহানুভূতি প্রকাশ করে ফেলেছিল ; ব্রজেশের বুঝতে দেরী হ'ল না এই রকম লোককে দিয়ে বক্তৃতা করাতে পারলে শ্রমিকদের দরকার মত তাতিয়ে তোলা খুব সহজ। তিনি গলায় সহৃদয়তা আনবার চেষ্টা করে বললেন, "আপনি এ সব বিষয় খুব ভাল করে ভেবে দেখেছেন দেখছি—আপনার ধারণাগুলো খুব স্পষ্ট। ও নিয়ে তর্ক করা চলে না কারণ ওর বিপক্ষে বলবার কিছু নেই। কেন যে আমরা ওদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছি তা আজ ওদের অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

অবনী বললে, "কিন্তু তার মধ্যে একটা বিপদ আছে, সেটা আপনারা উপেক্ষা করছেন। জাগবার সময় হলে ওরা আপনিই জাগবে আর সে জাগাতে কা'র কোন ক্ষতি হবে না—ওদের নৈতিক স্বাস্থ্যেরও কোন হানি হবে না—কিন্তু আপনারা চাইছেন ওদের জেগে ওঠবার সময় হবার আগে জাগাতে, তাও আবার খোঁচা দিয়ে। ওদের মাথায় ঢোকাচ্ছেন শ্রেণী বিদ্বেষ, ধনীদের ওপর ওদের একটা অহেতুক আক্রোশ সৃষ্টি করছেন।"

"আমরা করছি না, ওটা আপনা হতেই হচ্ছে—প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে ঐ। ফ্রান্সের দিকে চেয়ে দেখুন, রাশ্যার ইতিহাস আলোচনা করে দেখুন......"

"ঠিক সেই জন্যেই কি আমাদের সাবধান হওয়া উচিত নয়? অন্য জাতের ইতিহাস যদি আমাদের এটুকু শিক্ষাও না দিতে পারে তাহলে ইতিহাসের প্রয়োজন কি? তারা ভুল করেছে বলে আমরাও করব? যে বিরাট, উন্মাদ, অন্ধ শক্তিকে আপনারা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন তার প্রতি মুহূর্ত্তের পা ফেলার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখতে না পারেন তাহলে তা দুর্ব্বার হয়ে উঠবে, তাকে সামলাতে পারবেন না। বন্য শক্তি যতক্ষণ বশে থাকে ততক্ষণই তাকে দিয়ে কাজ করান যায়, ক্ষেপে উঠলে মানুষের বুদ্ধি হার মানে।" অবনীর উত্তেজনা লক্ষ্য করে ব্রজেশ হাসতে, হাসতে বললেন, "আপনি আমাদের ওপর অবিচার করছেন অবনী বাবু, আমরা ওদের ক্ষেপাতে চাই না, চাই ওদের নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে, যখন ওরা ওদের নিজেদের শক্তির সন্ধান পাবে, তখন আর ভয় করবার কিছু থাকবে না।"

অবনী বললে, "তা হয়ত নাও থাকতে পারে কিন্তু সচেতন হয়ে ওঠবার আগেই সংঘাত হতে পারে তো।"

মলিনা এতক্ষণ কোন কথা বলে নি, এবার বললে, "যা হোক কথা তুলেছিলাম তো! তর্ক আর থামতেই চায় না।"

ব্রজেশ বললেন, "তর্ক তুলেছিলে বলেই অবনীবাবুর কাছ থেকে এত কথা শুনতে পেলাম। ওঁদের প্রত্যেক কথাটার দাম আছে। আমরা শুধু কলের মত কাজ করি, ওঁরা কত ভাবেন দেখেছ?"

কমল বোকার মত চেয়ে রইল, মলিনা হাসতে লাগল, আর অবনী লজ্জিত হল—ব্রজেশ নির্ব্বিকার।

মলিনা বললে, "শুধু ভাবলেই তো চলবে না, বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, সমস্যার স্বরূপ জেনে যা ভাবা যায় তারই দাম আছে, তাই তো অবনীবাবুকে নিয়ে এলাম। আজকের অভিজ্ঞতার পর কি বলেন দেখব।"

অবনী কোন জবাব দিলে না কাজেই তর্ক আর জমল না।

—সাত—

ব্রজেশ দত্তদের দল যে ষ্টেশনে নামল সেটা খুব বড় নয়। ষ্টেশনের পক্ষে খুব বেশী লোক জমা হয়েছিল। তারা গাড়ী থেকে নামতে সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তারা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। ব্রজেশ সকলের সঙ্গে অবনীর পরিচয় করে দিলেন। ব্রজেশ আর মলিনার গলায় মালা দেওয়া হল, হয়তো অবনীর গলায়ও একখানা মালা চাপত—নেহাৎ মালা ছিল না তাই সে সে যাত্রায় বেঁচে গেল। ষ্টেশনে অনেকগুলো মোটর অপেক্ষা করছিল, একখানাতে ব্রজেশবাবুদের তুলে নেওয়া হল, তার আগে ও পরে আরও খানে কয়েক মোটর চলল।

মোটরগুলো কুলি বস্তির দিকে না গিয়ে সহরের দিকে ফিরল দেখে অবনী একটু আশ্চর্য্য হল। এক ভদ্রলোকের বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াতে অবনী জিগেস করলে, "আমরা এখানে এলাম কেন?"

মলিনা আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে, "তবে কোথায় যাব?"

সেখানকার একজন লোক বললেন, "এতটা পথ এসেছেন একটু বিশ্রাম করুন তারপর কাজ তো আছেই। আপনাদের মত অতিথিকে সম্মান দেখান মানে নিজেদের সম্মান বাড়ান।"

অবনী দেখলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভদ্রলোকটী যে পরিমাণ

বিনয় দেখাতে আরম্ভ করেছেন তাতে শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন তা বলা যায় না।

গাড়ী থেকে নেমে অবনী দেখলে রীতিমত রাজসিক ব্যাপার। বাড়ী ফুল দিয়ে সাজান থেকে আরম্ভ করে বেশী দামী হাভানা চুরুট পর্য্যন্ত কিছুরই অভাব নেই। ব্রজেশ, মলিনা, কমল আর অবনীর জন্যে একজন করে চাকর, প্রত্যেকের ঘরে পাখাটানা কুলি ইত্যাদি।

হাত মুখ ধোয়ার পরই এল চা আর খাবার—কেক্, প্যাষ্ট্রী থেকে আরম্ভ করে কচুরি, সিঙ্গাড়া, সন্দেশ, রসগোল্লা কোনটাই বাকি ছিল না।

•জল খাওয়া হলে সেখানকার ক'জন লোক এলেন ব্রজেশ দত্তর সঙ্গে আলাপ, আলোচনা করতে। ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে ভদ্রতার খাতিরে অবনীকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হল। তারপর স্নান করতে যাওয়ার জন্যে তাগিদ এল। ভাত খাওয়ার আয়োজন দেখলে কেউ যদি ভাবত তারা নতুন জামাই তাহলে বোধ হয় অন্যায় হত না। অবনীর বিস্ময় ক্রমশঃ মাত্রা ছাপিয়ে যাচ্ছিল—মলিনা ঠিকই বলেছিল বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যা ভাবা যায় তারই দাম আছে।

খাওয়ার পর সে বেরুতে চাইলে কিন্তু সকলে আপত্তি করলেন, অত গরমে কোথাও যাওয়া যায় না, তাছাড়া খাওয়ার পরে বিশ্রাম করা চাই তো। অবনীর যে দুপুরে খাওয়ার পর পাখার তলায় শুয়ে থাকা অভ্যেস নেই সেকথা বললে কোন লাভ হত না; তা'কে বাধ্য হয়ে একা ঘরে বসে থাকতে হল। ব্রজেশ অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েন নি, তিনি এক গাদা কাগজ নিয়ে বসে "টাইপ" করছিলেন, তাঁর কাছে বসে থাকা যায় না, মলিনা আর কমল নিজের, নিজের ঘরে ছিল।

কুলি বস্তি দেখতে যেতে বিকেল প্রায় সন্ধ্যের গড়িয়ে গেল তাও ব্রজেশ

গেলেন না। তাঁর সব দেখা আছে অনেকবার, এমন কোন পরিবর্ত্তন হয়নি যার জন্যে তাঁকে নতুন করে দেখতে হবে।

অবনীরা যখন কুলি বস্তিতে গিয়ে পৌঁছুল তখন অনেকে কাজ থেকে ফিরে এসেছে। কেউ রান্নার জোগাড় করছে, কেউ সকাল বেলার রান্না ভাত থালায় বাড়ছে, কেউ চুপ করে বসে আছে, কেউ তাড়ি খেয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, জন কতক মাদল বাজিয়ে গান গাইছে। অবনী দেখলে তাদের সম্পত্তি হচ্ছে কতকগুলো মাটীর ভাঁড়, কলসী, ছেঁড়া কাপড়, চেটাই, ভাঙ্গা টিনের বাক্স আর পেতলের থালা তাও সকলের নেই।

একটী মেয়ে দেওয়ালে ঠেশ্ দিয়ে চুপ করে বসেছিল। অবনী তার কাছে গিয়ে বললে, "বসে আছ কেন? রান্না করবে না?"

মেয়েটী তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, "পয়সা দিবি বাবু?"

কমল বললে, "কেন পয়সা দেবে? তুই হপ্তা পাসনি? তোর মানুষটা হপ্তা পায় নি?"

মেয়েটী বললে, "হুঁ।"

কমল বললে, "তবে কেন পয়সা চাইছিস! পয়সা কি করলি?"

মেয়েটী বললে, "মানসের হপ্তায় সি তাড়ি খাইছে আর মোরটা আর্দ্ধেক মহাজন নিছে আর আদ্ধেক চাল কিনা খাইছ।"

কমল অবনীকে বুঝিয়ে দিলে এরা অভাবে পড়ে কাবুলির কাছে টাকা ধার করে আর তারপর সারা জীবন ধরে সুদ দিতে ফতুর হয়, আসল কখন শোধ হয় না। অবনী পকেটে হাত দিতে কমল বললে, "কত দেবেন ও রকম করে? ওদের সকলেরই ঐ এক কথা।" কোন কথা না বলে অবনী তাকে কি দিলে, সে অবনীকে সেলাম করলে।

কমল বললে, "ওদের দুর্গতির অনেক কারণ আছে। ওরা যা হপ্তা পায় তাতে ওদের ভালভাবে না চললেও কষ্ট করে হয়তো চলে কিন্তু ওরা

তাড়ি খেয়ে সব শেষ করে দেয় তার ওপর হপ্তা যা পাওনা তা পুরো পায় না।"

অবনী আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে, "তার মানে ?"

"সর্দার, ঠিকেদার সবাই ভাগ বসায় এই আর কি।"

"ওরা মালিকদের জানায় না কেন ?"

"জানিয়ে লাভ কি ? মালিকরা ঠিকেদার কি সর্দার কাউকে চটাতে চায় না ; তাদের ভয় তাহলে সময় মত লোক পাবে না আর কুলি মজুররা ওদের চটাতে সাহস পায় না ভাবে তাহলে মোটে কাজই পাবে না।"

"আপনারা এ সবের কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন না ?"

"আমরা কি করব ?"

"তবে আপনারা করেন কি ? ওদের দরজা গোড়ায় তাড়ির দোকানটা রয়েছে তাও বন্ধ করতে পারেন নি।"

"তাড়ির দোকান বন্ধ করব ? বলেন কি ? তাহলে তো ওরা একেবারে ক্ষেপে উঠবে, এদিকেই ঘেঁসতে দেবে না।"

"সেই ভয়ে আপনারা যা ভাল বলে জানেন তাও করবেন না ? আপনাদের সমিতি না সঙ্ঘ তবে করে কি আর আজ পর্য্যন্ত করেছেই বা কি ? কেবল দরকার মত ওদের ধর্ম্মঘট করতে বলেন, এই তো ?"

"ধর্ম্মঘট না করলে ওদের অবস্থার উন্নতি করা যায় না।"

"একদিন, দু'দিন কেন সারা জীবন ধরে ধর্ম্মঘট করলেও কিছু হবে না। যাক্ সে বিষয় এখানে তর্ক তুলতে চাই না। আমার ধারণা ছিল আপনারা বেশী না হলেও সামান্য কিছু কাজ করেন ; সবটাই যে ফাঁকি তা জানতাম না।"

একটা লোক ছুটে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, মলিনার সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল কিন্তু সে দাঁড়াল না। মলিনা তাকে ডাকলে, সে ফিরে এল না,

মলিনা খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এখানে সবাই তাকে চেনে, তার কথা শোনে; তাকে পেলে ছাড়তে চায় না। আজ হঠাৎ এর হ'ল কি? আর একজনকে ডেকে জিগেস করতে সে বললে, "সর্দ্দার মেরেছে।" মলিনা তার সঙ্গে সেই লোকটার ঘরে গেল, তাদেব সঙ্গে অবনী আর কমলও গেল।

ঘরে ডিপেটাও জ্বলে নি; ঘরের মেঝেয় একটা কালো শিশু প্রায় অন্ধকারের সঙ্গে মিশে শুয়ে আছে; জন কতক মেয়ে পুরুষ জটলা করছে। মলিনাকে দেখে একটী মেয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, "আমার মানুষটাকে মেরে ফেলেছে রে, দেখ।"

মলিনা বললে, "একটা আলো জ্বাল।" মেয়েটী একটা কেরোসিন তেলের ডিপে নিয়ে এল, কমল সেটা জ্বেলে দিলে। লোকটী হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজে বসেছিল। মেয়েটী ডিপেটা লোকটীর পিঠের কাছে ধরলে—দেখা গেল পিঠের চামড়া জায়গায়, জায়গায় ফেটে গিয়েছে, রক্ত পড়ছে। অবনী বললে, "একি? এ রকম ক'রে মারলে কে? হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন কমলবাবু।"

কমল বললে, "হাঁসপাতাল এখান থেকে অনেক দূর।"

"অন্ততঃ ডাক্তারের কাছে পাঠান।"

মলিনা লোকটীর কাছে বসে জিগেস করলে, "কেন মারলে?" লোকটী জবাব দিলে না। মলিনা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে, দিতে আবার জিগেস করলে, "কেন মারলে আমায় বল।"

লোকটী বললে, "তোদেরকে বলে কি হবে? কিচ্ছুটী না! সর্দ্দার মেরে পিটটী ভেঙ্গে দেয় তোবা উদেব কিচ্ছুটী বলিস না।"

অবনী জিগেস করলে, "সর্দ্দার মারলে কেন?"

লোকটী বললে, "তার ভাই আমার মেয়েমানুষটার নামে খারাপ কথা বলছিল, তারে একটা চড মারলাম তাই সর্দ্দার এসে আমায় চাবুক মারলে।"

অবনী জিগেস করলে, "থানায় খবর দিয়েছ ?"

লোকটী বললে, "না বাবু তাহলে মেরে খুন করে ফেলবে।"

বিরক্ত হয়ে অবনী বললে, "তবে মার খেয়ে চুপ্ করে থাকবে ?"

মলিনা বললে, "ডাক্তারের কাছে যা।"

অবনী জিগেস করলে, "তোমাদের সর্দ্দার কোথায় ?"

মেয়েটী বললে, "সে ইখন কোথাকে বস্তা তাড়ি খাইছে।"

ঘরের দরজায় বেশ ভিড় হয়েছিল। ভিড়ের পেছন থেকে একটা ছ'ফুট লম্বা লোক এগিয়ে আসতেই ভিড় কমে গেল। লোকটা ঘরেব ভেতর ঢুকে অবনীকে লক্ষ্য কবে বললে, "বান্দা হাজির, হুজুবকে ক্যা হুকুম ?" একটা সেলাম ও করলে।

অবনী জিগেস করলে, "উন্‌কো চাবুক লাগায়া কাহে ?"

"হামরা খোসি। আওর কুছ ?"

"কান্নুন কা বাৎ কুছ খেয়াল হায় ?"

"আরে কান্নুন দেখোগে তুম্ বাঙ্গালী, হামারা ওয়াস্তে ই'য়ে হায় কান্নুন" বলে সে হাতেব চাবুকটা দেখালে। অবনী খুব চটে গিয়েছিল কিন্তু জবাব দিলে না। লোকটা বললে, "তুম্ লোক হিঁয়া আতা আওরৎ কা......"

"খবরদার" বলে অবনী চেঁচিয়ে উঠল। লোকটা একটু পেছিয়ে গেল, তারপর হাসতে, হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটী বললে, "তুই চলে যাবি বাবু আর উ ইয়ার উপর মারবে।"

অবনী বললে, "থানায় নালিশ করে এস তাহলে আর মারবে না।"

মেয়েটী বললে, "উটি পারবেক না।"

মলিনা উঠে বললে, "ডাক্তারের কাছে যা, তা না হলে কাল কাজে যেতে পারবি না। চলুন অবনী বাবু মিটিংএর সময় হয়ে গেল।" তারপর ভিড়ের দিকে চেয়ে বললে, "তোরা সভায় যাবি না ?"

"না, যেতে বারণ করেছে।"

"কে?"

"ঠিকেদার বাবু, সর্দ্দাররা, সাহেব।"

নিষ্ফল রাগ মনের মধ্যে চেপে অবনী কমল ও মলিনার অনুসরণ. করলে। যাদের ওপর অত্যাচার হয় তারা চুপ করে বসে থাকবে, যারা প্রতিকার করবার ভার নিয়েছে তারা প্রতিকার করবে না, এ অবস্থায় সে কি করতে পারে? একজন সাহেব বেড়াতে বেরিয়েছিল। কমল তাকে দেখিয়ে অবনীকে বললে, "ও একজন বড অফিসার, অনেক টাকা মাইনে পায়।" অবনী সোজা তার কাছে গিয়ে বললে, "শুনলাম তুমি একজন বড অফিসার, তোমার কাছে একটা নালিশ করছি—তোমার এক সর্দ্দার এক কুলিকে ভয়ানক মেরেছে।"

সাহেব অবনীর আপাদমস্তক বার কয়েক দেখে নিয়ে বললে, "আমায় বলছ কেন? তোমাদের শ্রমিক সঙ্ঘ আছে, সেখানে যাও—আজকাল তো কুলিরা আমাদের কাছে আসে না।"

"এলে তোমরা কিছু কর না তাই আসে না।"

সাহেব বিরক্ত হ'য়ে জিগেস করলে, "তুমি কে?"

"আমি যেই হই তাতে যায় আসে না। কুলি আর সর্দ্দার দু'জনেই তোমার কাছে কাজ করে, তুমি তাদের মধ্যে বিচার করতে পার।"

"ওরা আমার কাছে নালিশ না করলে আমি কিছু করতে পারি না, তোমাদের কথা আমি শুনব না, তোমরা ওদের ক্ষেপিয়ে তুলছ, তোমরা বদ্‌মাস্।"

"চুপ্ কর। তোমার দেশের লোক তোমাকে স্বজাতি বলে স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করবে। সারা বিলেতে আমি তোমার জুড়িদার দেখি নি।"

অবনী আর কোন কথা না বলে চলে গেল। তার ভয়ানক রাগ হয়ে গিয়েছিল, সে সাহেবকে ভাল কথা বলতে গেল, সাহেব দিলে তাকে গালাগাল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সাহেবের গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে, "আমি শ্রমিক নেতা নই, একজন ব্যারিষ্টার" কিন্তু তার ব্যারিষ্টারি বুদ্ধির জন্যেই এ ইচ্ছেটাকে কাজে পরিণত করতে পারলে না। সে ফিরে আসতে মলিনা বললে, "ওর কাছে গিয়ে ভাল করেন নি, ওরা জানে বাঙ্গালী ভদ্রলোক এখানে আসে শুধু শ্রমিকদের ক্ষেপাতে।' অবনীর এতক্ষণে খেয়াল হল সাহেব কেন তার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করলে, সে কোন কথা বললে না, তাদের সঙ্গে চলল।

তারা যখন সভাস্থলে পৌঁছল তখন সেখানে বেশ ভিড় হয়েছে। মাঝখানে একখানা টেবিল আর খানকতক চেয়ার, সেখানে একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছিল, অন্য কোথাও আলো নেই। অবনী বললে, "একটু বেশী আলো দেবার ব্যবস্থা করেন নি কেন? এত কম আলোতে ··· "

মলিনা বললে, "সারা জীবন যাদের অন্ধকারেই কেটে যাবে, একদিনের জন্যে তাদের আলোর লোভ দেখিয়ে লাভ কি?"

ব্রজেশ দত্তর সঙ্গে দেখা হতে তিনি বললেন, "কোথায় গিয়েছিলে মলিনা? তোমাদের জন্যে সভা আরম্ভ করতে পারছি না; চল, আর দেরী কোর না।"

ব্রজেশ সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন, তাঁর এক পাশে বসল মলিনা আর এক পাশে জোর করে অবনীকে বসান হ'ল।

প্রথমেই বক্তৃতা করতে উঠল মলিনা। তার কথার মধ্যে কোথাও কোন জড়তা ছিল না; বললে সেই পুরোণ কথা—শ্রমিক আর বণিকের সম্পর্ক, শ্রমিকের দুঃখ কত আর তার প্রতিকার হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। সেদিনকার ঘটনার কোন উল্লেখ নেই দেখে অবনী আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

মলিনা বসতে অবনীকে কিছু বলবার জন্মে ব্রজেশ অনুরোধ করলেন। অবনী যখন এদের সঙ্গে কলকাতা থেকে আসে তখন এদের সভায় যোগ দেবাব ইচ্ছে তার ছিল না। কুলি বস্তিতে গিয়ে তার প্রথম সে ইচ্ছে হয়, তখনও বক্তৃতা করবার কথা সে ভাবতেও পারে নি কিন্তু এই আবহাওয়ার মধ্যে থাকতে, থাকতে তাব কিছু বলবার ইচ্ছে হল। সে উঠে দাঁড়াতে ব্রজেশ বেশ খুশী হয়ে উঠলেন।

অবনী তাব সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করলে, আজ পর্যন্ত শ্রমিক নেতারা যে কিছু করেন নি তা সে বেশ জোর দিয়েই বললে। এদের অতিথি হয়ে এসে এদের বিপক্ষে কিছু বলা অন্যায় জেনেও তাকে বলতে হ'ল, সেদিনকার অভিজ্ঞতার পর না বলে পারলে না। সে শ্রমিকদের স্পষ্ট বললে বাইরের লোকের ওপর নির্ভর করলে তাদের চলবে না, নিজেদের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের করতে হবে। মালিকরা যদি তাদের ঠকিয়ে থাকে তাহলে শ্রমিক নেতারাও ঠকিয়েছে। অবনী যখন তার বক্তৃতা শেষ করে বসল তখন সভার মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে— ব্রজেশ দত্তর ধরা-বাঁধা মুখস্থ করা বুলি কেউ শুনলে না।

মিটিং শেষ হতে অবনী বললে, "এবার তো ফিরতে হয়, এখনও চেষ্টা করলে শেষ ট্রেণটা পাওয়া যাবে।"

ব্রজেশ যেন আকাশ থেকে পড়লেন; জিগেস করলেন, "কোথায় যাবেন এত রাত্রে ?"

"কলকাতায় ফিরতে হবে তো।"

"আজকে যাওয়ার কথা উঠতেই পারে না। এঁরা এখানে বেশ ভাল ব্যবস্থাই করে রেখেছেন, আপনার কোন অসুবিধে হবে না।"

"অসুবিধের কথা হচ্ছে না, আমার যাওয়া দরকার।"

মলিনা বললে, "সেই ভাল, চলুন আমিও যাই।"

ব্রজেশ বললেন, "তোমার যদি এই রকম ইচ্ছেই ছিল তা'হলে আগে বলনি কেন ? এঁরা এত কষ্ট করে সব আয়োজন করেছেন···· "

অবনী মলিনাকে বললে, "না, না আপনার গিয়ে কাজ নেই, রাত অনেক হয়েছে, তা'ছাডা আপনি শ্রান্ত।"

মলিনা মোটেই সন্তুষ্ট হ'ল না, কিন্তু তাকে থেকে যেতে হ'ল। অবনী ষ্টেশনের দিকে গেল, সঙ্গে যাওয়া তো দূরের কথা একখানা গাডী ঠিক করে দেবার কথাও তা'র মনে হ'ল না। কমল নিজে থেকে তার পেছনে, পেছনে গিয়ে গাড়ীর আড্ডা থেকে একখানা গাডী করে দিলে।

একজন রিপোর্টার এসে ব্রজেশকে নমস্কার করে বললে, "সার্ আসতে পারি নি, বড্ড কাজ পডেছিল। একটা রিপোর্ট যদি সেক্রেটারীকে দিতে বলেন। আমি এখনই 'তার' করে পাঠিয়ে দোব।"

ব্রজেশ বললেন, "আপনারা কেউ আসেননি দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম। মিষ্টার গুপ্ত যা বক্তৃতা আজ দিয়েছেন পড়ে কর্ত্তাদের মাথা ঘুরে যাবে। ভাগ্যিস তিনি 'কপি' সঙ্গে করে এনেছিলেন, তা না হ'লে অমন বক্তৃতাটা মাঠে মারা যেত। এই নিন কপি।"

রিপোর্টার সানন্দে 'কপি' নিয়ে চলে গেল, সে জানতেও পারলেনা এগুলো ব্রজেশ সারাদিন ধরে তৈরী করেছেন। কোন রকমে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে 'তার' করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলে।

খাওয়া শেষ করে শুতে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল। মলিনা বুঝেছিল ব্রজেশ তার ওপর চটেছে, কারণটা ঠিক করে নিতেও তার সময় লাগল না কিন্তু সে তাতে একটুও বিচলিত হ'ল না, তা'ছাড়া তার বড্ড ঘুম পেয়েছিল, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে প'ড়ল।

যে ঘরে মলিনা শুয়েছিল সে ঘরে দু'টো দরজা, একটা বাহিরের দিকে, আর একটা অন্য একখানা ঘরে যাবার। ঘরে থাকবার মধ্যে ছিল একখানা

খাটিয়া, মলিনা তার ওপর শুয়ে ছিল—এক কোনে একটা ছোট টেব্ল, তার ওপর একটা টেব্ল ল্যাম্প তার আলোটা খুব কমান, আর একটা টাইম্ পিস্। রাত তখন প্রায় দেড়টা, মলিনা নির্ব্বিকারভাবে ঘুমুচ্ছে। যে দরজাটা দিয়ে অন্য ঘরে যাওয়া যায় সেটা আস্তে, আস্তে খুলে গেল, ঘরে ঢুকল ব্রজেশ দত্ত, নিখিল ভারত শ্রমিকোন্নয়ন সঙ্ঘের সভাপতি ব্রজেশ দত্ত, দেশ বিখ্যাত নেতা ব্রজেশ দত্ত, শ্রমিকের জন্যে সর্ব্বস্বত্যাগী ব্রজেশ দত্ত। কিছুক্ষণ মলিনার দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্চিন্ত আরামে সে ঘুমুচ্ছে, মুখে ফুটে উঠেছে পরিপূর্ণ শান্তি। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে, থাকতে ব্রজেশের চোখ দু'টো হিংস্রতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তার বাইরের সম্পূর্ণ শান্ত আচরণের সঙ্গে অন্তরের লোলুপতার হচ্ছিল এক ভীষণ সংঘর্ষ আর তার রূপ ফুটে উঠেছিল চোখের পটভূমিতে।

বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর ব্রজেশ আস্তে, আস্তে মলিনার বিছানায় বসল। আরও খানিকক্ষণ দেখে তার গায়ে হাত দিলে, মলিনা পাশ ফিরে শোয়ার চেষ্টা করতে ব্রজেশ হাত সরিয়ে নিলে। একটু পরে সে আবার তার গায়ে হাত দিতে মলিনা উঠে বসল। ঘরের অস্পষ্ট আলোয় ভয় পেয়ে সে জিগেস করলে, "কে? কে তুমি?" ব্রজেশ আরও কাছে এসে বললে, "চুপ, চেঁচিও না, আমি।" মলিনা নিজের চোখ, কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না; ব্রজেশের সম্বন্ধে সে আর যাই ভাবুক এ ধারণা তার মনে আসে নি। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রকমে বুঝতে না পেরে সে বললে, "আপনি এ সময়, এ ভাবে আমার ঘরে·· ···" কথা গুলো সে শেষ করতে পারলে না। এর স্বাভাবিক অর্থ যা, তা ভাবতেও তার সাহস হচ্ছিল না।

ব্রজেশ বললে, "কেন? তা'তে কি হয়েছে?"

মলিনার যেন চমক্ ভাঙ্গল, সে বললে, "না, না আপনি যান, আপনি যান।"

যাবার কোন লক্ষণ না দেখিয়ে ব্রজেশ বললে, "কেন ?"

"জিগেস করতে আপনার লজ্জা করছে না ? এত রাত্রে এই ভাবে কোন মেয়ের ঘরে ঢোকা · ·· " সে থেমে গেল।

ব্রজেশ একটু হেসে বললে, "মেয়েটী অন্য কেউ নয়, শ্রীমতী মলিনা। শুধু, শুধু সময় নষ্ট কোর না। এত চমৎকার সুযোগ আবার কবে পাওয়া যাবে তা কে বলতে পারে ? অনেক দিন এর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে।"

মলিনা যেন তার কথা শুনতেই পায় নি এমনভাবে বললে, "আপনি আমার বেঁচে থাকাব একটা অবলম্বন করে দিয়েছেন তাই অনেক কিছু অন্যায় জেনেও প্রতিবাদ করি নি। লোকে অনেক কথা বলে, কানে আসে নিরুপায়ের মত শুনে যাই। আমি কোনদিন ভাবতেও পারি নি ···"

"ভাববাব কোন দরকার নেই" বলে ব্রজেশ মলিনাব হাত ধরলে। হাত ছাড়াবাব চেষ্টা করে মলিনা বললে, "আপনার পায়ে পড়ি ছেড়ে দিন। আপনার একটা সামান্য খেয়ালের জন্যে আমার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে দেবেন না।"

"জীবনের সম্বন্ধে এখনও কোন আশা রাখ না কি ? শোন, ব্রজেশ দত্তর হাত থেকে আজ পর্যান্ত কোন মেয়ে এমনি ফিরে যায় নি, তুমিও যাবে না।"

"এক সময় আপনাকে বাপের মত শ্রদ্ধা করেছি ·····"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ব্রজেশ বললে, "এক সময় করেছ ? যাক্ তা'হলে আজ আর করনা, বাঁচা গেল।" সে উঠে গিয়ে আলোটা আরও কমিয়ে দিয়ে এল। তার শেষ কথাগুলো শুনে মলিনার মনে হচ্ছিল সে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখছে—সত্যিকার মানুষ যে এতটা নীচ হতে পারে তা তার জানা ছিল না। কিছুক্ষণের জন্যে সে যেন তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে গেল। ব্রজেশ বললে, "আমার চোখে ধুলো দিতে পার নি।'

ক'দিন আগে হলে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে তুমি নিজেকে ধন্য মনে করতে ; তখনও তোমার মনে রঙ্গিন কল্পনা দেখা দেয় নি। আজ তুমি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছ……"

হঠাৎ যেন মলিনা নিজেকে খুঁজে পেলে, সে বললে, "তাতে আপনার কি বলবার থাকতে পারে ?"

"পারে বৈ কি। নিঃস্বার্থ হয়ে ব্রজেশ দত্ত কখনও কোন কাজ করে না।"

অসহায়ভাবে মলিনা বললে, "আপনি এত হীন ‥"

হেসে উঠে ব্রজেশ বললে, "তা আগে জানতে না, এই তো ? তার জন্যে আর এখন দুঃখ করে লাভ কি ? এস।" সে আবার মলিনার হাত ধরবার চেষ্টা করতে মলিনা ছিট্‌কে সরে গেল ; আত্ম-রক্ষার উপায় তার সঙ্গেই থাকে সেকথা সে ভুলে গিয়েছিল। বালিসের তলা থেকে একখানা ছোরা বার করে বললে, "এখান থেকে এখনি যাবেন কি না ? আপনার মত একজন শয়তানকে খুন করে যদি ফাঁসি যেতে হয় তাহলে বুঝব‥ ‥"

দাঁতে দাঁত চেপে ব্রজেশ বললে, "যেদিন তোমার ঐ দেহ কুলি মজুরদের কামনার খোরাক যোগাবে‥ ‥"

সব ভুলে মলিনা চীৎকার করে উঠল, "বেরিয়ে যাও বলছি, বেরিয়ে যাও……"

মলিনার ঘরের বাইরের দিকের দরজায় কে ধাক্কা দিলে ; ব্রজেশ তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে, মলিনা ছোরা খানা বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখলে। বাইরে থেকে আবার কে ধাক্কা দিলে, মলিনা জিগেস করলে, "কে ?"

জবাব এল, "আমি কমল, দরজাটা খুলুন।"

মলিনা দরজা খুলে দিতে কমল ঘরের ভেতর এসে জিগেস করলে, "কি হয়েছিল মলিনা দি ? আপনি ওরকম চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কেন ?"

মলিনা জিগেস করলে, "খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম কি ?"

"নিশ্চয়, তা না হলে শুনতে পেলাম কি করে ?"

"একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম তাই বোধ হয় ঘুমন্ত চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।"

"ঘুমন্ত ?"

কথাটায় যথেষ্ট অবিশ্বাস প্রকাশ পেল কিন্তু মলিনা আর কিছু বললে না। সে যে প্রায় সমস্ত ঘটনাটাই বাইরে থেকে শুনেছে সেকথা জানতে পাবলে মলিনা তার ওপর খুসি নাও হতে পারে ভেবে কমলও চুপ করে গেল।

মলিনা জিগেস করলে, "তুমি কি ঘুম থেকে উঠে এলে ?"

"না, এইমাত্র আজকের রিপোর্টটা লেখা শেষ হল, সবে শুতে যাচ্ছি আর আপনি চেঁচিয়ে উঠলেন।"

"রিপোর্টার আসেনি কেন বল তো ? বক্তৃতার নকল চাইতেও তো আসা উচিত ছিল। দেখি কি লিখলে, আজকের রিপোর্টটা আমায় দিয়ে যাও।"

"আমারও খুব আশ্চর্য্য লাগছে। মিটিংএ না এলেও পরে এসে রিপোর্ট চায়। কি হল কে জানে ? আপনি এখন কি পড়বেন না কি ?"

"হাঁ, কি জানি যদি আবার সেই স্বপ্নটা দেখতে হয়।"

কমল বুঝতে না পেরে খাতাখানা এনে তার হাতে দিয়ে গেল, সে বসে পড়তে আরম্ভ করলে ; তার ঘরের দরজা খোলাই রইল। কিছুক্ষণ পরে ব্রজেশ একবার দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখে দরজা বন্ধ করে দিলে।

—আট—

অবনী সকাল বেলা এল না, ফোন্‌ও করলে না দেখে অলকার প্রথম মনে হয়েছিল তার রাগ এখনও পড়ে নি, মলিনাদের সঙ্গে সত্যিই যে সে

যেতে পারে এ কথা তার মোটেই মনে হয় নি। একবার ভাবলে ফোন্ করে আসতে বলে কিন্তু তা পারলে না, তার আত্ম-সম্মানে বাধল। সারাদিন সে অবনীর জন্যে অপেক্ষা করে বাড়ীতে রইল কিন্তু সে এল না। সন্ধ্যের পর সে ফোন্ করলে; সারাদিন ধরে সে নিজেকে বুঝিয়েছে দোষ তারই, অবনী অন্যায় কিছু বলে নি, হার তারই স্বীকার করা উচিত। সে আশা করেছিল অবনীও তার ফোন্ করার অপেক্ষা করছে কিন্তু ফোন্ ধরলে তার বেয়ারা, সে জানালে অবনী সেই সকাল বেলা বেরিয়ে গেছে, কোথায় গেছে বলে যায় নি।

অলকা ভয়ানক রকম চটে গেল। সে ভেবেছিল অবনী হয়তো রাগ করে এক বেলা আসবে না কিন্তু অত করে বারণ করার পরও যে সে মলিনাদের সঙ্গে যেতে পারে এ ধারণা তার ছিল না। রাত প্রায় দশটার সময় সে আবার ফোন্ করলে, উদ্দেশ্য ছিল বেশ কড়া রকম গোটা কতক কথা শোনায় কিন্তু বেয়ারা জানালে সে তখনও ফেরে নি। রাগে, অভিমানে সে প্রায় অন্ধকার দেখতে লাগল, তার ওপর লক্ষ্মীকান্তর প্রশ্ন। সারাদিনে অন্ততঃ তিনি পঞ্চাশবার জিগেস করেছেন তাদের কি হয়েছে, অবনী এল না কেন।

সমস্ত রাতটা অলকার ভয়ানক অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে গেল, ভোরের দিকে একটু ঘুম এসেছিল। সে স্বপ্ন দেখলে অবনী আর মলিনা পাশাপাশি কুলি বস্তির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তারা হেসে গল্প করছে, দুজনেই খুব খুসী। অলকার ঘুম ভেঙ্গে গেল, ঘামে বিছানাটা ভিজে গিয়েছে, ঘরে রোদ এসে পড়েছে। আধুনিক মেয়ে হলেও অলকা ভুলতে পারলে না 'ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়'—যদি তার স্বপ্ন সত্যি হয়? যদি ······তার আর ভাবা হল না তার বাবার গলা তার কানে এল, তাকেই ডাকছেন।

এত সকালে তার নাম ধরে ডাকবার, বিশেষ ও রকম চেঁচিয়ে ডাকবার,

কি কারণ থাকতে পারে ? অবনী যদি এসে থাকে সে তো সোজা ড্রয়িংরুমে চলে এসে চাকরকে দিয়ে খবর দেবে। কোন রকমে মুখটা একটু পরিষ্কার করে আর চুলটা ঠিক করে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, তার দরজায় লক্ষ্মীকান্ত বেশ জোরে ধাক্কা দিলেন। সে দরজা খুলে দিয়ে সামনে দাঁড়াতেই লক্ষ্মীকান্ত প্রায় কাঁদ, কাঁদ স্বরে বললেন, "দেখ, দেখ একবার কাণ্ডটা দেখ।" তিনি একখানা খবরের কাগজ অলকার সামনে এগিয়ে দিলেন। সে কিছুমাত্র বুঝতে না পেরে জিগেস করলে, "কি হয়েছে কি ? কার কাণ্ড ?" "অবনীর, আবার কার ? কাল রাত্রে কোথায় গিয়ে কি সব ভয়ানক রাজদ্রোহী কথা বলে এসেছে দেখ। এত বড় জানোয়ার কি আর দেখতে পাওয়া যায় ? বিলেত গেলে কি হবে ? এক পুরুষে কি আব সভ্য হয়। বাপ চিরদিন জঙ্গলে কাটিয়ে এসেছে, ভদ্র সমাজে কখন মেশে নি ; ওর ক্ষমতা কি ও ভদ্র সমাজে থাকে ? কত চেষ্টা করে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ, সালাপ করিয়ে দিচ্ছি তা কিনা সব পণ্ড করে দিলে ? আমি এখন কি করি ?"

অলকা ততক্ষণে লক্ষ্মীকান্তর হাত থেকে খবরেব কাগজখানা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য কাগজে যা বেরিয়েছিল তা অবনীর বলা নয়, ব্রজেশের লেখা। লক্ষ্মীকান্ত নিজের মনে বকে যেতে লাগলেন ; অলকার পড়া শেষ হলে সে বললে, "আমার মনে হয় উনি এ সব কথা বলেন নি আর বললেও নিজের ইচ্ছেয় বলেন নি।"

দাঁত, মুখ খিঁচিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "তার মানে ? খবরের কাগজ-ওয়ালারা কি মিথ্যে করে লিখেছে ? তাদের আইনের ভয় নেই ? আর ও কি কচি খোকা যে ওকে দিয়ে বলিয়ে নেবে ? হঠাৎ বড়লোক হলে ....."

অলকা তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে বললে, "ওদের দলে পড়লে সবাই ছেলেমানুষ হয়ে যায় বাবা।"

"তুই জানতিস ও যাবে ?"

"হাঁ, জানতাম।"

হতাশ হয়ে লক্ষ্মীকান্ত জিগেস করলেন, "তাহলে বারণ করিস নি কেন ? এত বড় সর্ব্বনাশ····· "

"বারণ করেছিলাম।"

"তা সত্ত্বেও গিয়েছিল ? তবে তো ও তৈরী হয়েই গিয়েছিল।"

"না, তা যায় নি ; ও সব কথা বলবার ইচ্ছেও তার ছিল না তা আমি জানি। ওকে ডেকে জিগেস কর, নিজেই স্বীকার করবে।"

"তুই ফোন্ কর, আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না।"

অলকা যখন ফোন্ করলে তখন অবনী সবে উঠে চা খেতে আরম্ভ করেছে, খবরের কাগজখানাও খুলে পড়ে নি। চা দিয়ে চাকরটা জানালে কাল অনেকবার অলকা ফোন্ করেছিল। অবনী নিজের মনে হেসে উঠল ; একদিন না যেতেই বাব কতক ফোন্ করেছে, আজও যদি না যায় অলকা নিজেই এসে হাজির হবে। ততদূর পর্য্যন্ত দেখবার লোভ অবশ্য তার ছিল না, কাগজটা পড়ে একটু পরেই যাবে ভাবছিল, ঠিক সেই সময় অলকার ফোন্ এল। সে শুধু বললে, "এখনি চলে এস, যেমন অবস্থায় আছ।" অবনী কোন কথা জিগেস করবার আগেই সে ফোন্ রেখে দিলে ; অবনী ভাবলে একদিনের অদর্শন তার এত খারাপ লেগেছে যে সে একটুও দেরী করতে রাজি নয়। সে চা খেয়েই বেরিয়ে গেল।

অবনীর সঙ্গে প্রথমেই দেখা হল লক্ষ্মীকান্তর। তিনি প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলেন, "এ কি করেছ কি ?" অবনী এ রকম অভ্যর্থনার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে জিগেস করলে, "কেন ? কি করেছি ?"

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "কি করেছ জান না ?" তাঁর গলার আওয়াজে

অবনী বিরক্ত হল। অলকা খবরের কাগজখানা তুলে তার হাতে দিলে। অবনী সবটা পড়ে গেল, ছাপার অক্ষরে যা বেরিয়েছে তা ভয়ানক রকম রাজদ্রোহী। তার বেশ মনে আছে এ সব কথা সে বলে নি, আর বললেই বা খবরের কাগজওয়ালারা পেলে কোথায়? তার যতদূর মনে আছে কেউ 'নোট' নেয় নি। সে সব কথা না তুলে সে বললে, "হাঁ, কি হয়েছে?" লক্ষ্মীকান্ত প্রায় ক্ষেপে উঠে বললেন, "কি হয়েছে তা এখনও বলে দিতে হবে? হাতে দড়ি পড়বে যে।"

অবনীরও সহ্যের একটা সীমা আছে, লক্ষ্মীকান্তর আচরণের রূঢ়তা সেই সীমায় পৌঁছে দিলে। সে বললে, "হাতে দড়ি পড়লে নিশ্চয় আমারই পড়বে, সে সঙ্গে কিছু আপনাদের কাউকে বিরক্ত করবে না।"

লক্ষ্মীকান্ত কি বলতে গেলেন, অলকা বাধা দিয়ে বললে, "তুমি চুপ কর বাবা, ওঁর এখন মাথার ঠিক নেই, কাকে কি বলছেন তা হয় তো বুঝতে পারছেন না।"

অবনী জিগেস করলে, "আমার মাথার ঠিক না থাকার কোন বিশেষ কারণ আছে কি?"

অলকা বললে, "নিশ্চয় আছে। মাথার ঠিক থাকলে যত সব ছোট লোক আর কুলিদের সভায় তুমি এ সব কথা বলতে পারতে না।"

অবনী বিরক্ত হয়ে বললে, "এ জন্যে যদি জরুরি তলব দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে থাক তাহলে এখন চল্লাম, আরও অনেক কাজ আছে।" অলকার চোখ, মুখ লাল হয়ে উঠল।

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "দাঁড়াও। তুমি এত সহজে উড়িয়ে দিতে পার কিন্তু আমি পারি না।"

বেশ সহজভাবে অবনী বললে, "আমি যদি পারি, আপনিই বা পারবেন না কেন?"

লক্ষ্মীকান্ত বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, "না, তা পারব না কারণ আমার মেয়েকে তোমার হাতে দিতে হবে।"

অবনীর ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, "তা না হয় নাই দিলেন" কিন্তু তাকে অতবড় একটা ভয়ানক কথা বলার হাত থেকে বাঁচালে টেলিফোনের ঘণ্টাটা বেজে উঠে। লক্ষ্মীকান্ত ফোন্ তুলে বললেন, "লক্ষ্মীকান্ত। কে? রায় বাহাদুর? হাঁ, দেখেছি।" তারপর টেলিফোনে হাত চাপা দিয়ে বললেন, "যা ভেবেছি তাই, এর মধ্যে সারা কলকাতা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। যাবেই তো, কাগজে যখন বেরিয়েছে।"

অলকা বললে, "ওঁকে একবার বলে দেখ না বাবা, যদি কোন উপায় কবতে পারেন। ওঁর তো অনেক চেনাশুনো আছে।"

লক্ষ্মীকান্ত টেলিফোনে বললেন, "দেখুন রায় বাহাদুর, অলকাব মুখ চেয়ে আপনাকে একটা উপায় করতেই হবে। না, না চেষ্টা করব বললে চলবে না, ভুল কবে ফেলেছে" আবার টেলিফোনের মুখ চেপে বললেন, "উনি কথা দিতে পাবছেন না তবে প্রথম অপরাধ, ক্ষমা চাইলে যদি কর্ত্তারা ছেড়ে দেন চেষ্টা কবে দেখতে পারেন।"

অবনী বললে, "আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন সে জন্যে ধন্যবাদ, আর কিছু না কবলেও চল্‌বে।"

লক্ষ্মীকান্ত কোন রকমে নিজেকে সংযত করে টেলিফোনে বললেন, "রায় বাহাদুর, একটু পবে আপনাব কাছে যাচ্ছি, আচ্ছা, নমস্কার।" টেলিফোন্ ছেড়ে দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন, "তোমার ইচ্ছে মত যে সব কাজ করতে হবে তার মানে কি? আমার মেয়েকে বিয়ে করতে গেলে ও সব খেয়াল ছাডতে হবে।"

অবনী নিজেকে সংযত করে বললে, "আপনার মেয়েকে বিয়ে করে আমার এমন কিছু সম্মান বাডছে না যার জন্যে আমার ব্যক্তিগত বিষয়ও আপনার

হাতে ছেড়ে দিতে পারি। আপনার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে অতখানি ত্যাগ স্বীকার নাও করতে পারি।"

অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "দাঁড়া নি দাঁড়া, শেষ কথা স্পষ্ট করে হয়ে যাক্।"

অলকা তাঁকে থামাতে চেষ্টা করলে কিন্তু তিনি না থেমে অবনীকে জিগেস করলেন, "তুমি রায় বাহাদুরের পরামর্শ মত ক্ষমা প্রার্থনা করবে কি না?"

অবনী বললে, "অন্যায় করে থাকলে তার শাস্তি নেবার মত সাহস আমার আছে। তার জন্যে কা'র .. ... "

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "ব্যাস্, আর দরকার নেই। তোমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আজ থেকে শেষ হয়ে গেল, আশা করি আর এ বাড়ীতে আসবে না। আমার মেয়ের বিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি দোব, অন্ততঃ তোমার চেয়ে খারাপ পাত্রে দোব না।" অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবনী বললে, "শুনে আশ্বস্ত হলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি .... "

লক্ষ্মীকান্ত চীৎকার করে উঠলেন, "যথেষ্ট হয়েছে, চুপ কর।" অবনী ঘর থেকে চলে গেল, লক্ষ্মীকান্ত একটা মোটা চুরুট ধরালেন। আবার টেলিফোন্ বেজে উঠল। সেই এক প্রশ্ন "কাগজ দেখেছেন?" পর, পর ক'টা ফোন্ আসতেই লক্ষ্মীকান্ত রিসিভারটা তুলে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

—নয়—

অলকাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যতগুলো খবরের কাগজ পাওয়া গেল অবনী তা কিনলে। বাড়ী ফিরে সে সবগুলো পড়লে, সবাই এক কথা

লিখেছে, কোথাও কোন তফাৎ নেই। তার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এ রকম অক্ষরে, অক্ষরে মিল হয় কি করে? তার মনে হল একই রিপোর্ট থেকে তারা সবাই ছেপেছে। 'নিজস্ব সংবাদ দাতা কর্তৃক প্রেরিত' লেখা থাকলেও কা'র সংবাদ দাতাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, থাকলে সে দেখতে পেত আর রিপোর্টে কিছু, না কিছু পার্থক্য থাকতই। কাগজে যা বেরিয়েছে তার একটা কথাও সে বলেছে বলে স্মরণ করতে পারলে না। যত উত্তেজনার মাথায়ই কথা বলে থাক, সে এমন ছেলেমানুষ নয় যে যা বলেছে তার কিছুই মনে করতে পারবে না। যে কথাগুলো ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে সেগুলো তার বিপক্ষে প্রমাণ করতে পারলে তার অপরাধ বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে। সভার বিবরণে তাকে যেন আশ্চর্য্য রকম প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, মলিনা বা ব্রজেশের বক্তৃতার একটা কথাও তার মধ্যে নেই।

নিজে কিছু ঠিক করতে না পেরে অবনী তার সিনিয়ার মিষ্টার সেনের সঙ্গে দেখা করলে। মিষ্টার সেন তাকে দেখেই বললেন, "এসেছ? এই মাত্র তোমায় ফোন্ করেছিলাম। এ কি করেছ হে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছিল?"

অবনী হাসতে, হাসতে বললে, "না সার মাথা তো তখন খারাপ হয় নি কিন্তু এখন যে বেশ ভাল করেই হচ্ছে।"

"কেন? এর মধ্যে তলব এসেছে নাকি?"

"না আসেনি তবে আসতে বোধ হয় বেশী দেরী হবে না। প্রায় সব ক'খানা কাগজই পড়ে দেখলাম, সবাই হুবহু এক কথা বলছে।"

"তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? ধর একই সংবাদ সরবরাহ কোম্পানী সব কাগজকেই রিপোর্ট পাঠিয়েছে আর কাগজওয়ালারা তার ওপর রং ফলাবার সময় পায় নি।"

"আমি তো অনেক চেষ্টা করেও এর একটা কথাও বলেছি বলে মনে করতে পারলাম না। যতদূর মনে পড়ে আমি তাদের বলেছিলাম কোন লোককে তোমাদের ওপর জুলুম করতে দিও না, নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর; তাড়ি খেও না এই সব।" মিষ্টার সেন চিন্তিত হয়ে জিগেস করলেন, "তবে? তোমাব কি মনে হয়?"

"স্পষ্ট কোন ধারণা নেই তবে ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে।"

"সেই কথা ভেবেই তোমার কাজ শেষ হবে না; তোমার মনে কবতে হবে তোমার মক্কেলের কাজ করছ, শুধু নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ না।"

"কোন রিপোর্টারকে তো সেখানে দেখিনি। মিটিংএ ছিল একটা মাত্র পেট্রোম্যাক্স, আমাদের সামনে; ওদের সেক্রেটারী সেখানে বসে নোট নিচ্ছিল, তাও সর্টহ্যাণ্ডে নয়। এ রকম বিশদভাবে····· "

"তুমি কি বলতে চাও কেউ কতকগুলো কথা তোমার নামে চালিয়ে দিয়েছে? বল কি?" মিষ্টার সেন ব্যাপারটা কল্পনা করেই চমকে উঠলেন।

অবনী বললে, "ঠিক বলতে পারছি না কিন্তু···· "

"তোমাদেব সঙ্গে কে, কে ছিল বলত? মানে তাদের একটা পরিচয়-লিপি দাও।"

"তাদের সঙ্ঘের সভাপতি ব্রজেশ দত্ত, সম্পাদক কমল আর—" একটু থেমে অবনী বললে, "মিস্ দত্ত।"

"তোমার ওদের সঙ্গে যাওয়াটা ভারি অন্যায় হয়েছিল। যাদের কাউকে তুমি চেননা অথচ জান তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলা, তাদের সঙ্গে গেলে কি করে? মেয়েরা ওসব দলে কি জন্যে থাকে জান? তোমার মত ছেলেদের দলে টানবার জন্যে।"

মিষ্টার সেনের স্পষ্ট কথায় অবনী খুসী হতে পারলে না। তিনি তাঁর

অভিজ্ঞতা থেকে বলছিলেন কিন্তু যারা বয়সে ছোট তারা সাধারণতঃ বয়সে যারা বড় তাদের অভিজ্ঞতার উচিত দাম দেয় না, অবনীও দিতে পারলে না। মলিনার সম্বন্ধে তাঁব কথাগুলো প্রয়োগ কবতে তার মন সায় দিচ্ছিল না সেকথা বুঝতে মিষ্টার সেনের বিশেষ সময় লাগল না। তিনি বললেন, "অবশ্য আমি বলছি না তোমার এই মিস্ দত্ত না কি তিনিও তাই—অনেক ক্ষেত্রে ঐ রকম দেখেছি কিনা তাই বলতে হয়। হাঁ, ওর ওখানে কাজ কি ?"

"তা তো জানি না তবে ব্রজেশবাবু খুব ভালবাসেন দেখলাম।" মিষ্টার সেন হাসতে, হাসতে বললেন, "সেটা এত অল্প সময়ে বুঝতে পেরেছ ?"

অবনী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "মানে আমি সে বকম ভালবাসা বলছিনা।"

"বললেও আমি আশ্চর্য্য হতাম না। তিনি কোন বক্তৃতা করেছিলেন ?"

"হাঁ, করেছিলেন কিন্তু কাগজে তার কোন উল্লেখ নেই।"

মিষ্টার সেনের কপালে কতকগুলো রেখা দেখা দিল। তিনি বললেন, "তোমার এই মিস্ দত্তর সঙ্গে কথা বলার দরকার—যদি মামলা হয়, অবশ্য হবে বলেই তো মনে হচ্ছে, এত আগুন কোন গভর্ণমেণ্ট সহ্য করতে পারে না।"

একটু পরে অবনী বললে, "আচ্ছা, ওদেব কা'র সঙ্গে এখন দেখা কবা চলতে পারে ?"

"কা'র সঙ্গে মানে মিস্ দত্তর সঙ্গে তো ?" বলে মিষ্টাব সেন হেসে উঠলেন। একটু পরে বললেন, "আমার মনে হয় একেবারেই উচিত হবে না। ওদেব মধ্যে কা'র সঙ্গে তোমাব বেশী পরিচয় আছে প্রমাণ করতে পারলে পুলিশের কাজ খুব সোজা হয়ে যাবে। হাঁ, তোমার সঙ্গে কে, কে এসেছিল ?"

"কাল রাতে আমি একাই এসেছি, ওঁরা বোধ হয় আজ এসেছেন।"

"তোমার সঙ্গে কেউ আসতে চায় নি ?"

একটু লজ্জিত হয়ে অবনী বললে, "হাঁ, মিস্ দত্ত আসতে চেয়েছিলেন।"

"কি হ'ল ? ব্রজেশ বারণ করলে ?"

অবনী আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "হাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন ?"

"এমন আর কি শক্ত ? কমল বা অন্য কেউ বারণ করলে তিনি নিশ্চয় শুনতেন না। যাক্, লক্ষ্মীকান্ত নিশ্চয় এতক্ষণ লাফাতে আরম্ভ করেছে ?"

কিছুক্ষণ আগে লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরীর বাড়ীতে যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছে অবনী তা মিষ্টার সেনকে জানাতে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওর কি সত্যি মাথা খারাপ নাকি ? কোথায় কি ভাব ঠিক নেই, এমন একটা কাণ্ড করে বসল ? যাক্‌গে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, রাগের মাথায় বলেছে, রাগ পড়লেই বুঝতে পারবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"তিনি রাগের মাথায় যাই বলুন, আমি রাগের মাথায় জবাব দিই নি।" কথাগুলোর তাৎপর্য্য বুঝে মিষ্টার সেন তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "আচ্ছা সে সব পরের কথা, কি হয় দেখা যাবে।"

"আজ কালের মধ্যে গ্রেপ্তার করতে পারে বলে মনে হয় ?"

"অতটা করবে বলে মনে হয় না, তা'ছাড়া তুমি যা বলছ তাতে কিছু না করাও অসম্ভব নয়। আসল ব্যাপারটা জানতে পারলে পুলিশের পক্ষে "কেস" করা ঠিক হবে না। যা হয় হবে, তুমি ও নিয়ে বেশী ভেবো না, ভয় পাবার কিছু নেই।"

অবনী চলে গেল। মিষ্টার সেন কাজে মন দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু অবনীর কথাগুলো তাঁর মাথার মধ্যে ভিড় করে রইল। জোর করে খানিকক্ষণ কাজ করবার চেষ্টা করে তিনি পুলিশ বিভাগে তাঁর দু' একজন বন্ধুর সঙ্গে এ প্রসঙ্গ একটু আলোচনা করলেন, অবশ্য অবনী যে সব সন্দেহ করেছিল তার কোন আভাষ দিলেন না। যা শুনলেন তাতে বেশ নিশ্চিন্ত

হওয়া যায় না, তিনি ঠিক করলেন মলিনা আর কমলের কাছে ঘটনার বিবরণটা শুনবেন।

পর দিন অবনী আসতে তিনি সে কথা বললেন, সে তার ব্যবস্থা করবে বললে কিন্তু তাদের কা'র সঙ্গে সেই দিনই দেখা করা সম্ভব হল না; কমলের সন্ধান পেলে না আর মলিনার হোষ্টেলে যেতে তার বিশেষ আপত্তি ছিল। তার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছে তার ছিল না; ভেবেছিল কমলের সাহায্য নিয়ে মিষ্টার সেনের সঙ্গে মলিনার দেখা করিয়ে দেবে কিন্তু তা করবার আগেই এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটল যাতে মিষ্টার সেনের পক্ষে তাদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়ে উঠল না। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে একদিন সকালে তাঁরই বাড়ীতে অবনীর গ্রেপ্তার।

একজন ইনস্পেক্টার এসে অবনীকে একখানা পরোয়ানা দেখালেন, পড়ে অবনী বললে, "আমি প্রস্তুত, চলুন।" তারপর মিষ্টার সেনকে বললে, "আপনি মাকে একটা খবর পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন; ব্যাপারটা বাড়ীতে না হয়ে ভালই হয়েছে; মা হয়তো বড্ড ভয় পেয়ে যেতেন। তাঁকে সব বুঝিয়ে বলবেন, তিনি কিছু জানেন না।"

মিষ্টার সেন বললেন, "আচ্ছা, সে হবে। তাঁকে খবর দেবার দরকার নেই, আমি এখনই জামীনের ব্যবস্থা করছি। আমার গাড়ীতে যেতে আপত্তি আছে কি?" শেষের কথাগুলো ইনস্পেক্টারের উদ্দেশ্যে। তিনি আপত্তি না করায় মিষ্টার সেন, অবনী আর ইন্সপেক্টার গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। অবনী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না সে গ্রেপ্তার হয়েছে, তার মনে হচ্ছিল সে যেন বায়স্কোপ দেখছে, সমস্তটাই যেন একটা বিরাট প্রহসন, তার জীবনে এ রকম ঘটনা ঘটতেই পারে না। সে একটু ভয় পেয়েছিল বললেও বোধ হয় তার ওপর অন্যায় করা হয় না।

মিষ্টার সেনের সাহায্যে জামীন পেতে বিশেষ দেরী হল না। অবনীর

কাছে সব চেয়ে সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছিল তার মাকে জানান। উপস্থিতের মত সে দায় থেকে বেঁচে গেছে বলে সে আশ্বস্ত হলেও নিশ্চিন্ত হতে পারলে না—শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা যায় না। তার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল মলিনার ওপর। কেন তার সঙ্গে সেদিন ও রকম অদ্ভুৎভাবে দেখা হল? কেনই বা সে তাকে কুলি বস্তি দেখতে যেতে বল্লে, সেই বা কেন রাজি হল? শেষ প্রশ্নটার কোন জবাব সে খুঁজে পেলে না।

—দশ—

মলিনাদের হোষ্টেলের সুপারিনটেন্‌ডেন্‌টের আসল নামটা যে কি তা হোষ্টেলের সকলেই ভুলে গিয়েছিল আর তার পরিবর্ত্তে তাঁকে একটা নতুন নাম দিয়েছিল, "মাসীমা"—তাঁর যে একটা নাম থাকা সম্ভব তা হোষ্টেলের বোর্ডার থেকে আরম্ভ করে ঝি, চাকর পর্য্যন্ত কার মনে হত না তাই যখন মালতী এসে জিগেস করলেন রেণুকা আছে কিনা, চাকরটা সোজা জবাব দিয়ে দিলে রেণুকা বলে সে হোষ্টেলে কেউ থাকে না। কথাটা শুনে মালতীর একটু আশ্চর্য্য লাগল, সে দিন ও রেণুকার কাছ থেকে সে চিঠি পেয়েছে, এই ঠিকানা থেকেই সে চিঠি দিয়েছিল। কি করবে দাঁড়িয়ে ভাবছিল; মলিনা কোথা থেকে ফিরছিল, মালতীকে ও ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিগেস করলে, "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কাকে চান? ভেতরে যান নি কেন?"

মালতী তাকে ভাল করে দেখে নিয়ে জিগেস করলে, "রেণুকা কি এখানে আর থাকে না?"

"রেণুকা?" জিগেস করেই মলিনার মনে পড়ে গেল। সে বললে,

"আপনি কি মাসীমাকে খুঁজছেন? তাঁর নাম তো এরা জানে না, তিনি সকলেরই মাসীমা। চলুন, চলুন, ভেতরে চলুন।"

মলিনা মালতীকে নিয়ে একেবারে রেণুকার ঘরে গিয়ে হাজির হল। তাকে দেখে রেণুকা রীতিমত রকম চমকে উঠে জিগেস করলেন, "মালতী, তুই? কোথা থেকে এলি? হঠাৎ কি হ'ল?" মলিনা তাদের মাসীমাকে কখন এত উত্তেজিত হ'তে দেখে নি, তাঁর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে আসতেও দেখে নি। সমস্ত ঘটনাটা তার কাছে কি রকম অদ্ভুত লাগল; সে আস্তে, আস্তে ঘর থেকে চলে গেল। মালতী বললে, "অন্যায় করেছি জানি কিন্তু আর পারলাম না। কতদিন দেখিনি তুই তো জানিস। বেশ ছিলাম, অনেক করে ওর কথা ভোলবার চেষ্টা করেছি, হয়তো অনেকটা ভুলেও ছিলাম। সেদিন একখানা ছেঁড়া খবরের কাগজে ওর কথা পড়লাম—কি জানি কি হল, কিছুতেই থাকতে পারলাম না।"

কিছুক্ষণ চুপ্ করে থেকে রেণুকা বললেন, "ও এখন বড় হয়েছে ভয় হয় যদি কিছু সন্দেহ করে। এতদিন চেষ্টা করে শেষে ·····"

মালতী বললে, "না, না সন্দেহ করবে না; সে তো আমায় চেনে না। কোন কথা বলব না, শুধু একবার দেখব—কতদিন তাকে দেখিনি। সে আজ কত বড় হয়েছে, কেমন দেখতে হয়েছে ·····"

"তাকে তো এইমাত্র দেখলি।"

"যে আমায় এখানে নিয়ে এল সে······মলিনা? আমার মলিনা? না, না আমার নয়, আমার বলবার অধিকার আমার নেই।" মালতীর চোখে জল এসে গেল। রেণুকা তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, "কি করছিস? কেউ শুনতে পাবে। এতদিন পরে আজ আবার নতুন করে কি হল?"

"কি হল তা জানি না। একদল লোক কালীঘাটে আসছিল তাদের সঙ্গে চলে এলাম।"

"কোথায় আছিস?"

"ধর্ম্মশালায়।"

"এখানে উঠতে কি হয়েছিল?"

"না, না নিজের ওপর আমার অতটা বিশ্বাস নেই। ওর এত কাছে থাকলে সব ভুলে যাব, ওর সমস্ত জীবনটা নির্ভর করছে আমার ওপর, আমায় লোভ দেখাসনি ভাই।"

আজ তাদের দুজনেরই মনে পড়ল প্রায় কুড়ি বছর আগেকার ঘটনা। মালতী সেদিন সুন্দরী, তরুণী, তার সাজ, পোষাক দেখে তাকে ভাগ্যবতী বলা চলত। রেণুকা গরীবের মেয়ে, বিয়ে করে ভাগ্য পরিবর্ত্তন করবার চেষ্টাও করে নি; কোন একটা স্কুলে মাষ্টারী করে নিজের খরচ চালায়। তার ইটালির বাসায় এল মালতী, তার সঙ্গে একটী শিশু। তাদের দেখে রেণুকা খুসী হয়ে উঠেছিল, কত কথা বলতে চেয়েছিল কিন্তু মালতী সে সুযোগ দেয় নি। মলিনাকে তার হাতে দিয়ে এক, এক করে সমস্ত গয়নাগুলো খুলে তার কাছে রেখে বলেছিল, "আমি জানি একে তুই ফেলতে পারবি না, এ কোন অন্যায় করে নি, আর এ গয়না-গুলোতেও কলঙ্কের ছাপ নেই।" তারপর সে চলে যায়, রেণুকা তাকে বাধা দিতে গিয়েছিল কিন্তু পারে নি। বাইরে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, তাতে উঠে বলে, "ওকে ওর মা'র কথা জানতে দিসনি, বলিস সে মরে গেছে, তুইও তাই মনে করিস।" তারপর আর তাদের দেখা হয় নি, মাঝে, মাঝে চিঠি দিলে জবাব পেয়েছে এই পর্য্যন্ত। ভুলে যাওয়া অতীত থেকে সে আজ আবার নতুন করে সামনে এসে দাঁড়াল। রেণুকার ভয় হল তার এ ফিরে আসার সঙ্গে, সঙ্গে হয়তো অতীত তার সমস্ত

কদর্য্যতা নিয়ে ফিরে আসবে। তাকে বেশীক্ষণ ভাবতে হল না, হোষ্টেলের ঝি এসে একখানা স্লেট্ দেখালে। নামটা পড়ে রেণুকা ভয়ানক রকম আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "অ্যাঁ! ব্রজেশবাবু? তিনি নিজে এসেছেন? বসতে বলেছিস তো? যা, যা মলিনাকে খবর দিগে যা, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করছি।"

মালতী রেণুকার ব্যস্ততা দেখে জিগেস করলে, "ব্রজেশবাবুটী কে?"

রেণুকা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "নাম শুনিস্ নি? সে কি? অত বড একজন শ্রমিক নেতা, দেশ-জোড়া নাম! মলিনাকে বড্ড স্নেহ করেন। তুই আমার সঙ্গে অন্য ঘরে চল, তাঁকে এইখানেই নিয়ে আসব, অন্য কোথাও তাঁর মত লোককে বসান যায় না।"

মালতীকে বাধ্য হয়ে রেণুকার সঙ্গে যেতে হল। ব্রজেশ নামটা সে কখনও শুনেছে বলে মনে করতে পারলে না তবু তার সন্দেহ হল মলিনার ওপর তার অত্যধিক স্নেহটা বোধ হয় উৎসাহিত করবার মত কিছু নয়। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে, সঙ্গে সে নিজেকে ধিকার দিয়ে উঠল; এটা তার নিজের কলঙ্কিত মনের অহেতুক সন্দেহ ছাড়া কিছু নয়। তবু সে দূর থেকে ব্রজেশকে দেখবার লোভ সামলাতে পারলে না। বারান্দার রেলিংটা ধরা না থাকলে হয়তো সে পড়ে যেত; ব্রজেশ তাকে দেখতে পায় নি, পেলে তার পক্ষে নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত ভাবের মুখোসটা বজায় রাখা হয়তো সম্ভব হত না।

কুলি বস্তি দেখতে যাওয়ার দিনকার রাতের বীভৎস ঘটনার পর মলিনা আর শ্রমিক সঙ্ঘের অফিসে যায় নি, দলের কা'র সঙ্গে দেখাও করে নি। প্রথম দু' এক দিন ব্রজেশ কোন খোঁজ খবর নেয় নি, কমল তার অনুপস্থিতির কথা বলতে সে বলে, "সে দিন বড্ড কষ্ট হয়েছিল কিনা তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে" কিন্তু পরের পর ক'দিন না আসতে সে নিজেও একটু

চিন্তিত হয়ে উঠল; শফারের হাতে এক খানা চিঠি দিয়ে গাড়ী পাঠালে কিন্তু মলিনা জবাব দিলে না; শফার বললে তাকে বলেছে সে অসুস্থ। মলিনাকে হাত ছাড়া করতে ব্রজেশ রাজি নয় তার অনেক কারণ আছে। সে ভেতরের কথা এত জানে যে ইচ্ছে করলে ব্রজেশকে বেশ বিপদে ফেলতে পারে; তা ছাড়া শ্রমিকরা তার খুব ভক্ত। আর একটা কারণও ছিল—নিজের কাছেও সেটা স্বীকার করার মত সৎসাহস ব্রজেশের ছিল না—সেটা হচ্ছে এই যে মলিনার অহঙ্কার সে ভাঙতে পারে নি। তারই কোন ভবিষ্যৎ সুযোগ হাতে রাখবার জন্যে সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে ঠিক করলে, তাই নিজেই গেল।

রেণুকা তাকে কোথায় বসতে দেবে, কি ভাবে তার অভ্যর্থনা করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার মত সম্মানিত অতিথি আর কোনদিন এ হোষ্টেলে পদার্পণ করে নি। হোষ্টেলে যত মেয়ে ছিল সবাই এসে ঢিপ্, ঢিপ্ করে নমস্কার করতে আরম্ভ করলে। মলিনার দেখে আপাদমস্তক জ্বালা করছিল, ইচ্ছে করছিল চীৎকার করে বলে ওঠে ওর স্থান কোথায়। আর একজনের মনের মধ্যেও বোধ হয় ঐ রকম একটা ইচ্ছে হচ্ছিল—সে মালতী।

মলিনার দেখা করবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না কিন্তু মেয়েদের স্বাভাবিক কৌতূহল আর অজস্র প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তাকে দেখা করতে হল। রেণুকা ব্রজেশকে বললেন, "আপনি এখানে বসে কথা বলুন, কেউ বিরক্ত করবে না।" তিনি চলে গেলে ব্রজেশ জিগেস করলে, "গাড়ী পাঠালাম, গেলে না যে?" মলিনা তার বিরক্তি চেপে রাখবার কিছু মাত্র চেষ্টা না করে বললে, "গাড়ী পাঠালেই যেতে বাধ্য কি?"

"তা নয়, তবে দরকার না থাকলে ডেকে পাঠাতাম না।"

"দরকার না থাকতে এতবার ডেকে পাঠিয়েছেন যে আজ আর দরকার থাকলেও বিশ্বাস করতে পারি না।"

ব্রজেশ দেখলে মলিনা একটুও নরম হয়নি তাই সুর বদলে বললে, "তোমার হোষ্টেলে আসা বোধ হয় এই প্রথম, না ?"

"হাঁ, তাই তো আশ্চর্য্য লাগছে। অন্ধকার রাত্রে, অসহায় অবস্থায় পেয়ে যে কথা বলতে সাহস করেছিলেন, এখানে কি তার পুনরভিনয় করতে চান ?"

ব্রজেশ একটু শ্লেষের সঙ্গে বললে, "তোমার নিজের দাম কি এত বেশী মনে কর ?"

ঠিক সেই সুরেই মলিনা জবাব দিলে, "তা করি বৈকি। বিশেষ যখন আপনার মত স্বনামধন্য পুরুষরা যাওয়া আসা করেন।"

"বলতে লজ্জা করছে না ?'

কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে মলিনা বললে, "নিশ্চয়। লজ্জা তো আমারই করা উচিত যেহেতু বাঙলার শ্রমিকদের পরম বন্ধু, ভারতের বিশিষ্ট নেতা রাত দু'টোর সময়, অন্ধকারে আমার ঘরে ঢুকে আমায় কলঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।"

ব্রজেশ কোন জবাব দিলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মলিনা বললে, "কি করতে এসেছেন বলুন, বেশীক্ষণ আপনার কাছে বসে থাকতে পারব না।"

দক্ষ অভিনেতার মত নিজেকে সংযত করে ব্রজেশ বললে, "হাঁ বলছি। অবনীবাবুর সেদিনকার বক্তৃতার জন্যে কেস্ হচ্ছে জান ?"

"জানি।"

"তাঁর বক্তৃতাগুলো কাগজে পড়েছ ?"

"পড়েছি কিন্তু ওসব কথা তিনি বলেন নি।"

"তাই না কি ? অস্বীকার করবার কোন উপায় আছে কি ? কাগজে যখন বেরিয়েছে……"

"কাগজওলারা রিপোর্ট পেলে কোথায় ?"

"আমি কি জানি ?"

তার কথা মলিনা যে বিশ্বাস করলে না তা বুঝতে ব্রজেশের দেরী হল না। একটু চুপ করে থেকে সে বললে, "তোমায় বোধ হয় সাক্ষী দিতে হবে।"

মলিনা একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে, "আমায় ? কেন ?"

"তা জানি না। তোমায় হয়তো অনেক কথাই জিগেস করবে; এমন কোন কথা বোল না যাতে· ··"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মলিনা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, "কি বলব আর কি বলব না সে আমি বুঝব, আপনার সে বিষয় পরামর্শ দেবার কোন দরকার নেই।"

"দরকার আছে। তোমায় যা বলছি তাই করতে হবে।" ব্রজেশের চোখে নিষ্ঠুর দৃঢ়তা ফুটে উঠল। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে মলিনা বললে, "যতদিন আপনি মনুষ্যত্বের মুখোসটা খুলে ফেলেননি ততদিনই আপনাকে ভয় করেছি।"

"ভয় করাতে বাধ্য কোর না" দাঁতে দাঁত চেপে ব্রজেশ বললে।

নির্ব্বিকারভাবে মলিনা বললে, "চেষ্টা করে দেখতে পারেন।"

ব্রজেশ দত্ত আজ যেন নতুন করে মলিনাকে দেখলে। এতখানি অস্বাভাবিক দৃঢ়তা যে ঐ মেয়েটার মধ্যে ছিল তা ব্রজেশ কেন অন্য কেউও ভাবতে পারত না। সে আবার সুর বদলালে; উঠে গিয়ে মলিনার কাঁধে হাত রেখে কি বলতে গেল, সে দূরে সরে গিয়ে বললে, "খবরদার, আবার চীৎকার করতে বাধ্য করবেন না: এখানে অপমান করবার লোকের অভাব নেই সেটা যেন মনে থাকে।"

যেন কিছুই হয়নি এইভাবে নিজের জায়গায় ফিরে এসে ব্রজেশ বললে, "তুমি এমন অসাধারণ কিছু করছ না মলিনা; তোমার বয়েসের অন্য হাজার

মেয়ে যা করবে তাই করছ। যৌবনের প্রতি যৌবনের একটা তীব্র আকর্ষণ আছে স্বীকার করি ; অনেকের পক্ষে তাতে কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু তুমি সে অনেকের মধ্যে নও। তুমি বেশ ভাল করেই জান সাধারণভাবে জীবন কাটাবার উপায় আর তোমার নেই, ফেরবার রাস্তা বন্ধ। আমাদের সঙ্গে তোমায় চলতেই হবে আর সে পথে আমি থাকবই কিন্তু অবনী যে থাকবে তা তুমি নিশ্চয় করে বলতে পার না।"

"তাই আপনার কামনায় ইন্ধন যোগাতে হবে ?"

ব্রজেশ যেন তার কথাগুলো শুনতে পায়নি এইভাবে বললে, "অবনী লক্ষীকান্তর মেয়েকে ছেড়ে তোমায় .... "

"আপনি থামুন। আমি .... "মলিনা শেষ করতে পারলে না।

"থামলে কেন ? বল তুমি কি। তুমি তাকে চাও না ? বলতে পারবে ? তবে তাকে চাইতে তুমি পাবে না কারণ তাতে অনেক লোকের অনেক দিক দিয়ে ক্ষতি ; তোমার একার লাভের জন্যে এত লোকের ক্ষতি হতে দেওয়া চলে না। বহুর জন্যে একের .. "

মলিনা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "ভুলে যাচ্ছেন এটা প্ল্যাটফর্ম নয়। আপনার বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা আপনাকে ভয়ানক একটা কিছু ভাবতে পারে কিন্তু আমি ভাবব না। অত বড়, বড় কথা আমার কাছে অপব্যবহার করে লাভ নেই।"

মলিনার মনের অবস্থা বুঝতে ব্রজেশের একটুও দেরী হয় নি কিন্তু সে হাল ছাড়ে নি। আর কোন আশা নেই দেখে সে আসল কাজের কথা পাড়লে। পাছে মলিনা তার গুরুত্ব বুঝতে পারে তাই উঠে পড়ে বললে, "তাহলে সত্যিই তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ ? কি আর করব ? কা'র ওপর তো জোর নেই। হাঁ, কমল বলছিল মিটিংএর রিপোর্ট বইখানা আর কি, কি কাগজ পত্র তোমার কাছে আছে, সেগুলো তাহলে দিয়ে দাও।"

মলিনা উঠে চলে গেল, ব্রজেশ তার হাতের বইখানা টেবিলের ওপর রাখলে। মলিনা একটু পরে ফিরে এসে বললে, "খাতাখানা এখন পাচ্ছি না, পরে পাঠিয়ে দেব।" ব্রজেশের বুঝতে একটুও দেরী হল না কি জন্যে খাতাখানা এখন পাওয়া গেল না ; মলিনার বুদ্ধির তারিফ না করে সে পারলে না। দরজার কাছে এসে বললে, "হাঁ, একটু সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, দেওয়া উচিত বলেই, অবনীর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা কোর না তাতে বিপদ আছে।"

"তাই না কি ?" মলিনার কথায় বিদ্রূপ প্রকাশ পেল।

"যে দেহের পবিত্রতা নিয়ে এত গর্ব্ব তা ওর কাছে ···" মলিনা আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, বললে, "বেরিয়ে যান, যান বলছি।"

ব্রজেশ তার দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে চলে গেল, মলিনা সেখানে দাঁড়িয়েই রইল। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা সে জানতেও পারে নি, রেণুকা আর মালতী ঘরে আসতে খেয়াল হল।

রেণুকা ঘরে ঢুকে বইখানা লক্ষ্য করে বললেন, "বইখানা কি ব্রজেশবাবু ফেলে গেলেন না তোমার পড়তে দিয়ে গেলেন ?"

মলিনা সেই প্রথম বইখানা লক্ষ্য করলে, তুলে নিয়ে পাতা উল্টে দেখলে সেখানা কমিউনিস্‌ম্ সম্বন্ধে এমন একখানা বই যা শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিলেতেও পড়তে দেওয়া হয় না।

রেণুকার কথার জবাবে সে কোন কথা বললে না। মালতী জিগেস করলে "তোমাদের সঙ্ঘের অফিস কোথায় মা ?"

মলিনা তার প্রশ্নে আশ্চর্য্য হল, তাদের যে একটা সঙ্ঘ আছে তা ইনি জানলেন কি করে ? রেণুকা তা লক্ষ্য করে বললে, "ও, মলিনা এ হচ্ছে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু মালতী। তুমি ওর কোথায় আশ্চর্য্য হচ্ছ, না ? ও তোমার সম্বন্ধে সব জানে।"

"তাই না কি ?" বলে মলিনা মালতীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। মলিনার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে, মালতীর চোখে জল এসে গেল। মলিনা তা দেখতে পেয়েছিল; মহিলাটীর আচরণ তার অদ্ভুত লাগছিল কিন্তু সে বিষয় ভাববার মত মনের অবস্থা তার ছিল না, সে তাদের সঙ্ঘের ঠিকানা বলে চলে গেল।

রেণুকা বললেন, "তুই দেখছি এতদিনের চেষ্টা সব একদিনে নষ্ট ক'রে দিবি।"

মালতী চোখ মুছে বললে, "আজ আমার কি হয়েছে জানি না, কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি না। আর এখানে থাকতে সাহস হচ্ছে না, আমি যাই।"

"এর মধ্যে যাবি কি ? এ বেলা এখানে থাক্।"

"যেতে আমার মন চাইছে না ভাই কিন্তু থাকতেও পারছি না। নিজের ওপর আর একটু বিশ্বাস না ফিরে এলে থাকতে পারছি না" বলে মালতী চলে গেল।

রেণুকা সেখানে বসে, বসে কুড়ি বছর আগেকার মালতীর সঙ্গে আজকের মালতীর তুলনা করতে লাগল।

—এগার—

সে দিন রাত্রে যা জানতে পেরেছে তা কাউকে বলতে না পেরে কমল হাঁপিয়ে উঠছিল। ব্রজেশের প্রতি 'অচলা ভক্তি' হয়তো আর তার ছিল না কিন্তু ভয়টা এখনও কাটে নি। কমল হচ্ছে সেই ধরণের ছেলে যারা নিজেকে জাহির করতে পারে না, কোন একটা বড় কিছু দেখলেই যারা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে আর তাকে অযথা সম্মান দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে

আবার সামান্য ত্রুটী, বিচ্যুতি দেখলে ঢাক পিটিয়ে বেড়াতেও দ্বিধা করে না। সে রাত্রে বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে, নিছক কৌতূহলে নয়, নিজের উপস্থিতি জানাবার সাহস হয় নি বলে ; শেষ পর্যন্ত যখন দরজায় ধাক্কা দিলে তখনও মলিনাকে বলবার সাহস হল না যে সে সব কথা শুনেছে।

ব্রজেশের সম্বন্ধে এত বড় একটা খবর জেনে চুপ করে বসে থাকা যায় না অথচ কাউকে জানাতেও সাহস হচ্ছে না যদি ব্রজেশ জানতে পারে তাহলে সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক তার শেষ হয়ে যাবে। ব্রজেশ তার সঙ্গে ব্যবহারে কোন পার্থক্য দেখায় নি, অবশ্য কখনই তাকে বেশী আমল দিত না তবে কমলের মনে হয় ব্রজেশ এখন তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। মলিনাও অফিসে আসছে না যে তার সঙ্গে কথা বলে খানিকটা সময় কাটায় ; কমল এই প্রথম সঙ্ঘের কাজটা ভার বলে মনে করলে।

তাকে রোজ নিয়মিত অফিসে আসতে হয়, সে দিনও এসেছিল, খাতা পত্রের পাতা উল্টাচ্ছিল এমন সময় ব্রজেশ মলিনার হোষ্টেল থেকে ফিরল। কমলের সঙ্গে কোন কথা না বলে একখানা চিঠি লিখে, শীলমোহর করে তার হাতে দিয়ে বললে, "এখনি নৈহাটী যাও, সেখানকার ইউনিয়ানের সেক্রেটারীর হাতে দেবে, দেরী কোর না।" এই অসময়ে নৈহাটী যাবার কমলের মোটেই ইচ্ছে ছিল না কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে ব্রজেশ দত্তকে বলবার সাহস তার হল না : চিঠিখানা নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

কমল চলে যেতে ব্রজেশ একটা চুরুট ধরিয়ে খবরের কাগজের পাতা উল্টাতে লাগল কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারলে না, একবার ঘড়ি দেখলে একবার বাইরে গিয়ে দেখে এল, শেষে পায়চারি করতে আরম্ভ করলে।

মলিনাদের হোষ্টেল থেকে ফেরবার পথে সে এমন একজনের বাড়ী যায় যার সঙ্গে কথা বলতে শ্রমিক নেতা হিসেবেও ব্রজেশ দত্তর লজ্জা করা উচিত কিন্তু দরকারের সময় লজ্জা করতে সে শেখে নি। লোকটা বাড়ীতে ছিল না,

যেখানে সে ছিল তার মেয়ে সেখানে ব্রজেশকে নিয়ে যেতে চাইলে কিন্তু অতটা সাহস তার হল না; এক পয়সা কাপের চায়ের দোকানে ঢুকে তার সঙ্গে কথা বলার অর্থ হচ্ছে সাক্ষী রাখা, তাতে সে রাজি নয়। তার মেয়েটাকে চার আনা পয়সা দিয়ে বললে, "তোর বাবাকে এখনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি, আর কাউকে কিছু বলিস নি।" মেয়েটা হাসতে, হাসতে চলে গেল, ব্রজেশও গলি পার হয়ে এসে গাড়ীতে উঠল। লোকে তাকে সেখান থেকে বেরুতে দেখলে হয়তো ভাবত বস্তির উন্নতি করা সম্ভব কিনা তাই দেখতে ব্রজেশ দত্ত নিজে কষ্ট করে এর ভেতর ঢুকেছিল, হাই কি কথাটা কাগজেও উঠে যেত।

লোকটা আসতে যত দেরী করছিল ব্রজেশের চঞ্চলতা তত বেড়ে যাচ্ছিল। একমাত্র ভরসা হচ্ছে মলিনা যদি তার উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে তাহলে সে বইখানা পড়বে; যা কিছু করতে হবে সেইটুকু সময়ের মধ্যে। মলিনা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সে মোটেই নিরাপদ নয়, অবনী ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, এখান থেকে সরিয়ে দিলে ঠাণ্ডা হয়ে ভেবে দেখবার অবসর পাবে, নিজের ভুল বুঝতে পারবে। তার মধ্যে হয়তো অবনী-অলকার ঝগড়াটাও মিটে যেতে পারে, তখন মলিনার ফিরে আসা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

যার জন্যে সে অপেক্ষা করছিল সে এসে ঘরে ঢুকতে ব্রজেশের চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। আশাতীতভাবে তাকে অভ্যাগনা করে বললে, "এস, এস; এত দেরী কেন?"

লোকটা ব্রজেশকে বেশ ভাল করেই জানত; বিশেষ দরকার না পড়লে সে যে তার সাহায্য নেবে না তাও তার অজানা নয়; সে বললে, "আপনাদের এক ধান্ধা মশায়, আমাদের হাজার ধান্ধা। ডেকে পাঠালেই কি আর আসতে পারি? ক'দিন ধরে একটা পয়সা নেই।"

ব্রজেশ ইঙ্গিতটা বুঝে একখানা দশ টাকার নোট তার সামনে ধরলে। লোকটা সেটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে জিগেস করলে, "কাজটা কি ?"

"কিছু রোজগার করবে ?"

"সে আর এ বাজারে কে না চায় ?"

"বেশ তাহ'লে এই ঠিকানায় সার্চ্চ করাবার ব্যবস্থা কর—এটা মেয়েদের হোষ্টেল ; এখানে মলিনা বলে একটা মেয়ে থাকে, তার ঘর সার্চ্চ করলে একখানা প্রস্‌ক্রাইবড্ বই পাওয়া যাবে" বলে সে একটা ঠিকানা লেখা কাগজ তার হাতে দিলে। লোকটা ঠিকানাটা পড়ে বললে, "আপনাদের মলিনা ?"

বিরক্ত হয়ে ব্রজেশ বললে, "আমাদের বলে কেউ নেই। তোমায় খবরটা দিলাম, ইচ্ছে হয় কাজ কর না হয় যাও।"

লোকটা জানত সে চলে যেতে পারলে ব্রজেশ জব্দ হ'ত কিন্তু তার সে উপায় ছিল না তাই বললে, "ঠিক তো ?"

"ভুল আজ পর্য্যন্ত হয়েছে কি ?"

"তা নয়, তবে কি জানেন ভুল হলে আমার জেল পর্য্যন্ত হতে পারে।"

"বিশ্বাস করে তো আজ পর্য্যন্ত ঠক্‌তে হয় নি। খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু।"

"আচ্ছা" বলে লোকটা চলে গেল, ব্রজেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। সঙ্গে, সঙ্গে মালতী এসে ঘরে ঢুকল। ব্রজেশ তাকে দেখে ভয়ানক রকম চম্‌কে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ; নিজের চোখকে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। এত বড় অসম্ভব ঘটনা সে বিশ্বাস করে কি করে ? তার মুখে কথা ফুটল না। মালতী বললে, "তাহলে চিনতে পেরেছ ? ভয় হয়েছিল হয়তো পরিচয় দিতে হবে, তুমি আজকাল মস্ত লোক।"

ব্রজেশ অনেক কষ্টে বললে, "তুমি তাহলে এখনও বেঁচে আছ ?"

মালতী বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, "আজকাল কি ভূতও বিশ্বাস করছ

না কি ? আমি না বেঁচে থাকলেই অবশ্য তোমার পক্ষে ভাল হ'ত কিন্তু মরতে পারিনি, তোমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বেঁচে উঠেছি।"

গলাটাকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করে ব্রজেশ বললে, "তোমার বেঁচে থাকা না থাকার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?"

"ব্রজেশ দত্তর হয়তো কোন সম্পর্ক না থাকতে পারে কিন্তু সুরেন ঘোষের...... "

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ব্রজেশ হেসে উঠে বললে, "সুরেন ঘোষ ? সে নামে বাঙ্গালা দেশে অনেক লোক থাকতে পারে বটে, আর তোমার বেঁচে থাকা না থাকায় তাদের হয়তো অনেক ক্ষতি বৃদ্ধিও হতে পারে কিন্তু সে সব কথা আমায় শুনিয়ে লাভ কি ? যাক্, কোথায় আছ বল ?"

"কাশীতে।"

"বাবা বিশ্বনাথ সত্যিই নীল-কণ্ঠ ! তারপর হঠাৎ কলকাতায় কেন ? আমার কাছে এলে যে ? খবর পেলে কোথায় ? দরকারই বা কি পড়ল ? পয়সা নিশ্চয় যথেষ্ট জমিয়েছ ?"

"না জমালেও তোমার কাছে হাত পাততে পারতাম না। বাবা বিশ্বনাথ যদি নীলকণ্ঠ হন তাহলে মা কালীর সর্ব্বাঙ্গ কালো না হয়ে নীল হওয়া উচিত ছিল, কলকাতার একটা পাড়া কাশীকে হার মানায় ; একা তুমি......"

"হাঁ, হঠাৎ আসার উদ্দেশ্যটা এখনও জানতে পারলাম না ? নিছক কৌতূহল ?"

"ধর তাই।"

"তাহলে বলতে হয় এখন যাও, কৌতূহল তো মিটেছে। তোমার সঙ্গে এভাবে একা বসে কথা বললে...... "

"লোকে সন্দেহ করবে ? এখনও তাহলে করে না ?"

ব্রজেশ বিরক্ত হল কিন্তু তা প্রকাশ না করে বললে, "ও সব কথা থাক্, আসল কথাটা কি বল—এতদিন পরে হঠাৎ কাশী থেকে·· ·· "

অনেক দিন আগেকার কতকগুলো কথা মালতীর মনে পড়ে গেল; অনেকদিনের হলেও সে কিছু ভোলে নি, ভুলতে পারে নি। একটা ভয়ানক দুর্য্যোগের রাত, একটী অসুস্থ তরুণী, তার কাছে একজন যুবক। সেই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে যুবকটী বাইরে যেতে চাইছে ডাক্তার আনতে, তরুণী তাকে যেতে দেবে না কিন্তু তার অসহ্য রকম কষ্ট হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত যুবকটী তাকে কি একটা ওষুধ খাইয়ে দিলে, বললে সে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে সে সত্যিই পড়ল কিন্তু ঘুম ভাঙতে দেখলে সে হাসপাতালে আর সে যুবকটী কোথাও নেই। তারপর একদিন সে সেরে উঠল, বাড়ীও ফিরে এল কিন্তু সে লোকটী আর এল না আর তার গয়নার বাক্সটাও পাওয়া গেল না। পুলিশ তাকে অনেক রকম প্রশ্ন করে কিন্তু ওষুধ খাওয়ার পর তার কি হয়েছিল সে কিছুই বলতে পারে নি। অতীত থেকে জোর করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মালতী বললে, "ধর যদি বলি সেই ভীষণ দুর্য্যোগের রাত্রে ওষুধ খাইয়ে যে গয়না-গুলো নিয়ে সুরেন ঘোষ অদৃশ্য হয়েছিল সেগুলো ফিরে চাইতে এসেছি ?"

হাসতে, হাসতে ব্রজেশ বললে, "তাই না কি ? ছাপার অক্ষরে এখনও চলতে পারে ; ষ্টেজে, বা সিনেমায় ভালই চলে।"

মালতী এতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকটার ঔদ্ধত্য কোন রকমে সহ্য করে এসেছিল কিন্তু আর পারলে না ; তার শেষ কথাগুলোয় একেবারে জ্বলে উঠে বললে, "আমি জানতে চাই তুমি নিজে হতে মলিনার পথ থেকে সরে দাঁড়াবে কি না ?"

ভয়ানক রকম আশ্চর্য্য হয়ে ব্রজেশ জিগেস করলে, "মলিনা ? তুমি তার নাম জানলে ক করে ?"

"যে করেই জেনে থাকি, তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি তার সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা কোর না।"

"তাই না কি ? তাতে তোমার স্বার্থ ?"

"এক নারীর পবিত্রতা রক্ষায় আর এক নারীর··· "

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে হেসে উঠে ব্রজেশ বললে, 'বটেই তো ! তুমি ছাড়া আর কে তাকে সাহায্য করবে ? তা হঠাৎ সে তোমায় আবিষ্কার করলে কি করে ? না তুমিই তাকে আবিষ্কার করেছ ?"

মালতী খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, "আমি জানতে চাই তুমি তার পথ থেকে সরে দাঁড়াবে কিনা।'

"আমি সরে দাঁড়ালেই অবনী তাকে বিয়ে করবে ?"

মালতী এর আগে অবনীর নাম পর্য্যন্ত শোনে নি, তার সঙ্গে মলিনার কি সম্পর্ক তাও সে জানে না কিন্তু সে কথা প্রকাশ না করে বললে, "অবনী বিয়ে করুক আর নাই করুক, সে ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে পারবে।"

ব্রজেশ এতক্ষণ কথা বলছিল কিন্তু তার মন একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছিল, প্রশ্নটা হচ্ছে মলিনার সঙ্গে মালতীর সম্পর্ক। স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে সে কিছুই সংগ্রহ করতে পারছিল না, হঠাৎ একটা দৃশ্য মনে পড়ে যেতে সে বললে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। যে রাত্রে তুমি তোমার শ্বশুর বাড়ী ছেড়ে চলে আস সে রাত্রে তোমার সঙ্গে কাকের বাচ্ছার মত কি একটা ছিল বটে। অনেক করে বলাতে শেষ পর্য্যন্ত কা'র কাছে রেখে এসেছিল—ঠিক হয়েছে। কি আশ্চর্য্য ! কিছু না জেনেও ঠিক করে নিয়েছিলাম ওর রক্তে ··· "

"ওর রক্ত তোমার চেয়ে অনেক ভাল।"

"তাই নাকি ? এতটা স্বামীভক্তি মাঠে মারা গেল ? তোমার উজবুক্ স্বামীটা বেঁচে থাকলে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হত। যাক্ মলিনার সম্বন্ধে

মাঝে, মাঝে যে দুর্ব্বলতা মনে আসত ওর রক্তের পবিত্রতার খবর পাওয়ার পর তাও আর আসবে না।"

বেশ জোরের সঙ্গে মালতী জিগেস করলে, "আমি জানতে চাই তুমি ওর পথ থেকে সরে দাঁড়াবে কি না।"

হেসে উঠে ব্রজেশ বললে, "তুমি পাগল হয়েছ ? আমি ছাড়া ওর আছে কে ? তাছাড়া ওর মা তার যৌবন আমার কাছে বিক্রী করেছিল, সে যদি এখন অন্য কা'র কাছে তার যৌবন বিক্রী করে তাহলে সেটা·· ·· "

এতক্ষণ ধরে মালতী অমানুষিক সহ্যের পরিচয় দিয়েছে কিন্তু আর পারলে না। লোকটার নির্লজ্জতা যে এতদূর যেতে পারে তা সে ভাবতে পারে নি। যতবড হীন চরিত্রের লোকই হোক, মায়ের সামনে তার মেয়েব সম্বন্ধে এ ভাবে কথা বলতে পারে এ কথা সে জানত না। তার উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখিয়ে মলিনাকে এর হাত থেকে বাঁচান কিন্তু তা সফল হল না। ব্রজেশের শেষ কথাগুলো তাকে ক্ষেপিয়ে তুললে ; অন্য কিছু না পেয়ে সে টেবিলের ওপর থেকে কাঁচের দোয়াতদানটা তুলে নিয়ে তার কপালে ছুঁড়ে মারলে, ব্রজেশ কপালটা চেপে ধরলে ; মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে সময় ব্রজেশকে দেখলে অনেকেই তাকে চিনতে পারত না। খাঁচার ভেতর পুরে একটা বুনো জানোয়ারকে খোঁচা মারলে সে যেমন নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকে সেও সেই রকম ফুলতে লাগল। সে বেশ ভাল করেই জানত মালতী তার কথা পুলিশকে জানাতে সাহস করবে না কারণ তাতে মলিনার ভবিষ্যৎ জীবন নিজের হাতে নষ্ট করা হবে কিন্তু সেও মালতীর বিপক্ষে ভয়ানক কিছু একটা করতে পারবে না। মালতী নিজে হয়তো পুলিশে খবর দেবে না কিন্তু তার কাছ থেকে জেনে অন্য কেউ তো দিতে পারে কাজেই তার হাত পা বাঁধা। যতদিন পর্য্যন্ত মালতী এখানে থাকে তাকে একটু সাবধান হয়েই থাকতে হবে।

কাছের এক ডাক্তারখানা থেকে ব্রজেশ ব্যাণ্ডেজ করিয়ে এল, ডাক্তারের প্রশ্নের জবাবে বললে, "পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।"

—বার—

অবনী-অলকার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে এ কথা চার দিকে বর্টে যেতে মোটেই সময় লাগল না। এক, এক করে তার উপাসকের দল ফিরে আসতে আরম্ভ করলে; সকলেরই ব্যক্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে অবনীর অন্যায় কত বড় তা অলকাকে বুঝিয়ে দেওয়া। তার বান্ধবীদের মধ্যে যারা তার ভাগ্যে বেশ ঈর্ষ্যা করত তারাও এল তাকে সহানুভূতি জানাতে আর সেই সঙ্গে তার দুর্ভাগ্যটা উপভোগ করতে। অলকা তাদের সঙ্গে হেসে কথা কয়, আগের মত ব্যবহার করতে চেষ্টা করে, অবনীর অনুপস্থিতিতে যে তার কিছু যায় আসে না তা বোঝাতে চায় কিন্তু নিজের মনের মধ্যে যে অভাবটা ফুটে ওঠে তাকে ভুলতে পারে না তাই আরও বেশী করে কথা কয়, হাসে, গান গায়, গল্প করে।

তার মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা ছিল অবনী ফিরে আসবে, অন্যায় করেছে বুঝতে পারবে কিন্তু সে তাকে ভুল বুঝেছিল। অবনী যা করে ভেবে করে, করে ফেরাবার অভ্যাস তার নেই তাই অনুতাপও কখন করে নি। অলকাকে সে ভুল বুঝেছিল এ কথা সে প্রথম বুঝল অলকার সেদিন-কার ব্যবহারে; তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক হবার আগেই যে সে জানতে পেরেছে সে জন্যে নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করলে কিন্তু সে ভুলের মোহে জড়িয়ে থাকতে রাজি হল না তাই অলকার কাছে আর ফিরে এল না।

অবনীকে জানবার আগে অলকার একটা অস্তিত্ব ছিল আর সে অস্তিত্বটা নেহাৎ খারাপও নয়; অলকা চেষ্টা করছিল সেইদিনকার জীবনে ফিরে যেতে, আবার নতুন করে সেখান থেকে আরম্ভ করতে। মাঝের ক'টা

দিন ভুলে যাওয়া কি অসম্ভব ? এ প্রশ্নের জবাব শোনবার সাহস তার ছিল না। তার উপাসকদের মধ্যে সে অবনীকে বেছে নিয়েছিল কেন তা সে হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারবে না তবে তার মধ্যে এমন কিছু পেয়েছিল যা আর কা'র মধ্যে পায় নি। তারা আবার সবাই ফিরে এসেছে, সে ইচ্ছেমত যাকে হ'ক বেছে নিতে পারে, তাদের মধ্যে যে কেউ তাতে নিজেকে ধন্য মনে করবে কিন্তু সে তা পারছে না। এ তো আর ছেলেমেয়েদের মাষ্টার বাধা কিংবা ঘরের পর্দার পেড় বদলান নয় যে ঠিক মনের মত না হলে বদলে নেওয়া যায়। এদের সকলের সব কথা অলকা জানে, দরকার হলে খুব সহজে সে এদের সকলের জীবনের ইতিহাস লিখে যেতে পারে, একটুও ভাবতে হয় না। ঐ তো অজয়, ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে, ফিরিঙ্গি পাড়ায় ডাক্তারখানা খুলেছে, বলে চেম্বার—মাসে তিরিশটা টাকাও হয় না, বড় ভাইয়ের পয়সায় সাহেব সাজে। অনীল হাইকোর্ট যায় আসে, ট্রাম ভাড়াটাও ওঠে না, বাবা মাসে, মাসে টাকা পাঠান তবে খাওয়া, পরা চলে; নির্মল আই, সি, এস্ দিয়ে ফেল্ করেছিল তাই ছোট কাজ করবে না। সুরেশ কোন ব্যাঙ্কে কাজ করে, শ'চয়েক টাকা মাইনে পায় কিন্তু একটা সিগারেট কোন দিন নিজের পয়সায় খায় না। বাদল বি, সি, এস্ পরীক্ষা দিয়ে চাতকের মত চেয়ে আছে যদি একটা সাব্ ডেপুটীর চাকরীও পায়, উপস্থিত ছেলে পড়িয়ে বন্ধুদের কাছে সম্মান বজায় রাখছে। এমনি সব ছেলে। তারা কবে কি করেছে, কোন মেয়ের সঙ্গে কতদিন প্রেম করেছে, কা'র বাবা ক'বার বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছেন, কা'র আজও দশটার মধ্যে বাড়ী না ফিরলে বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে যায় সব সে জানে। তাদের মধ্যে অবনীর চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানা ছেলে ছিল, হয়তো চ' একজনের অবস্থাও তার চেয়ে ভাল কিন্তু তাদের কাউকে সে পছন্দ করে উঠতে পারে নি। তারা সকলেই অবনীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের কথা সবিস্তারে

অলকাকে জানিয়েছে তার সহানুভূতি চেয়েছে কিন্তু স্পষ্ট করে তাকে চাইতে সাহস করে নি—কেবল একজন ছাড়া, সে হচ্ছে রঞ্জন।

রঞ্জন এম্, এ পাশ করে বিলেত যায়। অক্সফোর্ড থেকে বি, এ পাশ করে কা'র সুপারিশে এক মার্চেন্ট অফিসের অফিসার হয়ে দেশে ফিরে আসে। বেশ স্বাভাবিক ধরণের ছেলে। মাঝে, মাঝে আসত, চা খেত, গল্প করত, সিনেমা যেত, বিলেতের গল্প বলে নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা করত না। অবনীর কথা সে জানত না তাই একদিন সন্ধ্যে বেলা অলকাকে একা পেয়ে বললে, "তোমার কাছে এত ছেলে কেন আসে তা তুমি বেশ জান, তারা যে জন্যে আসে আমিও সেই জন্যে আসি কিন্তু এ ভাবে দিনের পর দিন শুধু বাজে কথা বলে কাটানোর কোন অর্থ হয় না: আমি স্পষ্ট করেই জিগেস করছি আমার কোন আশা আছে কি? তোমায় স্ত্রীরূপে পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব।'

এত স্পষ্ট কথা শুনতে অলকা অভ্যস্ত নয় তাই সে একটু বিব্রত হয়ে পড়ল, অবনীর কথা তাকে বলতে হল। সমস্ত শুনে রঞ্জন বললে, "এ সব কথা জানলে আমি আগে থেকে সাবধান হয়ে যেতাম, কাল থেকে আর আসব না।"

অলকা বললে, "কেন? বন্ধুভাবেও কি আপনাকে পেতে পারি না?"

"ও সব আমি বিশ্বাস করি না; ওটা আমাদের দেশে আজও সম্ভব হয়ে ওঠে নি, কখন হবে কিনা জানি না;. তাছাড়া আমি সে উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার কাছে আসি নি।"

"আপনার মত স্বামী পেলে যে কোন মেয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করবে।"

"যে কোন মেয়ে করবে কিনা জানি না, তবে সে রকম মেয়ে পাওয়া হয় তো যাবে। আচ্ছা, চললাম।"

রঞ্জন চলে গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অলকা ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে রহিল, তার মনটা কি রকম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এই লোকটার সহজ, হয়তো একটু গর্ব্বিত ব্যবহার তার বেশ ভালই লাগত। অন্য সকলে তাকে 'আপনি' বলে কথা বলে, কত সম্মান দেখায়, কত রকমে খুশি করতে চায় কিন্তু এ লোকটা প্রথম থেকেই বেশ সহজে 'তুমি' বলে কথা বলতে আরম্ভ করলে, অহেতুক সম্মান দিয়ে তাকে কোন দিন ভারাক্রান্ত করতে চায় নি। সে চলে যেতে অলকার মনে হল তার একজন সত্যিকার বন্ধু তাকে ছেড়ে চলে গেল।

এক, এক করে সবাই আবার আগের মত আসতে আরম্ভ করলে। শুধু রঞ্জনই এল না, এলনা বলেই বোধ হয় অলকা তার অভাবটা বেশি করে অনুভব করলে। মাঝে, মাঝে তার বান্ধবীদের কাছ থেকে সে রঞ্জনের খবর শুনতে পেত—রঞ্জনকে না কি আফিস থেকে আবার বিলেত পাঠাবে, সে না'কি বিয়ে করে বৌ নিয়ে বিলেত যেতে চায়, অণিমার সঙ্গে আজ কাল তাকে না'কি প্রায়ই দেখা যায়—এমনি সব কথা। অণিমার সম্বন্ধে কথাটা তার বিশ্বাস হয় না। অণিমার মধ্যে এমন কি থাকতে পারে যা দেখে রঞ্জনের মত ছেলে ভুলবে? তার বান্ধবীদের মধ্যে একজন যেন তার মনের কথা বুঝে বলে সেদিন সে রঞ্জনের পাশে লিলিকে দেখেছে। অলকা সন্তুষ্ট হতে পারে না—অণিমা আর লিলি দুইই সমান, রঞ্জনের কাছে তাদের দাম থাকা উচিত নয়। একটা কথা সে নিজের মনেও স্বীকার করতে লজ্জা পায়—রঞ্জনের পাশে তাকে ছাড়া আর কাউকেই মানায় না। সে কল্পনা করে রঞ্জনের পাশে নিজেকে, বেশ ভাল লাগে কিন্তু তার কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায় আর একজনের কথায়—রঞ্জন না কি মেম্ বিয়ে করবে, বাঙ্গালীর মেয়ের ঈর্ষা অতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছয় না। তার ইচ্ছে হয় রঞ্জনকে ডেকে জিগেস করে এ সব কথা সত্যি কি না কিন্তু লজ্জা

করে। যাকে একদিন নিজেই ফিরিয়ে দিয়েছে আজ তাকে ডেকে পাঠায় কি করে?

অলকার বান্ধবীরা বলে, "যা হয় একটা কিছু ঠিক কর, বেশীদিন সংশয়ের মধ্যে থাকিস নি, নিজের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা কমে যাবে।" সে নিজেও সংশয়ের মধ্যে থাকতে চায় না; তাতে অবনীকে অন্যায় রকম প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু সে করবেই বা কি? যারা তার কাছে নিয়মিত আসছে তাদের কাউকে স্বামীত্বে বরণ করতে তার লজ্জা করে, তারা নিজেদের এত ছোট করে ফেলেছে যে সে কোন দিন তাদের শ্রদ্ধা করতে পারবে না। যত আধুনিকই হোক না কেন স্বামীর মধ্যে শ্রদ্ধা করবার মত কিছু থাকবে না, স্বামী স্ত্রীর চেয়ে অনেক বিষয় বড় হবে না এ ধারণা খুব কম মেয়েই সহ্য করতে পারে। স্বামীর কাছ থেকে তারা অনেকটা স্বাধীনতা চায় বটে তবে খানিকটা অধীনতা না থাকলে তারা সন্তুষ্ট হয় না। অলকার মনে হয় রঞ্জন যদি ফিরে আসে তাহলে সে বেশ সহজে বলতে পারে, "অবনী আমায় মুক্তি দিয়েছে, তোমার আমার পথে আর কোন বাধা নেই।" রঞ্জনের মত ছেলেকে এ কথা বলতে তার লজ্জা করত না কিন্তু রঞ্জন যে আসে না।

কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা তার মাথায় আসে—রঞ্জনের সঙ্গে বিলেত গেলে কি রকম হয়? আজ যারা রঞ্জনের সম্বন্ধে গুজব রটাচ্ছে তারা বেশ জব্দ হয়। অবশ্য বিলেত সে এখনি যেতে পারে, পয়সার অভাব হবে না, তার বাবার মতেরও নয় কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বিলেত যাওয়ার মধ্যে এখনও একটু নতুনত্ব আছে, বেশ একটু গর্ব্ব আছে। সাধারণতঃ ছেলে মেয়েরা বিলেত যায় পয়সা রোজগার করবার যোগ্যতার ছাপ আনতে; বিয়ের বাজারে চাহিদা নেই বলেও অনেক মেয়ে হতাশ হয়ে বিলেত যায় কিন্তু সে ও দু'টোর কোনটাই চায় না: সে যেতে চায় স্বামীর স্ত্রী হয়ে, তাঁর সহযাত্রিনী হয়ে। অনেকে তার দিকে চেয়ে দেখবে কিন্তু বাধা পাবে

তার মাথার ওপর জলজ্বলে নিষেধাজ্ঞাটা দেখে কিন্তু রঞ্জন যে আসে না।

রঞ্জন এল, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে এল—ঠিক যখন অলকা ভাবছিল সে আর আসবে না। এ ক'দিন প্রতি মুহূর্ত্ত যার জন্যে অপেক্ষা করেছে সে সামনে এসে দাঁড়াতে অলকা বলবার মত একটা কথাও খুঁজে পেলে না। বিশ্রী অবস্থাটাকে শেষ করবার জন্যে রঞ্জন বললে, "ভাল আছ তো?" অলকা তার বাক্‌শক্তি খুঁজে পেয়ে জিগেস করলে, "এতদিন পরে এ বাড়ীর কথা মনে পড়ল?" তার গলাটা হয়তো কেঁপে উঠেছিল কিন্তু রঞ্জন বেশ সহজ ভাবে বললে, "মনে প্রায়ই পড়ে কিন্তু আসবার দরকার হয় না।"

"সব কাজই কি দরকারে করেন?"

"অন্ততঃ চেষ্টা করি।"

রঞ্জনের কথাবার্তার মধ্যে কোথাও কোন জড়তা নেই, বেশ সহজ কথা। অলকার মনে হল কোথায় যেন তার হিসেবে একটা ভুল হচ্চে কিন্তু সেকথা ভেবে দেখবার এখন আর তার অবসর নেই; খুব কম মেয়েই যা পেরেছে তা তাকে পারতে হবে। সে জিগেস করলে, "সব শুনেছেন নিশ্চয়?"

রঞ্জন বললে, "শুনেছি। এরকম একটা বিশ্রী ব্যাপার যে হবে তা ভাবতেও পারি নি। অবনীবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানবার সুযোগ হয়েছিল তাতে তাঁকে সন্দেহ করবার কোন কারণ দেখতে পাই নি।"

"আমিও তাকে ভুল বুঝেছিলাম। আজ সত্যিই আমরা দুজনে দু'জনকে মুক্তি দিয়েছি।"

"ওসব কথার কোন মানে হয় না। মুক্তি কি অত সহজে দেওয়া যায় না নেওয়াই যায়? আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"না, সে উপায় আর নেই।" তার কথায় অস্বাভাবিক দৃঢ়তা দেখে রঞ্জন আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে, "তাহলে এবার কি করবে ঠিক করেছ?"

"আপনিই বলে দিন না।"

"আমি?" রঞ্জন যে ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়েছে তা তার কথায় প্রকাশ পেলে কিন্তু তা লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থা অলকার ছিল না। সে বললে, "যেদিন থেকে এখানে আসা বন্ধ করেছেন সেদিনকার কথা মনে আছে?"

"আছে।"

"মাঝের ক'টা দিন ভুলে গিয়ে সেখান থেকে আবার আরম্ভ করা যায় না?"

রঞ্জনের মুখে, চোখে বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠল; যে অলকাকে সে চিনত, একদিন শ্রদ্ধা করেছিল, এ যেন সে নয়। যে তটিনীর জন্যে সে চার বছর অপেক্ষা করে বসেছিল তাকে এত সহজে কি করে ভুলতে পারলে? অলকাকে হতাশ করতে তার কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু তা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। সে বললে, "আজ আমি নিরুপায়। আজ তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।"

"নিমন্ত্রণ? কিসের?" অলকা বেশ ভয় পেয়ে গেল।

রঞ্জন বললে, "পরশু আমাদের বিয়ে—আমার আর তটিনীর।"

"কংগ্র্যাচুলেশান্। তটিনী এল না যে? তার বুঝি আসতে লজ্জা করল?" এত সহজভাবে অলকা কথাগুলো বললে যে রঞ্জন কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকতে বাধ্য হল; যে অলকা এতক্ষণ কথা বলছিল এ যেন সে নয়। সেখানে দাঁড়িয়ে গবেষণা করে লাভ নেই তাই সে বললে, "যাবে তো? তটিনী অন্য সময় একা আসবে বলেছে।"

"নিশ্চয় যাব।"

রঞ্জনের কাছে অলকা আজ প্রথম রহস্যজনক বলে মনে হল; সে একটু ভাবতে, ভাবতে চলে গেল। অলকার সমস্ত শরীর জ্বালা করছিল; নিজেকে এভাবে অপমান কোন মেয়ে কোন দিন করেছে কিনা সন্দেহ। যে রঞ্জন একদিন তাকে ভিক্ষে চেয়েছিল আজ সে তাকে এত সহজে উপেক্ষা করে চলে গেল। অবনীর ওপর তার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল; তার জন্যেই তাকে আজ এত বড় অপমান সহ্য করতে হল। সে উঠে গিয়ে আরশির সামনে দাঁড়ালে, নিজের ছায়া আরশির ওপর দেখে নিজের মনেই বললে, "কৈ আজও তো আমার দৈহিক সৌন্দর্য্য একটুও কমে নি। তটিনী কি আমার চেয়ে সুন্দর? রঞ্জন তার মধ্যে কি পেলে? অবনীই বা মলিনার মধ্যে কি পেলে যার জন্যে ··" তার আর ভাবা হল না, আরশির ওপর একটা ছায়া এসে পড়ল। সে যে নিচেকার ঘরে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তা ভুলেই গিয়েছিল।

দ্বিজেন ঘরে ঢুকে বললে, "ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার অবশ্য খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল; বেয়ারা বললে ঘরে আপনি একাই আছেন······"

"না, এতে ক্ষমা চাইবার কি আছে?"

"দুঃসাহসের কাজ করেছিলাম কিন্তু তা না করলে বিরহিণীর রূপসজ্জা দেখবার সৌভাগ্য হত না।"

জোর করে মুখে হাসি এনে অলকা বললে, "বড্ড ভুল করলেন— প্রথমতঃ বিরহিণী নয় দ্বিতীয়তঃ রূপসজ্জার কোন উপকরণ এখানে নেই।"

"তার প্রয়োজনও নেই, সেগুলো শুধু অপব্যয়।"

"তাই না কি? খোশামোদটা বড্ড স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে না?"

"সত্যি কথা বললে খোশামোদ করা হয় না।"

"সত্যি কি না তাই দেখছিলাম আরশিতে।"

'আরশির চেয়ে আমার নিজের চোখের ওপর বিশ্বাস বেশী।"

'কিন্তু আপনার চোখের ওপর আমার বিশ্বাস না ও থাকতে পারে "

'তাতে ক্ষতি নেই, আমার ওপর একটু অনুগ্রহ থাকলেই হবে। দেখ আমি ভাল ক'রে সাজিয়ে কথা বলতে পারি না, সোজা কথা সোজা ক'রে বলি আর শুনতেও চাই। অবনীর সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে পারি ?"

অলকা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

দ্বিজেন বললে, "বেশ, তা'হলে আমি আমার দরখাস্ত পেশ করছি। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই; তুমিও ছেলেমানুষ নও, আমিও ছেলেমানুষ নই। আমার সম্বন্ধে তোমার যদি কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ থাকে, স্পষ্ট করে বল; অবশ্য তুমি আমাকে যিশু বা পরমহংস বলে নিশ্চয় মনে কর না ?"

অলকা যেন হঠাৎ পুরীর সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে বড় একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় তলিয়ে গেল; ঢেউয়ের সঙ্গে বালির ওপর ফিরে আসতে বেশ সময় লাগল, ফিরে এসেও অস্বস্তি গেল না, ভিজে বালিতে পা বসে যায়। সে তখন কিছু বলতে পারলে না, সময় চাইলে। রঞ্জনের কাছে অপমান সহ্য ক'রে সে ক্ষেপে উঠেছিল, ভেবেছিল যাকে হোক্ এমন কি অজয়, অনিল, সুরেশ, রমেনদের মধ্যে কাউকে মেনে নিতেও তার আর আপত্তি ছিল না, কিন্তু দ্বিজেনের কথায় তার মনে হ'ল বিয়েটাই হয়তো সব নয়; বিয়ে করার তার প্রয়োজন হয়েছে সত্যি কিন্তু যাকে তাকে বিয়ে করার নয়. দ্বিজেন অবশ্য এই 'যার তার' মধ্যে পড়ে না।

দ্বিজেন বললে, "বেশ, খানিকটা ভেবে দেখ; তবে যত বেশী ভাববে তত বেশী জটিলতা বাড়বে। সামনা সামনি জবাব দিতে যদি লজ্জা করে, ফোন করে জানিয়ে দিও।"

সে চলে গেল, অলকা যেমন ভাবে বসেছিল তেমনি ভাবেই বসে

রইল। ছেলে হিসেবে দ্বিজেন কা'র চেয়ে খারাপ নয়—বিলেত-ফেরত, ভাল চাকরী করে, বাপেরও বেশ পয়সা আছে কিন্তু এর কাছ থেকে অলকা কোন দিন এই কথাটা শুনবে আশা করে নি তাই সে হঠাৎ কিছু ঠিক করতে পারলে না। যত বড় ভাবপ্রবণই হোক একটু বেশী বয়েসে বিয়ের কথায় টপ্ করে রাজি হয়ে যেতে সবাই ভয় পায় তা তাদের বিয়ে করবার যত ইচ্ছেই থাক্।

অলকা, অবনী আর রঞ্জনের সঙ্গে দ্বিজেনের তুলনা না করে পারলে না। কোথাও মিল নেই, হয়তো তাদের দু'জনের মধ্যে কা'র পাশে দাঁড়াতেও পারে না, তবু তার উপাসকদের মধ্যে যে কোন একজনের চেয়ে অনেক ভাল; এর চেয়ে বেশী ভালর আশায় সে বসে থাকতে রাজি নয়। বিয়ে না করার কথা তার একবারও মনে হয় না। মেয়েদের পক্ষে বিয়ে না করে থাকা সম্ভব এ কথা সে ভাবতেও পারে না। আজ প্রথম সে তার মা'র অভাব বোধ করলে। তিনি থাকলে স্বামী নির্বাচন করবার প্রাথমিক ভারটা তার নিজের ওপর পড়ত না, হয়তো দেখে, শুনে অনেক আগেই বিয়ে দিয়ে দিতেন, হয়তো এতদিনে সে ঘোর সংসারী হয়ে উঠত 'কিন্তু যা হয় নি তা নিয়ে ভেবে লাভ কি?

সে সময় চেয়েছিল কিন্তু ঠিক কি যে ভেবে দেখবে তাই ভেবে পাচ্ছিল না। অবনী যখন ঠিক এই কথাই বলে তখন ভেবে দেখবার জন্যে সময় চাইতে হয়নি কারণ দু'জনেই প্রস্তুত হয়েছিল, বাকি ছিল শুধু ভাষায় প্রকাশ করা। অনেক কথাই তার মনে আসছিল কিন্তু কোনটাই সে শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখতে পারছিল না। দ্বিজেনের বাড়ীর কা'র সঙ্গে তার পরিচয় নেই; তাঁরা তাকে কি ভাবে নেবেন তাও সে বলতে পারে না। দ্বিজেনকে দেখে তার বাড়ীর লোকের সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় না; যাদের বাড়ীতে আদিমতম কুরুচি আজও রাজত্ব করছে তারাও

বাইরে বেশ সহজে আধুনিক সমাজের সঙ্গে মেশে, কিছু বুঝতে পারা যায় না।

যদি দ্বিজেনের বাড়ীর লোক তাকে সহজভাবে মেনে না নেন? সে তা সহ্য করতে পারবে না। অবশ্য তার কোন ক্ষতি নেই, সে যেমন ছিল তেমনি তা'র বাবার কাছেই থাকবে কিন্তু লোকে তো বলবে, "অলকা শ্বশুর বাড়ীতে থাকতে পারলে না।" তার চেয়ে বড় অপমান মেয়েদের কাছে আর কিছু নেই, তা সে মেয়ে যত আধুনিকই হোক। এত কথা ভাবছে দেখে তার নিজেরই হাসি এল; সত্যিই কিছু দ্বিজেনের বাড়ীর লোক তা'র সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন না এমন কি সে দ্বিজেনকে বিয়ে করবে কি না তাই এখনও ঠিক করে নি। অনেকক্ষণ ভেবে শেষে অলকা সেই প্রথম প্রশ্নেই ফিরে এল—দ্বিজেনকে বিয়ে করা ঠিক হবে কি না।

এত বড় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আর বেশীক্ষণ সে থাকতে পারলে না, তার মাথায় একটা অদ্ভুত খেয়াল এল; সে টেলিফোন্ বই এর পাতা উল্টে দ্বিজেনের বাড়ীর ফোন্ নম্বর বার করে ফোন্ করলে। অপর দিক থেকে সাড়া পেয়ে জিগেস করলে, "দ্বিজেনবাবু আছেন?"

ফোন্ ধরেছিলেন দ্বিজেনের মা, তিনি বললেন, "না, সে ফিরলে কি বলব? আপনার নাম?"

অলকা একবার ভাবলে তাদের টেলিফোন্ নম্বরটা বলে ফোন্ রেখে দেয় কিন্তু তা পারলে না। দ্বিজনকে বাড়ীতে নাও পাওয়া যেতে পারে এই আশাতেই সে ফোন্ করেছিল, আসল উদ্দেশ্যটা ছিল তার বাড়ীর কা'র সঙ্গে কথা বলা, আর যদি সম্ভব হয় তাই থেকে তাদের সম্বন্ধে একটা ধারণা করা। এ ইচ্ছেটা হয়তো প্রথম দিকে তার মনে বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় নি কিন্তু এখন আর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। হয়তো তার সম্বন্ধে কোন কথা দ্বিজেনের বাড়ীর কেউ জানে না; হয়তো বেশীর ভাগ

জায়গায় এ সব বিয়েতে যা হয়ে থাকে এখানেও তাই হয়েছে, বাড়ীর লোকের অমত, অশান্তি, বাপ মা'র চোখের জল—ভাবতেও তার ভয় হল। তাঁরা কিছু জানেন কি না জানা দরকার। সে জিগেস করলে, "আপনি কে জানতে পারি ?"

"আমি তার মা।"

"ও, তিনি এলে বলবেন অলকা ফোন্ করেছিল।"

"তুমি অলকা ?" প্রশ্নের মধ্যে অনেকখানি বিস্ময়, অনেকখানি কৌতূহল ছিল তা অলকার বুঝতে একটুও দেরী হল না। তিনি আবার জিগেস করলেন, "কি মা লক্ষ্মী, মত হ'ল ?"

অলকা এ প্রশ্নের জন্তে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, থাকলেও জবাব দিতে পারত না।

দ্বিজেনের মা বললেন, "বলতে লজ্জা করছে ? আমার কাছে লজ্জা কি মা ? আমি যে তোমার মা। কর্ত্তা তো তোমাদের ওখানে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।" দ্বিজেনের বাবা শ্রীকান্তবাবু ঘরে এসে জিগেস করলেন, "কা'র সঙ্গে কথা হচ্ছে ?"

দ্বিজেনের মা বললেন, "অলকার সঙ্গে।"

'আমাদের অলকা ? মানে লক্ষ্মীকান্ত বাবুর মেয়ে ?"

'আবার কে ? আমাদের কি না তা এখনও জানি না। কথা বলবে নাকি ?"

"বলব না ? তুমি বল কি ?" তিনি ফোন্ হাতে নিয়ে বললেন, "কি মা লক্ষ্মী আমাদের অলকা বলে কি ভুল করেছি নাকি ? তোমার বাবার সঙ্গে পরিচয় নেই, কিন্তু তাঁর নাম জানি ; তোমার সঙ্গে তো দেখা না হতেই পরিচয় হয়ে গেল ; তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করব, কখন গেলে দেখা হবে বলত ?"

এতখানি সহৃদয়তা অলকা আশা করে নি; খুব ভাল বাপ মা হলে হয়তো তাকে মেনে নেবেন এই পর্য্যন্ত সে ভাবতে পেরেছিল। ছেলের নিজের পছন্দ-করা বৌকে খুব কম বাপ-মাই ভাল চোখে দেখতে পারেন কারণ ছেলের ওপর বাপ-মার আধিপত্যের অভাবের মূর্ত্ত প্রমাণ হয়ে সে সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে তাই একটা সহজ স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে না। অলকা খুব খুসী হয়ে বলে উঠল, "আপনি কখন আসবেন বলুন বাবাকে সে সময় থাকতে বলব।"

"আমার জন্তে তাঁকে কাজের ক্ষতি করে বসে থাকতে হবে না মা, রাত্রে ৮টার পর বাড়ী থাকেন কি?"

"থাকেন।"

"আচ্ছা, আজ তাহ'লে সেই সময় যাব।"

দ্বিজেনের মা আবার ফোনটা নিয়ে বললেন, "আমিও যাব নাকি? তোমায় না দেখে যে আর স্থির থাকতে পারছি না মা।"

অলকার সব সন্দেহ, সব ভাবনা ভেসে গেল; সে বলল, "আসুন না যখন ইচ্ছে।"

অবনী চলে যাওয়ার পর আজ প্রথম তার মনে হ'ল তার বাবা ছাড়া তাকে চায়, তাকে ভালবাসে এমন লোক আছে। কিছুক্ষণ আগেও যে সে একেবারে হতাশ হয়ে গিয়েছিল তা আর তার মনেও পড়ল না; সে ভাবলে মাঝের ক'টা বছর ভুলে হয়তো সে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারবে।

—তের—

জামীন পাওয়ায় অবনী আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলে বটে কিন্তু আসল ব্যাপারের হল সবে সূত্রপাত। অবনী নিজে আইন ব্যবসায়ী,

আইনের সম্বন্ধে ভয় তার না থাকারই কথা, হয়তো নেইও কিন্তু জেল-খানাকে সে ভীষণ রকম ভয় করে। কংগ্রেসের হুকুমে দলে, দলে দেশের লোককে জেলে যেতে দেখে সে বলেছে, "ওদের মাথা খারাপ হয়েছে! ওটা কি দার্জ্জিলিং না শিলং না কাশ্মীর যে সখ করে যেতে হবে?" সে কখন ভাবতেও পারে নি তাকে একদিন জেলের ভয় করতে হবে। এখনও পর্য্যন্ত তার মাকে সে কোন কথা জানায় নি। অলকার সঙ্গে যে তার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে তাও সে তাঁকে বলে নি তবে কথাটা যে বেশীদিন চেপে রাখতে পারবে না তা সে জানত—ক'দিন অলকা না এলেই তিনি জিগেস করবেন কি হয়েছে।

অবনী তার ঘরে বসে একখানা ফৌজদারী আইনের বই পড়ছিল, চাকর এসে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে। সে জানত এর কারণ কি তাই কোন কথা জিগেস করলে না। তার মা ঘরে এসে জিগেস করলেন, "অলকা আর এ ক'দিন আসে নি কেন বলত?"

অবনী জিগেস করলে, "হঠাৎ এ কথা জিগেস করছ যে?"

তার মা আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "জিগেস করব না, বলিস কি? সে হবে আমার ঘরের বৌ।"

"তাকে তুমি খুব ভালবাস, না মা?"

"কথা শোন! তুই আমার একটী মাত্র ছেলে, সে হবে তোর বৌ, তাকে ভালবাসব না? তা'ছাড়া সে ভারী লক্ষী মেয়ে।"

"হাঁ, হয়তো আমাদের পক্ষে একটু বেশী দামী মেয়ে।"

"দামী মেয়ে? কেন, আমার ছেলের কাছে তার দাম কি এমন বেশী?"

হাসতে, হাসতে অবনী বললে, "লক্ষী-পেঁচার গল্প জান ত? মা মাত্রেই নিজের ছেলেকে বড় করে দেখে।"

তার মাও হাসতে, হাসতে বললেন, "দুষ্টুমি করিস নি। অলকাকে আসতে বলে দে, তার জিনিষ-পত্র দেখে শুনে কিনবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবনী বললে, "ব্যস্ত হবার দরকার নেই মা।"

তার কথা শুনে রীতিমত রকম আশ্চর্য্য হয়ে তার মা জিগেস করলেন, "তার মানে? তুই বলিস কি? দু'দিন বাদে বিয়ে ...."

"বিয়ে তো নাও হতে পারে?"

"কি যে বলিস?" তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল।

কথাটা অবনী তাঁকে স্পষ্ট করে বলতে পারছিল না কিন্তু আর না বললেও নয় তাই এ সুযোগ নষ্ট না করে সে বললে, "শুনে কষ্ট পাবে মা তাই এতদিন বলি নি।"

ব্যস্ত হয়ে তার মা বললেন, "না, না, তুই সব কথা খুলে বল। এই জন্য তোকে ক'দিন অন্যমনস্ক দেখছি।"

"অন্যমনস্ক দেখছ সেটা হয়তো ঠিক কিন্তু তার কারণটা ধরতে পার নি। কোন একটী মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছিল কিন্তু বিয়ে হল না এ নিয়ে মন খারাপ করতে গেলে আরও অনেক ছেলেমানুষ হতে হয় মা।"

"না, তুই বড্ড বুড়ো হয়ে গেছিস। ব্যাপারটা কি খুলে বল।"

অবনী সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বললে অবশ্য তার জেল হওয়ার সম্ভবনার কথাটা ছাড়া। সব শুনে তার মা বললেন, "এই কথা? এই জন্যে একেবারে বিয়ে হতে পারে না ঠিক করে বসে আছিস? আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, আমার সঙ্গে দেখা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"কখন তোমার কোন কাজে আপত্তি করি নি মা কিন্তু আজ করছি; তাকে ডেকে পাঠিও না, এমন কি তার সঙ্গে দেখাও কোর না। সামান্য ব্যাপার বড় করে আমি দেখি না; বেশ ভাল করে বুঝেছি আমরা কেউ কারুকে চিনতে পারি নি; সেও আমায় ভুল বুঝে এসেছে,

আমিও তাকে ভুল বুঝে এসেছি; দুজনেরই ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে বিয়ে হবার আগে ভুল বুঝতে পেরেছি।"

"আমার কিন্তু মনে হয়· ···" তার কথা শেষ হল না, চাকর একখানা টুক্‌রো কাগজ এনে অবনীর হাতে দিলে, তাতে লেখা ছিল 'কমল মিত্র'। অবনী অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে মনে করতে পারলে না। মাকে ভেতরে যেতে বলে চাকরকে বললে, "পাঠিয়ে দে।" তার মা বেশ বিরক্ত হয়ে ভেতরে চলে গেলেন, কমল এসে নমস্কার করে বললে, "চিনতে পারেন মিষ্টার গুপ্ত?"

অবনী চিনতে পেরেছিল, বললে, "নমস্কার। আমার কাছে·· "

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কমল বললে, "বিশেষ দরকার বলেই এসেছি, আপনি ছাড়া আর কেউ আমাদের সাহায্য করতে পারবে না।"

অবনী জিগেস করলে, "আমি আপনাদের কি করে সাহায্য করব? আর কেনই বা করব?"

"সেই কথাই তো বলতে এসেছি আর · · "

বাধা দিয়ে অবনী বললে, "আমায় বলে লাভ নেই। আপনাদের ওর মধ্যে আর পা দিচ্ছি না: একবার যে শিক্ষা হয়েছে · ·· "

"আপনার কাছে এটা আশা করি নি মিষ্টার গুপ্ত। যে শিক্ষা আপনি পেয়েছেন তার ফল কি এই হল যে আরও অনেকে সেই শিক্ষা পাবে জেনে, উপায় থাকতে আপনি চুপ করে বসে থাকবেন? আপনি শিক্ষা পেয়েছেন আর মলিনা দি?"

বেশ নির্লিপ্তভাবে অবনী জিগেস করলে, "কেন? তার কি হয়েছে? সে তো আপনাদের দলেরই লোক।"

"দলের লোক হলেই বুঝি বেঁচে যায়? তাহলে মলিনাদি জেলে গেল কেন?"

অবনীর নির্লিপ্তভাব উবে গেল ; সে জিগেস করলে, "মলিনা জেলে ? কেন ? কি হয়েছে ? কৈ কিছু তো শুনিনি, কাগজেও দেখি নি····· "

"না, কাগজে কিছু বেরোয় নি। ক'ঘণ্টার জন্যে নৈহাটী গিয়েছিলাম, ব্রজেশবাবুর একখানা চিঠি নিয়ে ; ফিরে এসে শুনলাম মলিনাদির ঘর থেকে একখানা প্রস্‌ক্রাইব্‌ড্‌ বই পাওয়া যায়, তাই পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। অনেক কষ্টে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম কিন্তু তিনি কোন উকিল, ব্যারিষ্টার দিতে রাজী হলেন না।"

"কেন তা কিছু বুঝতে পেরেছেন ?"

"না। আপনাকে জানাতেও বারণ করেছিলেন।"

কথাগুলো শুনে অবনী খুব আশ্চর্য্য হয়েছিল কিন্তু তা প্রকাশ না করে বললে, "এর সঙ্গে আমার আপনাদের সাহায্য কবার কি সম্পর্ক ? আর আপনাদের সাহায্যের দরকারই বা কি ?"

"আপনাকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে কোলিয়ারী অঞ্চলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে, অবশ্য আমরা ভাল করে প্রপাগ্যান্‌ডা করবার ব্যবস্থা করেছিলাম।"

"উদ্দেশ্য ?"

"ওরা বিলেত-ফেরতাদের দেবতা বলে মনে করে, তার ওপর একবার গ্রেপ্তার হলে তো কথাই নেই। আপনি এখন অনায়াসে ওখান থেকে ওদের প্রতিনিধি হতে পারেন।"

"ধরে নিলাম পারি, যদিও তা বিশ্বাস করি না ; তারপর ?"

"ব্রজেশবাবু বরাবর ওখান থেকে প্রতিনিধি দাঁড়ান, এবারও তাই করছেন ; আমরা ব্রজেশবাবুকে আর চাই না। কিছুদিন থেকে দেখছি তিনি শ্রমিকদের উপকার করা দূরে থাকুক ভেতরে, ভেতরে তাদের ভয়ানক ক্ষতি করছেন। কমিটির আর সব সদস্যরা তাঁর ওপর চটেছেন, বিশেষ মলিনাদির জেল হওয়ার পর থেকে।"

অবনীর ক্রমশঃ বেশ কৌতূহল হচ্ছিল, সে জিগেস করলে, "কারণ ?"

"অনেকে সন্দেহ করে এতে তাঁর হাত আছে।"

"শুধু সন্দেহ করলেই তো চলবে না।"

"তিনি কমিটিতে থাকতে প্রমাণ সংগ্রহ করা যাবে না। তাঁকে তাড়াতে হলে এক আপনি ·..."

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অবনী বললে, "যে কোন কারণে হোক আজ আপনাদের ব্রজেশবাবুর ওপর রাগ হয়েছে তাই তাঁকে তাড়াতে চাইছেন ; সেজন্যে তাঁর নামে দোষও দিচ্ছেন, একটা ষড়যন্ত্রও সৃষ্টি করছেন। একদিন আমার বিপক্ষেও যে এই রকম কিছু করবেন না··· ·"

কমল বেশ উত্তেজিত হয়ে বললে, "দরকার হলে নিশ্চয় করব। আমাদের দেশটা হচ্ছে কর্তাভজার দেশ, যাকে বড় করে তার দাসত্ব করতে লজ্জা বোধ করে না তাই বলে যে বড নয় তারও দাসত্ব করতে হবে ? আপনার যদি নেতা হবার গুণ থাকে আমরা আপনাকে মাথায় করে রাখব আর তা না হলে ব্রজেশবাবুর মত আপনাকে তাড়াবার জন্যেও ষড়যন্ত্র করব।"

ছেলেটীর স্পষ্ট কথা অবনীর বেশ ভাল লাগল কিন্তু সামান্য একটা মিটিংএ গিয়ে যে ফ্যাসাদে পড়েছে তা মনে হতে আর সে পথ মাড়াতে সাহস হল না, বললে, "আমায় ক্ষমা করুন, আমি ওর মধ্যে যাচ্ছি না।"

কমল একটুখানি চুপ করে বসে থেকে বললে, "এসব কথার পর ও নয় ? বেশ তাহলে আরও স্পষ্ট করে বলছি। মলিনাদিকে কেন জেলে যেতে হয়েছে জানেন ? বাপের বয়সী ব্রজেশ দত্তর কাছে আত্ম-সমর্পণ·· ··"

তাকে বাধা দিয়ে অবনী বললে, "থামুন। আপনারা যে এতদূর নামতে পারেন তা আমার জানা ছিল না ; আপনি যেতে পারেন। এই আমাদের দেশের পলিটিক্স !"

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় কমল বলে গেল, "আপনাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম।"

সে চলে যেতে অবনীর মনে হ'ল কাজটা ভাল হল না, ভদ্রলোকের ছেলেকে ওভাবে অপমান করা তার উচিৎ হয় নি। ব্রজেশের সম্বন্ধে সে যা বললে তা মিথ্যে বলেই বা ধরে নিচ্ছে কেন? মিষ্টার সেনও তো ঐ রকম কিছু বলতে চেয়েছিলেন। তার একবার মনে হল মলিনার সঙ্গে দেখা করে কিন্তু সাহস হল না—তা থেকে আবার অনেক কিছু প্রমাণ করবার চেষ্টা হতে পারে। সে বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। মিষ্টার সেনকে সব কথা বলতেও লজ্জা করছিল অথচ বলবার মত লোকও আর কেউ নেই। শেষে তাঁর কাছে যাবে বলেই উঠছিল, চাকরের সঙ্গে মালতী এসে ঘরে ঢুকল। চাকরটা বললে সে কাগজে নাম লিখে দিতে বলেছিল কিন্তু মহিলাটী রাজি হন নি। অবনীর কাছে অচেনা মহিলা খুব বেশী আসেন না তাই সে একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে, "আপনার কি আমার সঙ্গে কোন দরকার আছে না মা'কে····· "

মালতী বললে, "আপনিই তো অবনীবাবু? আপনার কাছেই একটু দরকার আছে।" সে বেয়ারার দিকে চাইতে অবনী তাকে যেতে বললে। বেয়ারা চলে গেলে মালতী বললে, "আপনি মলিনাকে চেনেন?"

অবনী বললে, "হাঁ, চিনি কিন্তু আপনি কে?"

"আজ আমার পরিচয় দিতে পারব না বাবা, আমায় ক্ষমা কর; শুধু একটা কথা বলতে এসেছি, মলিনা বড় অসহায়, তাকে বাঁচাও।"

অবনীর বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। সে কিছু বলবার আগেই মালতী বললে, "তার জেল হয়েছে তাতে খুব ক্ষতি নেই, কিছুদিন জেলে থাকলে বরং সে নিরাপদ থাকবে কিন্তু তোমার সাহায্য না পেলে ফিরে আসবার পর ঐ শয়তানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"মলিনা দেবীর ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই। তাঁকে চিনি এই পর্যন্ত..... "

অবনীর মনে হ'ল হয়তো সে ভুল করছে তবুও জিগেস করলে, "আপনি কমলদের দলের কেউ নয় তা কি করে জানব?"

"কমল বলে কাউকে আমি চিনিনা বাবা, তোমার নামও জানতাম না ঐ ব্রজেশ দত্তই বললে তুমি মলিনাকে......"

সে চুপ করতে অবনী বললে, "থামলেন কেন?" কোন জবাব না পেয়ে জিগেস করলে, "আপনি মলিনার কে?"

অস্বাভাবিকভাবে চমকে উঠে মালতী বললে, "না, না আমি তার কেউ নই; আমি তাকে চিনি না, সেও আমায় চেনে না।"

কথাগুলো অবনী মোটেই বিশ্বাস করতে পারলে না, জিগেস করলে, "আপনি ব্রজেশ দত্তকে কতদিন চেনেন?"

"অনেক দিন, প্রায় বিশ বছর।"

"ওর সম্বন্ধে কি জানেন?"

"যদি বলি, তুমি মলিনাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করবে?"

"আমার যতটুকু ক্ষমতা তা করব।"

"ওর আসল নাম হচ্ছে সুরেন ঘোষ, একজন ফেরারী আসামী, এতদিন পর সন্ধান পেয়েছি..... "

"পুলিশে খবর দেননি কেন?"

"উপায় নেই বাবা, থাকলে সে কথা তোমায় মনে করে দিতে হত না।"

"উপায় নেই কেন সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। আপনি যদি সব কথা গোপন করে যান তাহলে..... "

"আর কোন কথা বলতে পারব না; তুমি কথা দিয়েছ তাকে বাঁচাবে। সে বড অভাগী, এতেও যদি তোমার দয়া না হয় তাহলে......"

"আমি তাকে কি করে বাঁচাতে পারি সেইটাই বুঝতে পারছি না।"

"সুরেন ঘোষের কথায় মনে হয়েছিল তুমি তাকে ভালবাস তাই তোমার কাছে এসেছিলাম।"

"আমি তাকে·····" সে কথা শেষ করতে পারলে না ; তার মনে হল মলিনাকে ভালবাসে কিনা তা সে নিজেই জানে না, ওকথা ভাববার তার কখন অবকাশই হয় নি। তাকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে মালতী চলে গেল। অবনী মলিনার সঙ্গে দেখা করবার উপায় করে দেবার জন্যে মিষ্টার সেনকে অনুরোধ করতে গেল।

—চোদ্দ—

দ্বিজেন অলকাকে বিয়ে করতে চেয়েছে শুনে প্রথমে তার বন্ধু বা বান্ধবীরা কেউই বিশ্বাস করতে পারে নি। দ্বিজেন অনেকদিন আসে নি, সে যে অলকাকে বিয়ে করতে চায় তাও কেউ বুঝতে পারে নি। অলকার বান্ধবীদের মধ্যে কেউ, কেউ বললে, "ভালই করেছ, বেশী দিন বিয়ে না করলে বিয়ের বাজারে দাম কমতে থাকে—অনেকটা বিক্রী না হওয়া, দোকানে পড়ে থাকা জিনিষের মত।" এদের প্রায় সকলেরই বিয়ে হয়েছে। যাদের বিয়ে হয় নি সুযোগের অভাবে অথচ বলে বেড়ায় বিয়ের প্রয়োজন তারা স্বীকার করে না তারা বললে, "এতো অলকার পক্ষে আত্ম-বলিদান! অবনীর পরে দ্বিজেন, একি সহ্য হয়?" তফাৎটা যে কোথায় তা হয়তো কেউই দেখিয়ে দিতে পারত না ; অবনী বিলেত ফেরতা, তার বাপের পয়সা আছে, দ্বিজেনও বিলেত ফেরতা তার বাপেরও পয়সা আছে, বরং সে ভাল চাকরি করছে, অবনী এখনও রোজগার করে

না। তবু লোকে বলতে ছাড়ে না, হয়তো তারা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার চেষ্টা করে, হয়তো অলকাকে তাদের দলে পেয়েছিল সে দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে তারই দুঃখ ভোলবার জন্যে আত্ম-প্রবঞ্চনা করে। দ্বিজেনের ইতিহাস জেনে কেউই বলে না, হয়তো অবনী ছাড়া কেউই জানে না—তবু তারা বলে।

এসব কথা অলকার কানে আসে। সে যা করছে তা ঠিক কিনা এ প্রশ্ন তার নিজের মনেও ওঠে নি এমন নয়; এছাড়া আর তার করবার কি ছিল? অবনী তার ওপর অন্যায় করেছে, রঞ্জন তাকে অপমান করেছে, এর পর আর তার কোন দোষ থাকতে পারে না এই কথা সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। নলিনার মত মেয়ে যখন অবনীকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে তখন তার ওপর নির্ভর করার কোন অর্থই হয় না। হয়তো সে একদিন তার ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে, এ আশায় তার পথ চেয়ে বসে থাকায় নিজেকে যতটা ছোট করতে হয় অলকা তা করতে রাজি নয়। অবনী চলে যাওয়ার পর থেকে ঘটনার স্রোতটা যদি ঠিক এভাবে না চলত তাহলে সে কি করত তা বলা যায় না তবে এখন এ ছাড়া আর কিছু তার মনে এল না; ভুল করেছে এ সন্দেহ তার একবারও হয় নি। অবনীর দেওয়া অপমানের আঘাতটা ভোলবার সময় পেলে হয়তো সে নিজের সিদ্ধান্তে নিজেই চমকে উঠত কিন্তু সেটুকু অবসর সে পায়নি; তার মনে হল সে অবনীকে সত্যিই কোনদিন ভাল বাসেনি—অন্ততঃ তাকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই এমন কি খুব কষ্টকরও নয়।

লক্ষ্মীকান্তর কাছে দ্বিজেনের বাবা-মার আসার কথা বলতে তার খুব লজ্জা করছিল। একটা ভয়ানক রকম ষড়যন্ত্র করে একেবারে অনভিজ্ঞ লোক ধরা পড়লে তার যে রকম অবস্থা হয়, অলকার অবস্থাটা হয়েছিল

অনেকটা সেই রকম। দ্বিজেনের বাবা-মা আসছেন শুনে লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "হঠাৎ তাঁরা আসছেন কেন বলত ?" অলকা জবাব দিতে পারলে না ; তার কাছে জবাব না পেয়ে লক্ষ্মীকান্ত নিজের মনেই বললেন, "কোন বিশেষ কাজে আসছেন না এমনি দেখা করতে ? হঠাৎ দেখা করতেই বা আসবেন কেন ? দু'জনে যখন একসঙ্গে আসছেন, বিশেষ কোন কাজ আছে বলেই তো মনে হয়।" হঠাৎ একটা কথা মনে হতে তিনি বেশ একটু খুশী হয়ে বললেন, "দ্বিজেন তোমায় কিছু বলেছে নাকি ?" একেবারে এত সোজা করে তার বাবা যে তাকে একথা জিগেস করবেন তা সে ভাবে নি ; বিশ্বের লজ্জা এসে তাকে আশ্রয় করলে।

লক্ষ্মীকান্ত তার মানসিক অবস্থা বুঝে বললেন, "তোমার তো লজ্জা করলে চলবে না মা, তোমার আমার মধ্যে এমন কেউ নেই যে এসব কথা কইতে পারে ; তোমায় সব কথা স্পষ্ট করে বলতেই হবে। তোমায় দ্বিজেন কিছু বলেছে ?"

অলকা ঘাড় নেড়ে জানালে বলেছে। লক্ষ্মীকান্ত জিগেস করলেন, "তুমি তাকে কোন জবাব দিয়েছ ?"

অলকা বললে, "না।"

"সে নিশ্চয় তার বাপ-মাকে সব কথা বলেছে, বিয়ের সম্বন্ধে কথা বলতেই বোধহয় তাঁরা আসছেন।" অলকা কোন কথা বললে না। লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "যা হয় কিছু ঠিক কর, তাঁরা যদি কথাটা তোলেন একটা কিছু বলতে হবে তো। তোমার নিজের মনের ইচ্ছে যা তাই বোলো।"

"আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না বাবা।"

"ছেলে হিসেবে দ্বিজেন কার চেয়ে খারাপ নয়। আচ্ছা ভেবে দেখি।"

দ্বিজেনের বাব-মা লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে দেখা করে যেতে লক্ষ্মীকান্তকে স্বীকার করতে হল তাঁরা চমৎকার লোক। অলকাও তাব বাবার সঙ্গে এক মত।

দ্বিজেনের বাবা শ্রীকান্তবাবু একজন নামজাদা উকিল অথচ অত্যন্ত সাদাসিধে লোক। তিনি আসতে লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "দেখুন তো মশায়, কি অন্যায় কথা! আমার কন্যাদায়, কোথায় আমি যাব আপনার কাছে, তা নয় আপনি নিজে এসে আমায় লজ্জা দিলেন।"

শ্রীকান্ত বললেন, "আপনার কন্যাদায় কি আমার পুত্রদায় তা ঠিক বুঝতে পারছি না। কি বিপদেই পড়েছি মশায়! এমন দিন যায় না যে একটা না একটা মেয়ের জন্যে কেউ আসেন না; প্রথম, প্রথম হয়তো ভালই লাগত কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম—না চায় ছেলে বিয়ে করতে, না চায় লোকে সে কথা বিশ্বাস করতে। আপনার মেয়েকে যে ও বিয়ে করতে চেয়েছে তাতে আপনার কোন উপকার হোক আব না হোক আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়েছে। ঐ আমার একটী মাত্র সন্তান, বৌ না এলে আর আমাদের চলছিল না।" লক্ষ্মীকান্তর মনে হচ্ছিল লোকে ছেলের বাপের সম্বন্ধে যে দুর্ণামগুলো রটায় সেগুলো নেহাৎ মিথ্যে।

দ্বিজেনের মা বললেন, "তা মা তোমার এখানে যা সেখানেও তাই; এখানে তুমি এক মেয়ে, সেখানে এক বৌ, একটা ননদও নেই; বুড়ো বুড়িকে একটু দেখ মা, ছেলে তো এক রকমের, রোজ দেখাই হয় না; আমাব খেয়ালী শিবকে ঘরবাসী কোর মা।"

কথাগুলো অলকার বেশ লাগল। সে আদবেব মেয়ে, আদরের বৌ না হলে তাকে মানায় না। যেখানেই সে থাকুক সকলের দৃষ্টি তার ওপর থাকা চাই, সে যা করবে সবাই তা মেনে নেবে, সবাই তার স্নেহের, তার ভালবাসার তার একটু কথা শোনবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠবে এই সে চায়। বান্ধবীদেব মধ্যে যে তাকে প্রাধান্য না দিত তার সঙ্গে অলকার বন্ধুত্ব বেশী দিন বজায় থাকত না। তার বাবা কোন দিন তার কোন কাজে বাধা দেন নি তাই সে বলত তার বাবার মত বাবা সকলের হয় না। দ্বিজেনের বাবা মা'র কথা

শুনে তার মনে হল বিয়ের পরও তার প্রাধান্য বজায় থাকবে তাই তাঁদের অত ভাল লাগল।

দ্বিজেনের বাবা মা ঠিক কখন আসবেন অলকা জানত না তাই তৈরী হয়ে নেবার সময় পায় নি। দ্বিজেনের মা ঘরে ঢুকে বললেন, "বাঃ,' চমৎকার মেয়ে, চল মা, কর্তাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।" অন্য সময় নিজেকে লোকের সামনে বার করবার উপযুক্ত করে তুলতে অলকার অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় লাগে কিন্তু আজ তার এক মিনিট সময় ও নষ্ট করতে ইচ্ছে করছিল না, দ্বিজেনের মা বলতেই সে তাঁব সঙ্গে গেল।

যে ঘরে লক্ষ্মীকান্ত আর শ্রীকান্ত বসে কথা বলছিলেন সে ঘরে ঢুকে দ্বিজেনের মা বললেন, "দেখগো বৌ পছন্দ হয় ?" অলকা শ্রীকান্তকে প্রণাম করতে তিনি বললেন, "এ মেয়েকে যার পছন্দ হবে না তার ছেলের জন্যে মেয়ে না দেখে কেষ্টনগরের পুতুল দেখা উচিত। এই দুই বুড়ো, বুড়ীর ভার তোমায় নিতে হবে মা ; তোমার বাবা তো এখনও বেশ ছেলেমানুষ আছেন কিন্তু আমরা অনেক এগিয়ে গিয়েছি, আমাদের ঘরে যাবে তো ম. ?"

তাঁর সব কথা হয়তো অলকার কানেই পৌছল না ; ভাববার, বোঝবার, শোনবার সমস্ত শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলেছিল। সামনে তার জীবনের এই বিরাট পরিবর্ত্তন অথচ তার একটুও ভয়, একটুও সন্দেহ হচ্ছিল না, সে যেন ধরে নিয়েছিল তার জীবন সহজ, সুন্দর হবে ; বিয়ের পর তার জীবনে একটী মাত্র পরিবর্ত্তন আসবে সে হচ্ছে কতকগুলি স্নেহাতুর চিত্তকে সন্তুষ্ট করা—তাদের দাবী খুব সামান্যই। স্বামী নামক যে ব্যক্তিটীর সঙ্গে তার একটা বিশেষ সম্পর্ক হবে অলকার মনে হল তাকে নিয়ে ব্যস্ত হবার বিশেষ কোন দরকার নেই, কেন এ কথা মনে হল তা অবশ্য সে বলতে পারত না। মোট কথা এদের কাছে নিলেই চলবে, দেবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন হবে না।

দ্বিজেনের বাবা মা চলে যাওয়ার পরই দ্বিজেন এল। অলকা জিগেস করলে, "বাইরে অপেক্ষা করছিলেন না কি? আপনার বাবা-মা চলে যাওয়ার সঙ্গে, সঙ্গে এসে হাজির হলেন?"

"বাবা-মা এসেছিলেন? কি বললে তাঁদের? তাঁদের কাছেও সময় চেয়েছ না কি?" দ্বিজেন জিগেস করলে।

"তাঁরা বড় নির্দ্দয় বিচারক, সময় দেন না; একেবারে বিচার করে, রায় দিয়ে চলে গেলেন।"

অলকা হাসতে লাগল; দ্বিজেন তার হাত ধরে জিগেস করলে, "আপিল করবে না রায় মেনে নেবে? মেনে যদি নাও তাহলে আমার সম্পত্তি আমি দখল করি।"

অলকা বললে, "আপীল করবার মত কোর্ট খুঁজে পাচ্ছি না।"

"পেলে করতে; আচ্ছা সে পথ বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।"

অলকা নিজেকে দ্বিজেনের হাতে সমর্পণ করলে।

—পনের—

উপায় নেই বলে অবনীকে মিষ্টার সেনের সঙ্গে দেখা করতে হল। মলিনার সঙ্গে তার এখনই দেখা করতে হবে—কিন্তু সে এমন কাউকে চেনে না যার সুপারিশে তার পক্ষে মলিনার সঙ্গে এত অল্প সময়ের মধ্যে দেখা করা সম্ভব। মলিনার জেল হয়েছে শুনে সে হয়তো একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল কিন্তু একটুও বিচলিত হয়নি, জেল সে আগেও খেটেছে না হয় আর একবার খাটবে—কিন্তু কমলের বিশ্রী ইঙ্গিত আর মালতীর

স্পষ্ট কথা তাকে চঞ্চল করে তুললে, এত বেশী চঞ্চল করে তুললে যে মালতী কে সে প্রশ্ন একবারের বেশী তার মনেই উঠল না। তাব মনে হল সব চেয়ে বেশী দরকার মলিনার সঙ্গে দেখা করা, হয়তো সে একান্ত অসহায়। হয়তো কেন, নিশ্চয়—ব্রজেশ দত্তই ছিল তার ভরষা। সেই ব্রজেশ দত্তই যদি তার সঙ্গে শত্রুতা করে থাকে তাহলে সে অসহায় ছাড়া কি? ব্রজেশ দত্তর বিপক্ষতা করার জন্যে কমলকে সে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো মনে পড়তে সে ভাবলে তার নিজের বিপক্ষেও একটা বিশ্রী ষড়যন্ত্র থাকা বিচিত্র নয়—তা না থাকলে যেসব কথা সে বলেনি তা কাগজে বেরোয় কি করে? কাগজে তার নামে মিথ্যে কথা বেরুনোর কৈফিয়ৎ সে খুজে পেল কিন্তু ব্রজেশ দত্তর এ আচরণের কারণ খুজে পেল না। হঠাৎ কেন সে তার সঙ্গে শত্রুতা করবে? মলিনার সর্ব্বনাশ করবারই বা কেন চেষ্টা করবে? আর দুটোই ঠিক এক সময়ে হবে কেন? এ প্রশ্নের স্বাভাবিক জবাব যা তা নিজের কাছে পেতে হলে যেটুকু স্থির হয়ে ভাবা দরকার অবনী তা পারলে না।

অবনীকে দেখে মিষ্টার সেন জিগেস করলেন, "কি হে আবার কি হল? মনে হচ্ছে এইমাত্র জেলের দরজার বাইরে এলে, ব্যাপার কি?" মানসিক অশান্তির ছায়া যে মুখে, চোখে এত স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল তা অবনী বুঝতে পারে নি, পারলে হয়তো একটু ঢাকবার চেষ্টা করত। এখন আর তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই তাই সে কথার জবাব না দিয়ে জিগেস করলে, "জেল বিভাগের কোন বড় অফিসারের সঙ্গে আলাপ আছে?"

মিষ্টার সেন একটু আশ্চর্য্য হয়েই জিগেস করলেন, "কেন?"

"জেলে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, আজই। একটা আপীলের ব্যবস্থা করতে চাই।"

"আমার নিজের সঙ্গে তেমন আলাপ নেই। আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে

একজন বড় অফিসারকে ক'বার দেখেছি ; ফোন্ করে দেখি যদি কিছু হয়।" মিষ্টার সেনের সে বন্ধুটী ফোনে তাঁর অফিসার বন্ধুটীর সঙ্গে কথা বলে মিষ্টার সেনকে জানালেন ব্যবস্থা হতে পারে।

মিষ্টার সেন বললেন, "তাহলে এখনি চলে যাও।" অবনী তাঁকেও সঙ্গে যেতে বললে ; তিনি আপত্তি করলেন কিন্তু সে শুনলে না। মোটরে উঠে মিষ্টার সেন জিগেস করলেন, "লোকটী কে হে যার জন্তে এত ব্যস্ত? খুব বড লোক নাকি? কত টাকা আমায় দেবে বলত?"

"এক পয়সাও নয়।"

মিষ্টার সেন হাসতে, হাসতে বললেন, "খুব জুনিয়ার তো হে। কোথায় ভাল, ভাল কেস্ পাইয়ে দেবে তা নয় একেবারে মুফৎ।"

"যে মেয়েটীর সঙ্গে কোলিয়ারী......"

"আহা নামটাই বলনা! মলিনা তো? আমার মনে আছে। তার আবার কি হয়েছে?"

"জেল।"

রীতিমত রকম চম্‌কে উঠে মিষ্টার সেন বললেন, "বল কি? মলিনার জেল হয়েছে? সে আবার কি করলে?"

"সব কথা ঠিক জানি না তবে যেটুকু জানি তাতে মনে হয় তার ঘর থেকে একখানা প্রস্‌ক্রাইব্‌ড্ বই পাওয়া যায় ... "

"তাই না কি?"

"বইটা তার নয় ; কেউ হয়তো তাকে বিপদে ফেলবার জন্তে বইখানা তার ঘরে রেখে যায়।"

"ওসব প্রমাণ করা বড় শক্ত, তাছাড়া আদালতে তার পক্ষের উকিল নিশ্চয় এ সব কথা তুলেছিলেন।"

"তার পক্ষে কোন উকিল ছিল না।"

"সে কি? কেন?"

"তা জানি না, সেই সব জানবার জন্তেই যাচ্ছি। আপীল করলে……" বাধা দিয়ে মিষ্টার সেন বললেন, "নিশ্চয়। আপীল না চলে তো রিভিসানের দরখাস্ত করতে হবে বৈ কি। বেশ একটা রহস্য রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"আমার ও তাই মনে হয়।"

মিষ্টার সেনের বন্ধুর অফিসের দরজায় গাড়ী থামল তাই আর কোন কথা হল না। ভদ্রলোক একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, "সাহেবের কাছে চলে যাও, দেখা করলেই হুকুম পাবে, সব ব্যবস্থা করা আছে।"

জেলখানার দরজায় পৌছে মিষ্টার সেন বললেন, "তুমি যাও, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।" অবনী তাঁকে সঙ্গে যাবার জন্মে অনুরোধ করলে, তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না, শেষ পর্য্যন্ত বললেন, "আমার মত একজন বাইরের লোকের থাকা মোটেই উচিত নয়, সব কথা হয়তো আমার সামনে তিনি নাও বলতে পারেন তাছাড়া তোমার পক্ষেও… …" অবনী তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝলে কিন্তু জবাব দেবার চেষ্টা করলে না।

তার জেল হওয়ার কথা শুনলে অবনী যে দেখা করতে আসবে এ আশা মলিনা করেছিল তবে এত তাড়াতাড়ি যে সে আসবে তা ভাবে নি। অবনী বললে, "আচ্ছা এক কাণ্ড করে বসেছেন, নিন্ এই কাগজখানায় সই করে দিন।" সে এক খানা ওকালৎনামা সামনে ধরে বললে, "যা করে দেখা করা।" মলিনা বললে, "কেন এত কাণ্ড করলেন? যদি দরকারই থাকবে তাহলে আগেই বা আপনাকে জানাব না কেন?"

"দরকার নেই মানে? এটা কি স্বাস্থ্য-নিবাস নাকি যে ইচ্ছে করে থাকতে হবে?"

"আমার কাছে ঐ রকম কিছু কি তার চেয়েও বেশী; আমার এখন এই

রকম কোন জায়গায় কিছুদিন থাকতে হবে, এ পরিবর্ত্তন আমার জীবনে বিশেষ দরকার।"

"এ কথার কোন মানে হয় না" অবনী রাগ করে বললে।

"আমায় বিশ্বাস করুন বাঁচতে হলে আমায় এখন এখানে থাকতে হবে। আজ আপনাকে সব কথা বলতে পারছি না, কোনদিন পারব কি না জানি না·· ·· "

মলিনার চোখে জল। যারা মেয়েদের চোখে দু'ফোঁটা জল দেখে সব কিছু ভুলে যায় অবনী সে দলের লোক নয় কিন্তু আজ সে মলিনার সঙ্গে তর্ক করতে পারলে না; যতবড় দরকারই থাক্, অন্যায়কে মেনে নেবার অধিকার যে মানুষের নেই এ কথা বোঝাতে সে চেষ্টাও করলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "বেশ আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি, আমার গোটাকতক কথার জবাব দিন। ঐ বইখানা আপনি কোথায় পেলেন?"

"সে কথা জেনে আপনার কি হবে?"

"নিজের মনের কাছে একটা জবাব দিচ্ছি।"

"আমার জন্যে আপনি আপনার মনের কাছে করবেন জবাবদিহি?"

"আমার কথাটার জবাব দেবেন কি?"

একটু ইতস্ততঃ করে মলিনা বললে, "বইখানা হোষ্টেলের সুপারিন্টেন্‌ডেন্টের ঘরে ছিল।"

"সে কথা আদালতে বলেন নি কেন?"

"তিনি আমার মা'র চেয়েও বেশী, তাঁকে বিপদে ফেলব?"

"তিনি নিশ্চয় ও রকম বই ঘরে রাখেন না বা পড়েন না?"

"না।"

"না? তাহলে আপনি জানেন কি করে বইখানা ওখানে এল? তাঁকে বাঁচানোয় আপনার স্বার্থ?"

মলিনা একটু হেসে বললে, "আমার স্বার্থ? কি জানি!"

"তবে বলছেন না কেন?"

"আপনি জানতে চান কেন?"

"আপনার সম্বন্ধে একটু স্পষ্ট ধারণা করতে চাই।"

"ঐ নামটা জানলেই তা সম্ভব হবে?"

"হয়তো হবে।"

"বেশ। সে হচ্ছে ব্রজেশ দত্ত।"

"তিনি ইচ্ছে করেই বইখানা ওখানে রেখে গিয়েছিলেন বলে ধরে নিলে কি অন্যায় হবে?" মলিনা কোন জবাব দিলে না দেখে অবনী আবার বললে, "এ সব কথা আদালতে বলেন নি কেন?"

মলিনা বললে, "বলে কি হ'ত? কে আমায় বিশ্বাস করত?"

"বিশ্বাস করাবার ব্যবস্থা করা যেত।"

দেখা করার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল, একজন কর্ম্মচারী এসে সে কথা জানালে। অবনী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমার মনে হয় আপনি ভুল করেছেন। একটু ভাল করে ভেবে দেখুন, ওকালৎনামাখানা রইল..... "

"ভেবে দেখেছি, ওর কোন দরকার নেই। আর একটা কথা, আপনি আর কোনদিন এখানে আসবেন না বলুন।"

"ও রকম কথা আমি দিই না" বলে অবনী চলে গেল। মিষ্টার সেন অবনীকে ফিরে আসতে দেখে জিগেস করলেন, "কি হে দেখা হল?"

"হাঁ।"

"তারপর?"

"কিছু করতে দেবে না।"

"সে কি? কেন?"

"তা বললে না।"

"আশ্চর্য্য মেয়ে তো! এভাবে শাস্তি নেবার মানে?"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না।" অবনী আর বিশেষ কিছু বললে না, মিষ্টার সেনও তাকে ভয়ানক রকম গম্ভীর দেখে চুপ করে গেলেন।

বাড়ী ফিরে অবনী শ্রমিকোন্নয়ন অফিসে ফোন্ করে কমলকে ডাকলে। কমলের সাড়া পেয়ে বললে, "ভেবে দেখলাম আপনার কথাই ঠিক, আমি ব্রজেশ দত্তর বিপক্ষে দাঁড়াতে রাজি আছি, যদি আপনারা আমার সাহায্য করেন তার মুখোস খুলতে।"

কমল ভয়ানক রকম খুশী হয়ে বললে, "আমাদের যতদূর সাধ্য তা করব। তাহলে কমিটির আর ক'জন সভ্যর সঙ্গে আলাপ করতে হবে আপনাকে।"

"বেশ কখন যাব বলুন।"

"না না, এখানে আসবেন না; আমি আপনার বাড়ী যাচ্ছি, সঙ্গে করে তাদের কাছে নিয়ে যাব। আমরা যে আপনাকে সাহায্য করছি তা ব্রজেশবাবুকে এখন জানতে দেওয়া হবে না, তাহলে ভোটের সময় নানা রকম বদমায়সী করবে।"

"তাহলে কখন আসছেন?"

"এখনি।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে কমল এল, অবনীকে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে; সকলেই তাকে সাহায্য করতে রাজী হল, অবশ্য গোপনে। তারা সবাই ব্রজেশ দত্তর ওপর ভয়ানক চটা; মলিনা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

—ষোল—

অলকা-দ্বিজেনের বিয়ে হয়ে গেল। অতি সাধারণ বাঙ্গালীর বাড়ীর বিয়েতে যেটুকু হৈ, চৈ গোলমাল হয় তাও হয় নি, হঠাৎ কেউ এলে বুঝতে

পারত না এটা বিয়ে বাড়ী। না ছিল সানাই এর নামে সুরের অপমান, ব্যস্ততার পরিচয় দিতে গিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে চাৎকার, না ছিল উৎসব উপভোগের নামে মেয়েদের সীমাহীন লজ্জাহীনতা। ব্রাহ্মণ ডেকে, নারায়ণ শিলা সাক্ষী রেখে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে বিয়ে নয়, জনকতক সাক্ষী রেখে, রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে খাতায় নাম লিখে আইনের সাহায্যে পুরুষের সঙ্গে নারীর আদিমতম সম্পর্কটার একটা আধুনিক রূপ দেবার চেষ্টা।

এ বিয়েতে আপত্তি উঠেছিল—বিশেষ করে বাপ-মার দিক থেকে কিন্তু দ্বিজেন সে সব আপত্তি গ্রাহ্য করলে না। শ্রীকান্তবাবু বললেন, "কাজ কি একটা নতুন কিছু করে? আত্মীয়-স্বজন আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে—শুধু, শুধু একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে লাভ কি?" কিন্তু দ্বিজেন নিজের মত বদলাতে রাজি হল না, শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকান্তবাবুকে সম্মতি দিতে হল। আত্মীয়-স্বজনদের প্রশ্নের উত্তরে দ্বিজেনের মা বললেন, "কি করব? খেয়ালী ছেলে, শেষ পর্য্যন্ত হয়তো বিয়েই করবে না। ও যা ভাল বোঝে করুক, শুনছি অনেকেই আজকাল নাকি ওরকম বিয়ে করছে।" তাঁর অন্তর এতে সায় না দিলেও বাইরে থেকে সম্মতি দিতে হল—ছেলে তাঁর খাম খেয়ালী! বাপ-মার কাছে ছেলে মাত্রেই খাম খেয়ালী তা সে যত নিরীহ গতানুগতিক ধরণেরই হোক না কেন।

লক্ষ্মীকান্তর অবস্থাটা হল সবচেয়ে পীড়াদায়ক। এ রকম একটা অসামাজিক উপায়ে তাঁর একমাত্র মেয়ে পর হয়ে যাবে একথা ভাবতেও তাঁর রাগ হচ্ছিল কিন্তু আপত্তি করবার উপায় ছিল না। চিরকাল সকলকে বুঝতে দিয়ে এসেছেন তিনি উদার মতের লোক, কোন বিষয় তাঁর কোন দাসত্ব নেই আজ যদি হঠাৎ প্রকাশ পায় তাঁর বাইরের আচরণের সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ কোন দিনই ছিল না তাহলে লাভের মধ্যে হবে লোকের হাসির খোরাক জোগান—বিশেষ করে যারা অন্তর সায় না দিলেও বাইরে

আধুনিকতা বজায় রাখতে পেরেছে তাদের। অলকা লক্ষ্মীকান্তর অবস্থা খানিকটা বুঝতে পেরেছিল তাই দ্বিজেনকে বললে, "বিয়েটা ওরকম সৃষ্টি-ছাড়া উপায়ে না করে, সাধারণভাবে করলে ক্ষতি কি ?"

দ্বিজেন জবাব দিলে, "ক্ষতি না থাকলেও আপত্তি আছে। যার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে জোর করে দেবতাদের একটা সংযোগ করে দেওয়ার চেয়ে ভণ্ডামি আর কিছু হতে পারে না। সত্যিকে সত্যি বলে মেনে নেবার সাহস মানুষের ছিল না তাই বিয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের একটা বাঁধন সৃষ্টি করেছিল।"

অলকা অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে জিগেস করলে, "বিয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেই, তুমি কি বলছ ? পৃথিবীর কোন জাতের বিয়ে তার ধর্ম্মের একটা অঙ্গ নয় ?"

"হিন্দু ছাড়া কোন জাতই বিয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের গাঁটছড়া বেঁধে দেয় না।"

"ক্রিশ্চানদের বিয়েও তো ধর্ম্ম সাক্ষী রেখে......"

বাধা দিয়ে দ্বিজেন বললে, "হাঁ, আবার সেই ধর্ম্মের একজন লেখকেই বলেন বিয়েটা দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের একটা আইন সঙ্গত উপায়।"

"ওদের কথা ছেড়ে দিলেও আমরা তো দু'জনেই হিন্দু—হিন্দু সমাজের নিয়ম মানতেতো আমরা বাধ্য ?"

"নিয়ম সৃষ্টি হয় দুর্ব্বলের জন্যে, ধরা-বাঁধা পথ ছাড়া যারা চলতে পারে না তাদের জন্যে। আমি জানি আমি ততটা দুর্ব্বল নই আর তুমিও তা নও ; যদি হও তাহলে আমার সঙ্গে চলতে পারবে না, পেছিয়ে পড়বে। বিয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে কেন জান ? যৌবনের নেশা যখন কেটে যায়, একজনের যখন আর একজনকে ভাল লাগেনা তখন সেই অসহায় অবস্থায় তাকে রক্ষে করবার জন্যে বিয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের একটা মনগড়া সম্পর্ক করে নেওয়া হয়েছে।"

এত বড় একটা বক্তৃতার কাছে অলকা তার সব যুক্তি হারিয়ে ফেললে। হিন্দুর বিয়ের পেছনে কি আছে তা সে ভাল করে জানে না, জানবার সুযোগও পায় নি, তাছাড়া দ্বিজেনের কথার স্রোতে তার স্বাধীন মতামত ভেসে গেল। সে জিগেস করলে, "তাহলে এতদিন ধরে যে নিয়মগুলো চলে আসছে তার কোন দাম নেই?"

হাসতে, হাসতে দ্বিজেন বললে, "কে বললে দাম নেই? বললাম তো মানুষ হিসেবে যখন আর ভাল লাগেনা তখন যার ভাল লাগে না সে চায় মুক্তি। পুরুষের তখনও নতুন পথে চলবার উপায় থাকে কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েরই তা থাকে না। পুরুষ যাতে তাকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে না পারে তাই তাকে ধর্ম্মের ভয় দেখান হয়েছে।"

"তুমি বলতে চাও এই রকম একটা ভয় না থাকলে সব পুরুষই স্ত্রীদের ছেড়ে যেত? তাহলে মানুষ আর পশুতে তফাৎ কি?" খুব জোরে হেসে উঠে দ্বিজেন বললে, "তুমি কি ভাব তফাৎ খুব বেশী আছে? যেটুকু তফাৎ আছে বলে আমাদের মনে হয় সে তো আমাদেরই সৃষ্টি। আমরা পশুদের যতটা ছোট মনে করি তারা হয়তো আমাদের তার চেয়ে ছোট মনে করে।" অলকা যেন আজ নতুন করে দ্বিজেনের পরিচয় পাচ্ছিল। এতখানি মুখর সে তাকে কোনদিন দেখে নি। তার কথার নতুনত্ব অলকাকে আঘাত করছিল। দ্বিজেন আবার বললে, "ধর যদি এমন দিন আসে যেদিন তোমার আমার ভাল লাগবে না সেদিন এই ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সমাজ তোমাকে আমার কাছে আটকে রাখতে চেষ্টা করবে।"

অলকা কথায় বেশ জোর দিয়ে বললে, "না, সে দিন আসবে না।"

"কিন্তু আমার দিকে তো আসতে পারে? তখন ধর্ম্মের আশ্রয় নিয়ে আমার দয়া ভিক্ষে করতে কি তোমার লজ্জা করবে না?"

"স্বামীর ভালবাসা হারিয়েও তার হাতে পায়ে শিকল হয়ে থাকতে যে কোন মেয়ে ঘৃণা করে।"

"তা সত্ত্বেও শিকল হয়েই থাকতে হয় কারণ বেঁচে থাকবার অন্য উপায় তখন আর থাকে না, অথচ মরতে ও সাহস হয় না ; অবশ্য তোমার খাবার পরবার অভাব কোন দিনই হবে না, কিন্তু হাজার, হাজার মেয়ের বিয়ে করতে হয় ঐজন্যে।"

এর পর অলকা আর কোন কথা বলতে পারলে না কাজেই বিয়েটা রেজিষ্ট্রী করেই হল।

বড় লোকের বাড়ী, নিমন্ত্রিতের অভাব নেই ! কত রকমের লোক কত রকমের উপহার দিয়ে যাচ্ছে। অলকা আর দ্বিজেন পাশাপাশি বসেছিল ; কেউ বলছে "কি চমৎকার মানিয়েছে" কেউ বলছে, "মোটেই মানায় নি"— অনেক কথা অলকা-দ্বিজেনের কানে আসছে, অনেক কথা আসছে ও না। দ্বিজেনের বাবা-মা এলেন, অলকা উঠে এসে তাঁদের প্রণাম করলে। দ্বিজেনের মা শ্রীকান্তকে বললেন, "কেমন মানিয়েছে বলত ? ঠিক যেন হর-গৌরী।" রেজিষ্ট্রী করে বিয়ের বর-কনেকে হর-গৌরী বললে যে বিশ্রী শোনায় দ্বিজেনের মার সে খেয়াল ছিল না। শ্রীকান্ত বললেন, "কেন মানাবে না ? তোমার ছেলে বৌ কেউ কার চেয়ে কম নয়।"

দ্বিজেনের মা বাবার ফেরবার সময় হয়েছিল। অলকাকে বলে তাঁরা উঠতে তাঁদের সঙ্গে, সঙ্গে দ্বিজেনও উঠল, সে প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিল—ও রকম করে বসে থাকা তার পোষায় না। অলকা জিগেস করলে, "কৈ তোমার বন্ধু বলে তো কা'র পরিচয় দিলে না ? নিমন্ত্রণ কর নি নাকি ?"

"বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাস করি না, আজ যে বন্ধু সেজে পাশে দাঁড়ায় কাল সেই সব চেয়ে বড় শয়তানি করে, অন্ততঃ করবার সুযোগ পায়।"

দ্বিজেনের কথায় অলকার চমক লাগে। এ বলে কি ? যা কিছু মানুষ

বিশ্বাস করে, ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এ তারাই বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাকেই করে অসম্মান। এ অদ্ভুৎ মনস্তত্ত্বের সঙ্গে অলকার কোনদিন পরিচয় ছিল না।

দ্বিজেন ঘর থেকে চলে যেতে অলকার বান্ধবীরা তাকে ঘিরে বসল; একজন জিগেস করলে, "কি রে, কি রকম লাগছে?"

অলকা বললে, "বুঝতে পারছি না।"

একজন বান্ধবী বললে, "খুব পারছিস। এত ভাল লাগছে যে বলতে ইচ্ছে করছে না; ভয় নেই আমরা হিংসে করব না।"

আর একজন বললে, "কিছু মনে করিসনি ভাই, তোর বরটীর মতামত গুলো একটু সৃষ্টি ছাড়া। খুব যে মিশুক তাও মনে হয় না।" যে কথা নিজের মনে হচ্ছে সে কথা আর একজনের কাছে শুনে অলকা ভয় পেয়ে গেল। আর একজন বান্ধবী শেষের কথাগুলোর জের টেনে বললে, "পুরুষ মানুষ, বিশেষ করে স্বামী ছ্যাব্‌লামী করলে মোটেই ভাল লাগে না। যে প্রেমে পড়বে তার খানিকটা বাঁদরাম সহ্য করা যায় কিন্তু যাকে নিয়ে সংসার করতে হবে তার মধ্যে কতকটা গভীরতা চাই বৈ কি।" অকাট্য যুক্তি অন্ততঃ যারা প্রেম করেছে একজনের সঙ্গে আর বিয়ে করেছে অন্য লোককে তাদের কাছে।

কে একজন বললে, "তোর উপাসকদের মধ্যে তো প্রায় সকলকেই দেখলাম অলকা, অবনী বাবুকে তো দেখলাম না! নিমন্ত্রণ করেছিলি তো?" অলকা রঞ্জনকে পর্যান্ত নিমন্ত্রণ করেছিল কিন্তু অবনীকে করতে পারে নি। বান্ধবীদের সে কথা জানাতে একজন বললে, "হতাশ প্রেমিকের উপহার সাধারণতঃ ভাল হয় রে।" তিনি অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন। অলকা বললে, "তাকেই যখন ছাড়তে পারলাম, তার উপহারের ওপর লোভ করে কি হবে?" কথাগুলো হাসির না হলেও সকলে হেসে উঠল।

দ্বিজেন ঘরে ফিরে এসে বান্ধবীদের বললে, "এবার তাহলে আমাদের ছুটী দিন।"

একজন বান্ধবী বললে, "আর যে দেরী সইছে না ; হিন্দুমতে বিয়ে করলে ফুলশয্যের রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হত

দ্বিজেন বললে, "তাই তো হিন্দু মতে বিয়ে করি নি।"

অলকার বান্ধবীরা ঘর ছেড়ে চলে গেল, দ্বিজেন দরজাটা বন্ধ করে দিলে। অলকা বললে, "দাঁড়াও, এ পোষাকটা বদলে আসি, এ পরে মানুষ শুতে পারে ?"

দ্বিজেন বললে, "পরে শোবার তো দরকার নেই।"

অলকার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। দ্বিজেন তা লক্ষ্য করে বললে, "তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। এক দিন অবনী বিনা অধিকারে যা করেছে আজ আমি অধিকারের জোরে যদি তা করতে চাই তাতে তোমার বিরক্ত হবার কারণ নেই ; অন্যায় কিছু করছি না।"

অলকার মনে হল যে দ্বিজেনকে সে চেনে এ সে নয়। সে বললে, "তুমি চুপ কর, তার নাম করে......"

কথা শেষ করতে না দিয়ে দ্বিজেন বললে, "তার ওপর যদি আজও এত দরদ তাহলে তাকে ছাড়বার এ অভিনয়ের দরকার কি ছিল ?" অলকার মনে পড়ে গেল এই কথাটা ব্যবহার করার জন্যে অবনী একদিন কতখানি বিরক্ত হয়েছিল—আজ তার মনে হল কথাটা সত্যিই অভদ্র কিন্তু প্রতিবাদ করবার তার উপায় নেই তাই বললে, "স্বামী হয়ে স্ত্রীকে এভাবে অপমান করতে পারছ ?"

দ্বিজেন বেশ সহজভাবেই বললে, "স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো এখনও স্থাপন করতে পারি নি ; আগে স্বামীর অধিকার দাও তারপর স্ত্রীর দাবীর কথা ভেবে দেখব, তার আগে নয়।" অলকার কাছে গিয়ে সে তার কাঁধের ওপর

থেকে সাড়ীর আঁচলটা নামিয়ে দিয়ে ব্লাউসের বোতাম খোলবার চেষ্টা করলে। অলকা দূরে সরে গিয়ে বললে, "আমার দেহটার ওপর তোমার এত বেশী লোভ জানলে·· "

চেঁচিয়ে হেসে উঠে দ্বিজেন বললে, "তোমার কি বিশ্বাস তোমার মনের ওপর লোভ করে তোমায় বিয়ে করেছি? ননসেন্স! প্রেম, ভালবাসা ওসব ন্যাকামী আমি সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া যে দেহ একদিন অবনী উপভোগ করেছে " অলকা আর শুনতে পারলে না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিয়ের রাত্রে স্বামীর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করার ফল যে বিবাহিত জীবনে ভাল নাও হতে পারে সে কথা ভাববার ক্ষমতা তার আর ছিল না। যতক্ষণ পেরেছে সে চেষ্টা করেছে কিন্তু দ্বিজেনের অবচেতন মনের নগ্ন বীভৎসতা তাকে সব ভুলিয়ে দিলে তাই সে আর সেখানে থাকতে পারলে না।

দ্বিজেন একবার তাকে ডাকবে ভাবলে কিন্তু না ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উন্মত্ত প্রবৃত্তির রাশ টানবার যেখানে দরকার হয় না, সেখানেই তার রাত কাটল।

ঘরের বাইরে এসে অলকা দেখলে তার বান্ধবীরা চলে গিয়েছে, সে নিজের ঘরে এল। অগোছালো ঘরটায় খাটের এক কোণে বসে সে স্থির হয়ে ভাববার বৃথা চেষ্টা করছিল, হাঁফাতে, হাঁফাতে লক্ষ্মীকান্ত ঘরে এসে জিগেস করলেন, "দ্বিজেন চলে গেল যে?" কান্নায় অলকার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল তবু বললে, "আজ এখানে থাকতে নেই।"

লক্ষ্মীকান্ত তাইতেই সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন; অলকা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেই অবস্থায় শুয়ে পড়ল।

আজ প্রথম অলকা কাঁদলে, প্রায় সমস্ত রাত ধরেই তার চোখের জল শুখল না।

—সতেরো—

ঠিক সাময়িক উত্তেজনার বশে কোন কাজ অবনী কখন করে না: যেখানে উত্তেজিত হওয়াই স্বাভাবিক, এমন কি হয়তো তার প্রয়োজনও আছে, সেখানেও সে বেশ সহজ সঙ্গতির সঙ্গে কাজ করে যায়। তার মধ্যে ঠাণ্ডাভাবটা এত বেশী ছিল যে সে অনেক সময় ইচ্ছে করেও গরম হয়ে উঠতে পারত না। সেই অবনী যখন শ্রমিকদলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল—ঝাঁপ দিয়ে পড়া বলতে হবে বৈ কি—যারা তাকে চিনত তারা সকলেই বেশ একটু কৌতূহল বোধ করলে; একটা কদর্থ করতেও বেশী সময় লাগল না, বিশেষ যখন অলকার সঙ্গে তার বিয়েটা ভেঙ্গে গেল। বন্ধু বান্ধবের সকৌতুক উৎসাহ, মা'র সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কিছুতেই তাকে সে পথ থেকে ফেরাতে পারলে না। অলকাকে হারাণোর দুঃখ ভুলতে সে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে এ কথা বলবারও লোকের অভাব হল না। এই কথাটাই অবনীকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দিলে, তাঁর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করলে। যেদিন সে লক্ষ্মীকান্তর বাড়ী শেষবার যায় সেদিন থেকে সে অলকার কথা না ভাববারই চেষ্টা করেছে, যেদিন শুনলে অলকার সঙ্গে দ্বিজেনের বিয়ে হয়েছে, সেদিন থেকে তাকে আরও হাজার, হাজার বিবাহিতা মেয়ের মধ্যে একজন বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। সে তার মা'কে শুধু মুখের কথাই বলে নি যে, যে কোন একজন মেয়ে, সে যতই কেন অদ্বিতীয়া হোক না, তার জন্তে সে অন্যমনস্ক হয় না; তার মনে হয় কোন মেয়ের জন্তে মনের স্থিরতা হারাণ যে কোন পুরুষের পক্ষে লজ্জার বিষয়। সে নারী-বিদ্বেষী নয়, জীবনের পথে তাদের প্রয়োজন আছে এবং যথেষ্ট প্রয়োজনই আছে এ কথা স্বীকার করে কিন্তু সে জন্তে কোন মেয়ের কাছে নিজেকে ছোট করতে হবে এ কথা সে ভাবতেও পারে না। ঠিক এই অবস্থায় পৌঁছেই সে অলকার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে এসেছে।

শ্রমিকদের কোন উপকার করতে পারবে এ আশায় সে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেয় নি; সে একান্তভাবে বিশ্বাস করে তাদের উপকার সে বা তার মত কেউ করতে পারবে না; তবুও সে তাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, উদ্দেশ্য অবশ্য একটা আছে। সে এ নিয়ে খুব বেশী হৈ, চৈ, মাতামাতি করতে চায় না কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটা অন্ততঃ কতকটা সফল করতে গেলেও তাকে তা করতে হবে। যাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বাখবার কথা সে কোন দিন ভাবতেও পারে নি এখন তারা তার নিত্য সহচর, তার পাশে নিজেদের বেশ একটা স্থান করে নিয়েছে। তার ভয় হয় প্রয়োজন যে দিন শেষ হবে সে দিন হয়তো সহজে এবা তাকে মুক্তি দেবে না, শুখনো পাতার মত ঝরে পড়তে হয়তো রাজি হবে না, সে দিনের বিড়ম্বনার কথা ভাবতেও তার ভয় হয়। ভবিষ্যতের অপ্রিয় সম্ভাবনায় বর্ত্তমানের রূঢ় সত্যকে উপেক্ষা করবার অবসর কাজের লোকের থাকে না, অবনী কাজের লোক, তারও সে অবসর নেই, হয়তো ক্ষমতাও নেই।

কমল যখন প্রথম তাকে কমিটীর অন্য সদস্যদের কাছে নিয়ে যায়, তখনও তার দ্বিধা ছিল, সন্দেহ ছিল। সে ভেবেছিল নিজেকে তৈরী করে নিতে সে হয়তো পারবে না; পারলেও অনেক সময় লাগবে; এত সহজে যে সে নিজেকে তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারবে তা সে ভাবে নি। অবশ্য সে ঠিক নিজেকে নিজে প্রতিষ্ঠিত করে নি, তারা তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল কিংবা প্রতিষ্ঠা নিজে তাকে বরণ করে নিয়েছিল।

কমল যখন তার সঙ্গে সকলের পরিচয় করে দিলে, সকলেই বললে এক-মাত্র সেই তাঁদের ব্রজেশ দত্ত রূপ শানর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। অবনী দার্শনিক নয়, হলে হয়তো ভাবত কেউ প্রতিষ্ঠা খুঁজে বেড়ায় আর কাউকে খুঁজে বেড়ায় প্রতিষ্ঠা কিন্তু সে এ কথা ভাবে নি, ভেবেছিল মলিনার কথা, ভেবেছিল ব্রজেশ দত্তর কথা। যার বিরাট চক্রান্তের মধ্যে এতগুলো লোক

জড়িয়ে পড়েছে অথচ জড়িয়ে পড়েছে জেনেও, তার স্বরূপ জেনেও কিছু করতে পারছে না, তার বিপক্ষতা করার মধ্যে যে অসীম আনন্দ আছে তা থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারলে না। এত উৎসাহ, এত আকর্ষণ সে কোন দিন কোন কাজের জন্যে অনুভব করে নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই সে শ্রমিদের আস্তানায় ঘুরে বেড়ায়, যে সব জায়গায় যেতে হবে ভাবলেও হয়তো একদিন তার ঘৃণা হত আজ সেখানে রাত কাটানো তার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। জীবনে যেন তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন দিন ছিলও না। কমিটীর অন্যান্য সভ্যরা তার উৎসাহ দেখেন, তারিফ করেন, নিজেদের নির্ব্বাচনের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে ওঠেন, সে তাঁদের দিকে তাকাবারও অবকাশ পায় না। স্রোতের মুখের নৌকার মত সে ছুটে চলে, কেবল ভয় হ'য় কোথায় প্রবল একটা ধাক্কা খায়।

যার বিপক্ষে এত আয়োজন, যে অসুরের নিধন-যজ্ঞে অবনী হোতা নির্ব্বাচিত হয়েছিল সেও নিশ্চিন্ত ছিল না। সব কিছুই তার কানে আসছিল আর নিজেকে বাঁচাবার জন্যে যজ্ঞ পণ্ড করতে হলে যা করা দরকার তারও ত্রুটী হচ্ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবনীকে ভয় করবার কোন কারণ সে খুঁজে পায় নি, তবে শত্রুকে বাড়তে দেওয়ার পক্ষপাতী সে কোনদিনই নয় তাই কল-কৌশলও কিছু, কিছু করতে হচ্ছিল তবে অবনী তার জালে কিছুতেই পা দিচ্ছিল না; তাই তাকে ভয়ানক রকম চিন্তিত হ'তে হয়েছিল। তার এক সময়কার অন্ধ অনুচরদের মধ্যে যারা অবনীকে প্রচ্ছন্নভাবে সাহায্য করছিল তাদের ওপর তার বেশ কড়া নজর ছিল; কেবল নির্ব্বাচনটা হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা, তারপর দেবে তাদের কৃতঘ্নতার শাস্তি।

নির্ব্বাচনের আগের দিন একটা সভা আহ্বান করা হয়েছিল। সে সভায় দু'চার জন নামজাদা কংগ্রেসী নেতাও উপস্থিত ছিলেন; তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে নামজাদা যিনি তিনিই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন।

অসম্ভব ভিড় হয়েছিল, এত ভিড় অবনী খুব বেশী দেখে নি। তার মনে হচ্ছিল এই বিরাট জনতা একটা বারুদের স্তূপ ; সামান্য, একটু অসতর্ক হলে আগুন ধরে যাবে আর সে আগুনে আমাদের যা কিছু নিজস্ব, যা কিছু গৌরবের তা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ; তার একটু ভয়ও করছিল।

সভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে অবনীর যোগ্যতার কথা, তার বিপক্ষে মামলার কথা, শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতার কথা বললেন আর তার জন্যে যে অতীতের নেতারাই দায়ী এ কথা বলতেও ভুললেন না। শেষে নির্ব্বাচনে অবনীকে ভোট দিয়ে শ্রমিকের স্বার্থ বজায় রাখতে উপদেশ দিয়ে বসে পড়লেন। জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল ; কোথা থেকে একজন বলে উঠল, "অবনী বাবু মালিক লোককো আদমী হ্যায়।" তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না কিন্তু সেই জায়গাটা ঘিরে ভীষণ গণ্ডগোল সুরু হল, গোলযোগ শেষে দাঙ্গায় পরিণত হল ; জুতো লাঠি, ছাতা, বেপরোয়া চলতে আরম্ভ করল। জনকতক জখম হল ; অবনী সেই ভিড়ের মধ্যে যেতে তার মাথায়ও এক ঘা লাঠি পড়ল ; পুলিশ জনতা বে-আইনী ঘোষণা করলে ; জনকতককে গ্রেপ্তার করতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

অবনীর আঘাত খুব গুরুতর হয় নি ; সামান্য একটু শুশ্রূষা করতে সে সুস্থ হয়ে উঠল। ইন্‌স্‌পেক্‌টার বললেন, "এ সময় আপনি ওর মধ্যে গিয়ে ভাল করেন নি।"

অবনী বললে, "এখন সেটা বুঝতে পারছি। যাক্, আপনারা যে এর ওপর লাঠি চালান নি সেইটাই যথেষ্ট।"

"অনেক সময় সেটা আপনাদের বাঁচাবার জন্যে করতে হয়।"

"সেটা আগে বুঝতাম না" বলে অবনী হাসতে লাগল।

ইন্‌স্‌পেক্‌টারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, অবনী আর অন্য নেতারা এগিয়ে যাচ্ছিলেন ; একজন সংবাদদাতা এসে সভাপতিকে নমস্কার করে

বললে, "আপনার বক্তৃতার একটা কপি যদি দয়া করে দেন স্যার। ঠিক সময়ে আসতে পারি নি, একটা লোক কতদিকে যাই বলুন? মালিকরা তা বুঝতে চান না, তাঁদের চাই-ই। আপনারা তো আর আমাদের দিকে নজর দেবেন না, আমরা যেন শ্রমিক নই।"

সভাপতি বললেন, "নকল তো নেই, এমন বৃহৎ ব্যাপার তো নয় তাই লিখে আনি নি, আমার সঙ্গে গাড়ীতে চলুন যতটা মনে পড়ে বলে দিচ্ছি।"

সংবাদদাতা ধন্যবাদ দিয়ে অবনীকে বললে, "আপনারটাও চাই স্যার।"

অবনী বললে, "আমি কোন বক্তৃতা দিই নি আর দিলেও কাগজে বার হওয়াটা পছন্দ করি না, বিশেষ আপনারা যেভাবে রং ফলান সেভাবে তো নয়ই।"

অবনী, কয়েকজন নেতা আর সংবাদদাতা এক গাড়ীতে উঠলেন। সংবাদদাতা যেন আকাশ থেকে পড়ল, বললে, "রং ফলাই? বলেন কি মশায়? আমাদের সময় কোথা? নোট্‌স্ নেবার অবসর নেই তা রং ফলাব! আপনারা দয়া করে নকল না দিলে তো চাকরীই বজায় থাকত না।" অবনীর হঠাৎ একটা কথা মনে এল; তার বক্তৃতা বেরুনোর মধ্যে যে রহস্য রয়েছে এ লোকটা হয় তো সেটা ভেদ করবার পক্ষে সাহায্য করতে পারে। সে জিগেস করলে, "আচ্ছা, আমি এখানে প্রথম যে বক্তৃতাটা দি তার কথা কিছু মনে আছে?"

"আছে বৈকি। ঐ একটা বক্তৃতাই তো আপনি এখানে আজ পর্য্যন্ত দিয়েছেন, তাছাড়া তার জন্যে মামলাও হচ্ছে।"

"তার নকল কোথায় পেয়েছিলেন?"

"কেন? ব্রজেশবাবু দিয়েছিলেন।"

"ব্রজেশবাবু যেটা আপনাকে দিয়েছিলেন সেটাই পাঠিয়েছিলেন তো?"

"না, সেটা রেমিংটন্ পোর্ট্‌এব্‌লে টাইপ্ করা, দেখলে মালিকরা বুঝতে

পারবে আমার নিজের নোটস্ নেওয়া নয় তাই আমাদের আণ্ডারউডে টাইপ্ করে পাঠিয়েছিলাম।"

"আসলটা আপনার কাছে আছে ?'

"আছে বৈকি। ওসব লেখা নষ্ট করি না, কবে কি বিপদে পড়ে যাই।" সেদিনকার সভাপতি জিগেস করলেন, "ব্যাপার কি ? ভেতরে কিছু গোলমাল আছে নাকি ?"

অবনী বললে, "বিশেষ রকম। আমি যা বলিনি তাই কাগজে বেরিয়েছে।"

ভদ্রলোক চম্‌কে উঠে বললেন, "বলেন কি ? ব্রজেশ দত্ত এতবড় ভয়ানক লোক ? আজ না হয় আপনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী, সেদিন তো কোন ক্ষতি করেন নি, এ শত্রুতা করবার কারণ ?"

অবনী বললে, "তা তিনিই জানেন। যাক্, আপনারা সব শুনলেন, যদি শেষে এ ভদ্রলোক ভয় পেয়ে অস্বীকার করেন "

সংবাদদাতা বললে, "ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়বে। সে যাই হোক, সত্যি কথা বলব "

সেদিনকার সভাপতি বললেন, "আপনার কিছু হবে না, আপনি ব্রজেশকে বিশ্বাস করেছিলেন এই তো আপনার অপরাধ।"

সংবাদদাতা বললে, "মালিকরা কি তা বুঝবেন ?"

সভাপতি বললেন, "আচ্ছা সে দেখা যাবে, জ্যোতীশ আপনাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্‌টার তো ? আমি তাকে সব কথা বলব এখন। হাঁ, অবনীবাবু আপনি ব্রজেশকে ছাড়বেন না, আপনার কেস্ তো ফেঁসে যাবেই তারপর তার নামে একটা নালিশ করে দেবেন।"

অবনী বললে, "তাই ভাবছি।".

ষ্টেশন এসে গিয়েছিল। সংবাদদাতা বক্তৃতার নকল আর সভার বিবরণ

নিয়ে চলে গেল, অবনী নেতাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরে এল, পরদিন নির্ব্বাচন, তার আর সেদিন কলকাতা ফেরা হল না।

পরদিন নির্ব্বাচন আরম্ভ হল, শেষও হয়ে গেল। অন্য অনেক নির্ব্বাচনের মতই এর ইতিহাস কলঙ্কময়। কত কদাচার, কত হীনতার সাহায্য নেওয়া হতে পারে সে সম্বন্ধে অবনীর কোন ধারণা ছিল না। এতবড় একটা মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তার সমস্ত শিক্ষা প্রতিবাদ করে উঠছিল কিন্তু তা ভাষায় প্রকাশ করবার উপায় ছিল না; সে এক বিরাট জনতার মধ্যে গিয়ে পড়েছে, তার মধ্যে থেকে বেরুবার উপায় নেই, জনতা যেদিকে নিয়ে যাবে ইচ্ছে না থাকলেও তাকে সেদিকে যেতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে একটা প্রহসন বলে মনে হচ্ছিল, সে প্রহসনের মধ্যে যতবড় প্রতারণা, যত হীন আচরণ করা হোক, সেগুলোকেও প্রহসনের অঙ্গ বলেই মেনে নিতে হবে। ক্ষমতার মোহ তার কোনদিনও ছিল না তাই তার বীভৎসরূপ কোনদিন চোখে পড়ে নি। কতকগুলো লোকের ওপর কতক বিষয়ে কিছুদিন আধিপত্য করবার সুযোগের জন্যে মানুষ কি করতে পারে তা দেখে তার সমস্ত মন তিক্ত হয়ে উঠল। নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতার অপ-প্রয়োগ প্রতিরোধ করা অন্ততঃ তার কেতাবী বিদ্যে তাকে এই শিক্ষা দিয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে কতটা ফাঁক আছে আজ তা প্রথম বুঝলে। শ্রমিক নেতাদের ওপর যদি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাও কোনদিন থাকত তাহলে এর পর তা নিঃশেষে মুছে যেত।

নির্ব্বাচনের ব্যস্ততার পরই এল বিরাট অবসর, উদ্বেগ উত্তেজনার পরিণতি অবসাদ। অবনীর মনে হল এ সবের কোন দরকার ছিল না; কোথায় কে একজন আর একজনের ওপর অন্যায় করেছে বলে এতটা চঞ্চল হওয়া তার উচিত হয় নি। প্রতি মুহূর্ত্তে অন্য কত লোকের ওপর কত অন্যায় হয়ে যাচ্ছে তার কোন প্রতিকার করবার চেষ্টাও সে কখন করে না,

এমন কি প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করে না। তার মধ্যে যেটুকু অসঙ্গতি ছিল তা শুধু তার দুর্ব্বলতাকে উজ্জ্বল করে তার চোখের সামনে ধরলে। তাকে নিজের কাছে স্বীকার করতে হল মল্লিনাকে অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে এ সবের কোন প্রয়োজন ছিল না। ব্রজেশ দত্তকে শাস্তি দেবার তার কি অধিকার আছে আর কে তাকে সে অধিকার দিলে এ প্রশ্নের জবাব সে খুঁজে পেলে না।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাতে কাজ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাজের লোক এভাবে কল্পনাতুর হয়ে বসে থাকতে পারে না, কাজ শেষ হলে সে চায় অতীতের দিকে ফিরে দেখতে, নিজের কাজের সমালোচনা করতে। কাজ তো কলেও করে কিন্তু নিজের কাজের সমালোচনা কলে করে না তাই কলের কাজের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায় না, মানুষের কাজের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ভুল, ত্রুটী সংশোধন করবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ মানুষের আছে, সেইটাই তাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে দেয় না, তার মধ্যে কাজের প্রেরণা আনে।

অবনী ভেবেছিল ব্রজেশ দত্তকে কমিটি থেকে সরান হয়ে গেলেই তার কাজ শেষ হয়ে যাবে, কমিটির সদস্যরা নিজেদের হাতে কাজের ভার তুলে নেবেন সে শুধু থাকবে শ্রমিক আর ব্রজেশের মাঝে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করতে কিন্তু তা সে পারলে না। শ্রমিকদের মধ্যে আসবার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও এসে সে যে অন্যায় করেছে তারই প্রতিকার হিসেবে সে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে চাইলে। তাদের যে সব দুঃখ, অভিযোগ সত্যি, তার প্রতিকার করা দরকার; তাদের সে সম্বন্ধে সচেতন করা ছাড়া প্রতিকারের আর কোন উপায় নেই। তার জন্যে প্রথম দরকার তাদের অজ্ঞতা দূর করা, তারা যে মানুষ একথা তাদের মনে করিয়ে দেওয়া, মানুষের মত করে বেঁচে থাকতে শেখান, ক্ষেপিয়ে তোলা নয়। অবনী নিজেকে সেই

কাজে ব্রতী করলে কিন্তু তার জন্যে খুব বেশী উৎসাহী সহযোগী পেলে না। নাইট্ স্কুল, ম্যাজিক্ লণ্ঠন, স্বাস্থ্য প্রদর্শনী এ সবের জন্যে খুব বেশী লোক পাওয়া যায় না সে তা জানত না।

—আঠার—

শেষ রাত্রের দিকে অলকা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেক বেলায় তার ঘুম ভাঙ্গল একটা খুব ভাল স্বপ্ন দেখে, মনটা একটু হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ঘরের অবস্থা দেখে গত রাত্রের কথা তার মনে পড়ল, বিরক্তিতে তার সমস্ত অন্তর ভরে গেল। কাল রাত্রে তার বাবাকে যা হয় একটা কিছু বুঝিয়েছে কিন্তু কতক্ষণ আসল কথাটা চেপে রাখবে? আজ তার প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাবার কথা, না যাওয়ার কি কৈফিয়ৎ সে লক্ষ্মীকান্তকে দেবে? তার বান্ধবীদের, আত্মীয়-স্বজনকে সে কি করে বলবে বিয়ের রাতেই স্বামীর সঙ্গে তার একটা বিশ্রী রকম সংঘর্ষ হয়েছে, সে শ্বশুর বাড়ী যাবে না? কথাগুলো ভাবতেও তার কান্না আসছিল। নিজেকে এত অসহায় বলে তার কোন দিন মনে হয় নি। যতদূর মনে পড়ে পৃথিবীর কাছে সে শুধু পেয়েই এসেছে, কেউ কোন দিন তার বিপক্ষতা করে নি, কোন বিষয় সে বাধা পায় নি।

এ সব কথা ভাবতে, ভাবতে কত বেলা হয়েছিল তা সে জানতেও পারে নি, খেয়াল হল তার বাবার ডাক শুনে। লক্ষ্মীকান্ত তাকে দেখে বললেন, "এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছিস কি রে? আজ তুই শ্বশুর বাড়ী যাবি।"

অলকার ইচ্ছে করছিল তার বাবাকে তখনি সব কথা বলে কিন্তু এতবড় লজ্জার কথা সে তার বাবাকে বলতে পারলে না। লক্ষ্মীকান্ত বললেন,

"তৈরী হয়ে নে, শ্রীকান্তবাবু ফোন্ করেছিলেন, এখনি গাড়ী পাঠাচ্ছেন।" অলকা সেখান থেকে চলে গেল কিন্তু তৈরী হয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করলে না। বিয়ের পরদিন মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী যায় স্বামীর পাশে বসে, লোকের প্রশংসাময় দৃষ্টির ওপর দিয়ে, সে যাবে একা, লোকের কৌতূহলের খোরাক জুগিয়ে; এভাবে সে যেতে পারবে না।

দরজায় গাড়ী এসে দাঁড়াল, তার ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ হল, লক্ষ্মীকান্ত তাকে ডাকলেন, অলকা সাড়া দিলে না, জুতোর আওয়াজ তার ঘরের কাছে এসে থেমে গেল; কে তার দরজায় ধাক্কা দিলে, অলকা ঠিক সেইভাবে বসে রইল। দরজাটা আস্তে, আস্তে খুলে গেল, দ্বিজেন এসে ঘরে ঢুকল, অলকা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। দ্বিজেন বললে, "ভেবে দেখলাম কতকগুলো গুজব সৃষ্টি হতে দেওয়ার কোন মানে হয় না, অবশ্য তাতে আমার বিশেষ কোন ক্ষতি নেই তবে বাবা-মা দুঃখ পাবেন। যেতে তোমার যদি আপত্তি থাকে তাহলে ·" অলকা কোন জবাব না দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। দ্বিজেন তার উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারলে না, কি করবে ভাবছিল লক্ষ্মীকান্ত এসে ঘরে ঢুকলেন। অলকাকে না দেখে বললেন, "অলি গেল কোথায়? তার কি এখনও হয় নি? কতক্ষণ হল তাকে তাড়া দিয়ে গেছি। ওর শরীরটা বোধ হয় বিশেষ ভাল নেই, অনেক বেলায় উঠেছে।" দ্বিজেন কিছু বলবার আগে একজন ঝি এসে অলকার কতকগুলো কাপড় জামা ইত্যাদি বার করে নিয়ে গেল। লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "এই সবে কাপড জামা নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তো এখনও অনেক দেরী। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক বারবেলায় ··" তাঁর মনে পড়ে গেল অলকার বিয়েটা পাজি, পুঁথি দেখে হয়নি তাই তিনি চুপ করে গেলেন। দ্বিজেন একটু হাসলে, লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "চল বাবা একটু জল খেয়ে নেবে। কেই বা

আছে দেখা শোনা করে।" দ্বিজেন তাঁর সঙ্গে যেতে, যেতে বললে, "বাড়ী থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি, আর এখন কিছু খাব না।" লাইব্রেরীতে ঢুকে দ্বিজেন একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল, লক্ষ্মীকান্ত নিতান্ত অপরাধীর মত চুপ করে বসে রইলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অলকা একটা অতি সাধারণ কাপড় জামা পরে এসে লক্ষ্মীকান্তকে প্রণাম করলে। লক্ষ্মীকান্তর চোখে জল এল দেখে অলকা বললে, "আমি তোমার পর হয়ে যাব না বাবা।" দ্বিজেন এগিয়ে গেল, তার পেছনে অলকা, সব শেষে লক্ষ্মীকান্ত। বর কনে গাড়ীতে উঠল কিন্তু একটা শাঁখও বাজল না।

অলকা ভেবেছিল শ্বশুর বাড়ীতে দু'চার দিন কোন রকমে কাটিয়ে চলে আসবে কিন্তু তা পারলে না। শ্বশুর, শাশুড়ীর সে হল একমাত্র অবলম্বন, তার একটু সঙ্গ পাবার জন্যে তাঁরা উদ্‌গ্রীব। দ্বিজেন কোনদিন তাঁদের খুব কাছে ঘেঁষেনি, আর কোন সন্তানও তাঁদের নেই তাই তাঁদের স্নেহের বন্যায় অলকা ভেসে যাবার মত হ'ল। পুরুষরা যে স্নেহের আধিক্যকে অত্যাচার বলে মনে করে মেয়েরা তাকে উপভোগ করে, অলকাও তা না করে পারলে না। শ্বশুর, শাশুড়ী যেন সব সময় তাকে আগলে নিয়ে বেড়ান। সারা দিনের মধ্যে সে করবার মত কাজ খুঁজে পায় না, যদি কোন কাজ খুঁজে বার করে, শাশুড়ী এসে বাধা দেন, বলেন, "তুমি কেন করছ মা, লোকজন তো রয়েছে।" অনেকে মনে করে সমস্ত দিনের মধ্যে কোন কাজ না করতে পেলে তারা পাগল হয়ে যাবে কিন্তু সে অবস্থায় পড়লে সত্যিই পাগল হয়ে যায় না, অন্ততঃ অলকা তো গেল না।

মেয়েদের কাছে সাজ পোষাকের নিজস্ব কোন দাম নেই—পুরুষকে আকর্ষণ করা বা আকৃষ্ট পুরুষের আকর্ষণ বজায় রাখা হচ্ছে তাদের সাজ পোষাকের উদ্দেশ্য। অলকার সে আশা ছিল না তাই নিজেকে সুন্দর করে সাজবার কোন প্রয়োজন সে অনুভব করত না কিন্তু ইচ্ছে না

থাকলেও তাকে তা করতে হত—সে বিষয় শ্বশুর, শাশুড়ীর কড়া নজর ছিল, একটুও অবহেলা তাঁরা সহ্য করতেন না। দ্বিজেন-অলকার মধ্যে কোথায় একটু অস্বাভাবিকতা রয়েছে তা দ্বিজেনের মা বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু সেটা ঠিক কি রকমের তা ধরতে পারছিলেন না তাই বোধ হয় পুরুষের মনকে আকৃষ্ট করবার আদিমতম প্রথার সাহায্য নিতে অলকাকে উৎসাহিত করছিলেন।

শ্রীকান্তবাবু এসব লক্ষ্য করবার অবকাশ পান নি, দ্বিজেনের মাও তাঁকে কোন কথা বলেন নি। অলকার আগমনে তাঁর জীবনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। অলকা খুব বেশীক্ষণ তাঁর কাছে, কাছে থাকে; তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যায়, নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, রোজ তাঁর খাবার সময় কাছে বসে থাকে। শ্রীকান্তর এ সমস্ত খুব ভাল লাগে। তাঁর মেয়ে নেই, বাপ আর মেয়ের মধ্যে যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা উপভোগ করবার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। ছেলেব সঙ্গে বাপের সম্পর্কটা ঠিক এ বকমের নয়; ছেলে হয়তো বন্ধুর স্থান অধিকার করতে পারে কিন্তু মেয়ে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী কাছে আসতে। তাব ছোট, ছোট দাবী আর স্নেহের অত্যাচারের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে মন তাতে সাড়া দিতে বাধ্য যতই কেন বিরুদ্ধপন্থী হোক না। শ্রীকান্ত তো স্নেহের জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিলেন। তিনি অলকাকে মাঝে, মাঝে বলতেন, "তোমার বাবার ওপর হিংসে হয় মা, তিনি কতদিন ধরে তোমায় কাছে পেয়েছেন, আমি পেলাম একেবারে জীবনের শেষে কিন্তু আমি উকিল, পুষিয়ে নেব সুদ শুদ্ধ।

শ্বশুর, শাশুড়ীর এতখানি ভালবাসা উপেক্ষা করবাব মত ক্ষমতা অলকার ছিল না তাই সে শ্বশুর বাড়ী ছেড়ে যেতে পারলে না। সেখানে আসবার সময় তার মনে হয়েছিল বেশীদিন থাকা সম্ভব হবে না কিন্তু দিন

বেশ কেটে যায়। দ্বিজেনের সঙ্গে তার দেখা হয় খুব কম, দু'দিকেই আগ্রহের অভাব। সমস্ত দিন সে বাইরে কাটায়, ফেরে অনেক রাতে, বেশ শ্রান্ত হয়েই; অলকার সঙ্গে যদি সে তখন বসে প্রেমালাপ না করে তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না; এ যুক্তির মধ্যে কোথায় ফাঁক আছে অলকা তা জানে; এর শেষ কোথায় ভাবতে চেষ্টা করে দেখেছে কূল-কিনারা পায় না তাই সে চেষ্টা সে ছেড়ে দিয়েছে।

দ্বিজেনের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করে অলকা শ্বশুর-বাড়ী আসে নি এমন কি আসবার সময় এটুকু স্পষ্ট জানতে পারলে হয়তো সে খুশী হয়েই আসত কিন্তু কি করে কোন সময় যে সে দ্বিজেনের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হতে আরম্ভ করলে তা সে নিজেই জানে না। যার জন্যে তার এ বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তার সঙ্গে কোন সংস্রব নেই—এখানে থাকাটা অনেকটা অনধিকার প্রবেশের মত লাগতে আরম্ভ করল। কোন মেয়েই এটা চায় না, ঠাকুমা, দিদিমারা চাইতেন না নাতনীরাও চায় না; তাঁরা হয়তো মুখ ফুটে বলতে পারতেন নয়তো কান্নাকাটি করতে পারতেন, আধুনিক মেয়েরা তা পারে না। দ্বিজেনের বিপক্ষে অলকা ঠিক কোন অভিযোগ খুঁজে পায় না, স্ত্রী যদি স্বামীর পাশে নিজের স্থান করে নিতে না পারে তাহলে তার জন্যে একা স্বামীকে দায়ী করলে চলে না—এ সব কথা অলকা নতুন শিখেছে, আগে কখন এ সব বিষয় ভাববার তার দরকার হয় নি। শ্বশুর বাড়ীতে তার সবই ছিল, ছিলনা কেবল স্বামীর সঙ্গে একটা সহজ সম্বন্ধ। স্বামীর সঙ্গে সমাজের দিক থেকে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল সেটা তার নিজের প্রাপ্য যখন হোক, যেমন করে হোক আদায় করে নিতে পারে, তা সে ভদ্রভাবে চেয়েই নিক্ আর অত্যাচারীর মত জুলুম করেই নিক, তার মধ্যে আসলে কোন তফাৎ নেই। তার স্বামী যদি দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মধ্যেই পড়ে তাতে তার দুঃখ

করবার বিশেষ কিছু নেই—এসব কথা ভাবতে না চাইলেও তাকে ভাবতে হয়। ঠিক এই সময় হয়তো অলকা আর একবার নতুন করে চেষ্টা করে দেখতে রাজি ছিল কিন্তু সে কথা বলবার মত লোক ছিল না; দ্বিজেনকে সেকথা বলার অর্থ হচ্ছে নিজের অন্তরের দৈন্য তাকে জানতে দেওয়া— যে ভালবাসে তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করা যায় কিন্তু যে ভালবাসে না তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করার লজ্জাই প্রকাশ করার হাত থেকে বাঁচায়।

অলকা একদিন তার ঘরে বসে সেতার বাজাচ্ছিল, শ্রীকান্ত নীচের ঘরে কাগজপত্র দেখছিলেন, তাঁর আর কাজ করা হল না, ওপরে উঠে এলেন। শ্বশুরকে আসতে দেখে অলকা সেতার নামিয়ে রাখলে, শ্রীকান্ত বললেন, "কৈ তুমি সেতার জান তা তো বল নি। কতদিন বাজাচ্ছ?"

অলকা বললে, "প্রায় পাঁচ ছ' বছর হবে।"

"তাহলে তো তোমার সেতার বেশ ভালই শেখা হয়েছে।"

'আমার শিখতে বড্ড দেরী হয়।"

"আমি তোমার সেতার শোনবার জন্যে ওপরে এলাম আর তুমি বন্ধ করলে? আর ভাল লাগছে না?"

অলকা সেতারটা তুলে নিয়ে বললে, "বিশেষ কিছু শিখিনি আর যা শিখেছিলাম তাও চর্চ্চার অভাবে ভুলে গিয়েছি। কি বাজাব বলুন।"

"তোমার যা ইচ্ছে, ওসব জিনিষ হুকুম করে হয় না।" অলকা আলাপ সুরু করলে, শ্রীকান্ত আত্ম-বিস্মৃত হয়ে শুনতে লাগলেন, অলকা থামবার অনেকক্ষণ পরেও তাঁর সুরের মোহ কাটে নি, আরোহণ, অবরোহণ, মিড, গমক তাঁর মাথার মধ্যে ভিড় করেছিল। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "চমৎকার হাত তো মা তোমার, এ চর্চ্চা ছেড না, এর চেয়ে বড় বন্ধু আর হতে পারে না।"

অলকার মনে হল এ শুধু অজ্ঞ শ্রোতার কথা নয়, অভিজ্ঞ সমঝদারের উপদেশ ; সে সেতারটা শ্রীকান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁকে বাজাতে অনুরোধ করলে। তিনি অনেক আপত্তি করলেন কিন্তু অলকা ছাড়লে না ; শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে বাজাতে হল। অলকা বুঝল তাদের স্নেহের সম্বন্ধ দৃঢ়তর করবার এটা হল আর এক সূত্র।

অলকার মনটা অনেকটা হাল্‌কা হয়ে গিয়েছিল, বর্ত্তমানের অপ্রিয় অবস্থার কথা প্রায় সে ভুলে গিয়েছিল, মনে পড়ল শোবার ঘরে গিয়ে। তার আর দ্বিজেনের পাশাপাশি শোবার ঘর, মাঝে একটা দরজা। এ ব্যবস্থার কথা জানতে পেরে দ্বিজেনের মা খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলেন, আপত্তিও করেছিলেন ; অলকার ভয় হয়েছিল হয়তো সব কথা প্রকাশ হয়ে যাবে কিন্তু দ্বিজেন তা হতে দেয় নি ; সে তার মাকে বলেছিল, "বিলেতে প্রত্যেক ভদ্র-লোকের বাড়ীতে স্বামী আর স্ত্রীর ঘর আলাদা।" তার মা একথা শোনবার পর আর কিছু বলেন নি বটে তবে বিলেতের ওপর মর্ম্মান্তিক রকম চটে গিয়েছিলেন। দু'ঘরের মাঝের দরজাটা যে মোটেই খোলা হয় না তা তিনি জানতেন না।

শোবার ঘরে এসে অলকা পোষাক বদলাচ্ছিল, মাঝের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল ; অলকা একটু চম্‌কে উঠেই পেছন দিকে চাইলে, দ্বিজেনকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হলেও বিরক্ত হয় নি। দ্বিজেন জিগেস করলে, "অসময়ে এসেছি কি ?" অলকা জবাব দিলে না। দ্বিজেন বললে, "আইনের সাহায্য নিয়ে বিয়ে করেছিলাম বলে অনেকেই বিরক্ত হয়েছিল, এমন কি তুমিও। এখন বুঝছ তো কাজটা ভালই করেছিলাম—ইচ্ছে করলেই মুক্তি পেতে পার।"

অপ্রিয়তা সৃষ্টি করবার ইচ্ছে না থাকলেও অলকাকে বলতে হল, "তোমার অসীম অনুগ্রহ।"

"উপস্থিত তোমার সে রকম কোন অভিপ্রায় নেই দেখছি; যতদিন পর্য্যন্ত আমার নামটা ব্যবহার করবে ততদিন আমিই বা স্বামিত্বের অধিকার গুলো ছাড়ি কেন? দুনিয়ার সব সম্পর্কই দেওয়া নেওয়ার।"

দ্বিজেন ঠিক এভাবে কথা না বললে অলকার পক্ষে নতুন করে আরম্ভ করবার চেষ্টা করা হয়তো অসম্ভব হত না কিন্তু তার আন্তরিকতাহীন ব্যবসাদারীতে সে জ্বলে উঠল; বললে, "আমার দুর্ব্বলতা জান বলেই এতটা জুলুম করতে সাহস করছ। বিয়ের ক'দিনের মধ্যে স্বামীকে ছেড়ে গেলে যদি লোকের বিদ্রূপ সহ্য করতে না হ'ত তাহলে একদিনও এখানে থাকতে পারতাম না।" দ্বিজেন একটুও বিচলিত না হয়ে বললে, "পুরুষরা চিরকাল মেয়েদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নেয়, এটা তাদের জন্মগত অধিকার, যেমন পুরুষের দয়ার ওপর জুলুম করা মেয়েদের স্বভাব। যাক্, ক'দিনের মধ্যে আমরা আসাম যাচ্ছি।" এ রকম কোন একটা প্রস্তাব অলকা মোটেই আশা করে নি তাই জিগেস করলে, "আসাম? কেন?"

দ্বিজেন মনে করলে অলকা কৈফিয়ৎ চাইছে তাই বললে, "যেতে হবে এইটাই কি যথেষ্ট নয়?"

এ কথার মধ্যে যে প্রভুত্বের দাবী ছিল অলকার শিক্ষিত অন্তর তাতে অপমান বোধ করলে; সে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, "না, যথেষ্ট নয়।"

তার দৃঢ়তা দেখে দ্বিজেন আসল কথাটা চেপে বললে, "বেশ, তাহলে বলছি আমার ইচ্ছে হয়েছে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবার তাই যেতে হবে।" অফিসের বড় সাহেব যে তাকে হনিমুন্ করবার জন্যে গিয়ে তাঁদের চা বাগানগুলো একটু দেখাশুনো করে আসতে বলেছিলেন সে কথা আর বলা হল না। অলকা বললে, "তোমার ইচ্ছেটাই সব নয়, আমার ইচ্ছে, অনিচ্ছে বলেও কিছু থাকতে পারে।"

"থাকতে পারে নয়, পারত। তোমার জানা উচিত ছিল বিয়ের পর মেয়েদের নিজস্ব মতামত বলে কিছু থাকতে পারে না।"

"তোমারও জানা উচিত ছিল যাকে বিয়ে করেছ সে পাড়াগাঁয়ের কচি খুকি নয় যে স্বামী নামধারী জীবটীর সমস্ত হুকুম নির্ব্বিচারে মেনে নেবে। আমার নিজের একটা বিচার-বুদ্ধি আছে, মতামত আছে, সুখ, সুবিধে আছে। তুমি বললেই তো আর সে সব এক নিঃশ্বাসে উবে যায় না।"

"এ নিয়ে তর্ক করার মত সময় বা ধৈর্য্য আমার নেই। আমার ইচ্ছে মত কাজ করতে তুমি বাধ্য।"

"বাধ্য? অর্থাৎ না গেলে তুমি আমায় জোর করে নিয়ে যেতে পার?"

"পারি তবে অতদুর যেতে হবে না; সে দরকার হত পাড়াগাঁয়ের খুকি মেয়েদের জন্যে। তারা লেখাপড়া শেখে না, তাদের একটা নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে না তাই মান-অপমানেরও ভয় করে না; তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছ, সমাজে তোমাদের একটা সম্ভ্রম আছে, তোমরা কি লোক জানিয়ে স্বামীর অবাধ্য হতে পার?"

"আমি যেতে পারব না" দ্বিজেনের বিদ্রূপে জ্বলে উঠে অলকা বললে। দ্বিজেন হাসতে, হাসতে বললে, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদং একম্ ন গচ্ছামি?"

অলকা বেশ চেঁচিয়ে বললে, "তুমি চুপ্ করবে কি না?"

সেলাম করার অভিনয় করে দ্বিজেন বললে, "যো হুকুম! তবে আমার সঙ্গে আসাম যেতেই হবে, অবশ্য যদি তার আগেই ডাইভোর্স করবার জন্যে দরখাস্ত না কর। বৃন্দাবনের কেষ্ট আয়ান ঘোষের ঘর-করা বৌকে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল কিন্তু কলির কেষ্ট কি দ্বিজেন মজুমদারের ডাইভোর্স-করা বৌকে নিয়ে ঘরে তুলবে?" অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; হাসতে, হাসতে দ্বিজেন নিজের ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে অলকা ফিরে এল কিন্তু শুতে গেল না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করে বসে রইল। বিয়ের রাতে যে দ্বন্দ্ব তার মনে সুরু হয়েছিল, এ ক'দিন শ্বশুর, শাশুড়ীর আন্তরিকতায় তা অনেকটা কমে গিয়েছিল ; এমন কি একদিন হয়তো তার শেষ হবে এ আশাও যে সে করে নি তা নয়। দ্বিজেন নিষ্ঠুরভাবে তাকে জানিয়ে দিলে সে আশা তার নেই।

—উনিশ—

নির্ব্বাচন হয়ে যাবার পর ক'লকাতায় ফিরে অবনী মিষ্টার সেনের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, "তোমার অসামান্য সাফল্যে আমি অভিনন্দন জানাতে পারছি না কারণ ও জায়গায় তোমায় দেখবার কথা কোনদিনও মনে হয় নি।" অবনী তার শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কারণ বা উদ্দেশ্যের কথা তাকে জানালে না, তার মনে হল তিনিও হয়তো বিশ্বাস করবেন না। ব্রজেশের সম্বন্ধে মালতীর কাছে যা শুনেছিল সে কথা আর তার বক্তৃতার নকলের সম্বন্ধে সংবাদদাতার কাছে যা শুনেছিল সে কথা জানাতে মিষ্টার সেন বললেন, "সারা জীবন ফৌজদারী মামলা করে অনেক রকম শয়তান দেখেছি কিন্তু এটী তাদের অনেককে শেখাতে পারে বলে মনে হয়। তোমার মকর্দ্দমার সময় যদি সরকারীপক্ষ থেকে ঐ সংবাদদাতাটীকে সাক্ষী মানে তাহলে তো সব কথাই বেরুবে।"

অবনী বললে, "একটা কথা হচ্ছে কি উনি যদি বিপদে পড়েন তাহলে আরও অনেককে দলে টানবার চেষ্টা করবেন, তার মধ্যে অনেক নির্দোষও হয়তো থাকবে।"

মিষ্টার সেন হাসতে, হাসতে বললেন, "ভাবনাটা কি যে কোন একজন নির্দ্দোষের জন্তে না বিশেষ কোন একজনের জন্তে? আমাদের দেশের বর্ত্তমান আন্দোলনগুলোর দোষ কি জান? ঐ মহিলা-কর্ম্মী! ছেলেরা বলে মেয়েরা উৎসাহ দেয়, কাজে প্রেরণা আনে: তারা না থাকলে না কি কাজ করা যায় না; আমার মনে হয় আসল কাজ হয় না তারা কাছে থাকলেই। যতই বল, স্ত্রী-পুরুষের যেটা চিরন্তন সম্পর্ক সেটা বেশী দিন ঠেলে সরিয়ে রাখা যায় না অবশ্য যদি দু'দিকেই দৈহিক এবং মানসিক স্থবিবস্থ এসে গিয়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা কিন্তু কর্ম্মী মহলে প্রায়ই তা আসে না।"

একটু বিরক্ত হয়েই অবনী বললে, "কোন আন্দোলনের সঙ্গে আপনার ভাল করে পরিচয় নেই বলেই এ কথা বললেন। আপনার মতে তাহলে কর্ম্মী মাত্রেই চরিত্রহীন। তাদের ত্যাগ, তাদের নির্য্যাতন . "

বাধা দিয়ে মিষ্টার সেন বললেন, "এটা কি ব্যারিষ্টারের মত কথা হল? আমি অমন কথা ভাবতেও পারি না—তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা জাতির গৌরব, দেশের সুসন্তান কিন্তু সকলেই তো আর স্বভাবের নিয়মের ওপরে যেতে পারে নি। এতেও হয়তো আপত্তি করবার কোন কারণ থাকত না যদি না সমস্ত দুঃখটাই মেয়েদের সহ্য করতে হ'ত।" মিষ্টার সেনের কথার প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা অবনীর ছিল না বিশেষ মলিনার কথা জানবার পর; সে চুপ করে রইল। মিষ্টার সেন কিছুক্ষণ পরে জিগেস করলেন, "হাঁ, মলিনা জেল থেকে বেরুবে কবে? তাকে বিশেষ দরকার হবে তোমার মকর্দ্দমায়।"

"তাকে এর মধ্যে না টানলেই বোধ হয় ভাল হয়।"

"তা কি করে হয়? সে ভেতরকার অনেক কথা জানে।"

"তা জানতে পারে কিন্তু ঠিক এই ব্যাপারটার কিছু জানে বলে মনে

হয় না, জানলে হয়তো বলত। ব্রজেশ দত্তর ওপর কোন কারণে সে ভয়ানক চটেছে।"

"কিছু মনে কোর না অবনী, তুমি যেটাকে রাগ বলে মনে করছ আমি তার জাত ঠিক করতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাও ব্রজেশের সঙ্গে তার সম্পর্কটা বেশ নির্দ্দোষ ছিল ?"

"না হবে কেন ? ব্রজেশের বয়েস হয়েছে, সম্ভবতঃ স্ত্রী-পুত্র আছে ."

"তুমি কি আমায় পরীক্ষা করছ ? অবশ্য প্রমাণ আমি দিতে পারব না তবে আমার ঐ রকম মনে হয়।"

"তাহলে মলিনার জেল হবে কেন ?"

মিষ্টার সেন আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলেন, "মলিনার জেল হওয়ার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?" অবনীর খেয়াল হ'ল সে যা বলতে চায় নি তার অনেকটা বলে ফেলেছে; এক্ষেত্রে সবটা বলাই ভাল মনে করে সে মলিনার জেল হওয়ার ইতিহাস তাঁকে জানালে। মিষ্টার সেন সব শুনে বললেন, "পায়ের ধুলো নেওয়া উচিত হে। এ হেন ব্রজেশ দত্তকে হারিয়ে তুমি নির্ব্বাচিত হয়েছ ? সাবধান, সাবধান।"

"হাঁ, সে চুপ করে থাকবে না।"

"না থাকাই সম্ভব। তোমার সঙ্গে শত্রুতা করার একটা সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু মলিনার ওপর চটবার কারণ কি ? উকিল হিসেবে জিগেস করছি তোমার প্রতি মলিনার কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাবার দরকার হয়েছিল কি ?"

"মনে হয় না।"

"আমার মনে হয় ব্রজেশ অন্ততঃ ঐ রকম কিছু সন্দেহ করেছে তাই তাকে দূরে সরাতে চেয়েছে যাতে তোমার ওপর তার মোহ কেটে যায়। আমি বলছি না তোমার দিক থেকে কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছে;

আর পেলেই বা ক্ষতি কি ? তোমার পথ তো একেবারে পরিষ্কার। যা কর ক্ষতি নেই, কেবল জীবন নিয়ে ছেলেখেলা কোর না, বয়েসে বড় তাই বলছি।"

"সে রকম কোন ইচ্ছে উপস্থিত নেই।"

"ভাল, মলিনার সঙ্গে তো একবার দেখা করতে হচ্ছে" বলে তিনি তাঁর সেই বন্ধুটাকে ফোন্ করলেন। দু'জনের খাবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলতে অবনী বললে, "আমি যেতে পারব না।"

মিষ্টার সেন আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলেন, "কেন ?"

"আমার কাজ আছে।"

"তাহলে না হয় পরেই যাব।"

"না তার দরকার কি ? আপনি একাই যান।"

মিষ্টার সেন ঠিক কারণটা বুঝতে না পেরে বললেন, "কিছু বলবার আছে না কি ?" বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বলেন নি কিন্তু অবনীর মনে হল মিষ্টার সেন তাকে ঠাট্টা করবার জন্যেই বললেন তাই সে বললে, "যদি থাকেই তাহলে কি আপনাকে দিয়ে তা বলে পাঠান ঠিক হবে ?"

মিষ্টার সেনের মনে হল অবনী ঠাট্টা বলে ধরেছে তাই বললেন, "এর মধ্যে এত দূর ? না হবে বা কেন ? শ্রীমতী অলকা যখন তোমায় মুক্তি দিয়েছেন ..."

অবনী একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে কি ? নিজেকে মুক্ত করবার পথ আমার সব সময়েই ছিল, পুরুষ মাত্রেরই থাকে।"

"আমার তো ঠিক উল্টো মনে হয়। আমার বিশ্বাস নিজেদের মুক্ত করবার পথ, অন্ততঃ আমাদের দেশে, মেয়েদেরই সব সময় থাকে, অবশ্য চরম ভুল করবার আগে পর্য্যন্ত। তাদের কি চমৎকার কৈফিয়ৎ আছে

বলত? বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দিলেন, আমি কি করব? আমি তো তোমাদের মত স্বাধীন নই। ক'জন মেয়ে এ যুক্তি না দেখায়? নিজের মনের পরিবর্ত্তন স্বীকার করবার মত সাহস ক'জন মেয়ের আছে?"

"আমার কাছে যা বললেন বললেন, আর কার কাছে বলবেন না, বিশেষ কোন মেয়ের কাছে তো নয়ই। তারা তো চিরকাল বলে আসছে আমরাই বাপ-মার দোহাই দি, তারাই শেষ পর্য্যন্ত ঠকে।"

"সবাই ঠকে কিনা জানি না কিন্তু শ্রীমতী অলকা ঠকছেন। দ্বিজেন বাবুকে চিনি না, তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু যাকে চিনি তার সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারি যে যে কোন মেয়ে⋯ "

অবনী হাসতে, হাসতে বললে, "আপনি হয়তো ভুলে যাচ্ছেন মিষ্টার সেন সে লোকটী আমিই।"

"না ভুলি নি তবে তুমি তোমার নিজের দাম ভুলেছ বলে মনে হচ্ছে। গল্প আছে জানত বাঘ ছাগলের সঙ্গে থাকতে, থাকতে নিজেকে ছাগল বলে মনে করত—তোমারও সেই অবস্থা হয়েছে।"

মিষ্টার সেনের সেই বন্ধুটী ফোন্ করে খবর দিলেন মলিনার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা হয়েছে। অবনী উঠে পড়ল পাছে মিষ্টার সেন আবার অনুরোধ করেন। মলিনা জেগে থাকার মধ্যে আর যাবে না এমন কোন কথা অবশ্য সে দিয়ে আসে নি তবে তার কথা শুনে বুঝেছিল গেলে তাকে কষ্ট দেওয়া হবে তাই যেতে চাইলে না।

—কুড়ি—

বিয়ের রাত্রের ঘটনার পরও অলকার আশা ছিল হয়তো শেষ পর্য্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে, হয়তো তার বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হবে না; শ্বশুর,

শাশুড়ীর ব্যবহারে সে ধারণা একটু পুষ্ট হয়ে উঠেছিল ; দ্বিজেন দূরে, দূরে থেকে তাকে ক্রমশঃ বেশ আশান্বিত করে তুলেছিল। অলকা ভেবেছিল সে হয়তো হঠাৎ উত্তেজনার বশে ঐ রকম বিশ্রী ব্যবহার করেছে আর তার জন্যে অনুতপ্ত তাই দ্বিজেনের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবটা তার কেটে আসছিল, ঠিক সেই সময় সে আবার আঘাত করলে এবং এত কদর্য্যভাবে যে অলকার সমস্ত মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। তার মনে হল আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকা চলে না ; এদের স্নেহ-ভালবাসা নেবার তার যখন অধিকার নেই, সেটা নেওয়ার কোন কৈফিয়ৎ থাকতে পারে না ; এ ক'দিন যে সে এ বাড়ীতে আছে, এ বাড়ীর অন্ন গ্রহণ করেছে, জিনিষ-পত্র ব্যবহার করেছে তা ভাবতে তার নিজেকে অশুচি বলে মনে হতে লাগল। নিজেকে আলোচ্য বস্তু করে তোলা আর লোকের সহানুভূতি সহ্য করা সে সবচেয়ে ঘৃণা করে তাই সে রাত্রে আর সে যেতে পারলে না, কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে বাধ্য হল।

সকাল হতে সে বাপের বাড়ী যাবার কথা বললে। শ্রীকান্ত বললেন, "কেন, ভাল লাগছে না এখানে ? তোমার বাবা তো রোজ আসছেন।"

দ্বিজেনের মা বললেন, "বেশ তো তুমিও রোজ যেও না। তোমারও যেমন একে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না, ওর বাবারও তো তেমনি ওকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, ওরও হচ্ছে।"

শ্রীকান্ত হাসতে, হাসতে বললেন, "কষ্ট যেন আমার একারই হচ্ছে আর হবে। বেশ তো, আমি একাই রোজ যাব, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে চেও না।"

দ্বিজেনের মা বললেন, "ওঃ, ওঁর সঙ্গে না গেলে আর যেন আমার যাবার উপায় নেই। বেশ তো তুমি সন্ধ্যে বেলা যেও, আমি দুপুরে যাব।"

অন্য সময় এ সব অলকার বেশ লাগে, এ দু'টী স্নেহাতুর চিত্তকে খুশী

রাখতে ইচ্ছে করে কিন্তু এখন তার মনে হল এভাবে এদের স্নেহ-ভালবাসা উপভোগ করা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়; নিজের ওপর তার রাগ হল কিন্তু কিছুতেই আসল কারণ তাঁদের বলতে পারলে না। শুধু যে বলতে লজ্জা করছিল তা নয়, এঁদের অতবড় আঘাত দিতে তার কোথায় বাঁধছিল। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হল আদালত যাবার সময় শ্রীকান্ত নিজে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। অলকা ঠিক করলে এখান থেকে চলে গিয়ে সে সব কথা এঁদের জানাবে—যতটা না জানালে নয় ততটাই। কাছে থেকে যা বলতে বাধে দূরে গেলে তা সহজ হয়ে যায়, বোধ হয় তার ফল কি হয় তা দেখতে হয় না বলে।

অলকাকে দেখে লক্ষ্মীকান্ত আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলেন, "কি রে? না খবর দিয়ে একেবারে চলে এলি যে?"

অলকা বললে, "এখানে আসব তার আবার খবর দেব কি?"

শ্রীকান্ত বললেন, "মায়ের আমার মন কেমন করছিল। চৌধুরী মশায় মাকে আপনার কেড়ে নেব ভেবেছিলাম কিন্তু পারছি না। আশা করেছিলাম সব সময় চোখের সামনে থেকে আপনাকে পর করে দেব কিন্তু ওকালতি বুদ্ধি খাটল না।"

লক্ষ্মীকান্ত হেসে উঠে বললেন, "তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে না, মা যেদিন সত্যি মা হবে সেদিন আপনি, আমি কেউ কাছে ঘেঁষতে পারব না।" শ্রীকান্ত সে হাসিতে যোগ দিলেন কিন্তু অলকার কান্না এল, এতবড় বিদ্রূপ তাকে বোধ হয় কেউ কোনদিন করে নি।

শ্রীকান্ত চলে যেতে লক্ষ্মীকান্ত জিগেস করলেন, "কি রে, শ্বশুর, শাশুড়ী কেমন?"

"ভালই" বলে অলকা চুপ করে রইল। লক্ষ্মীকান্ত মনে করলেন

বেশী কথা বলতে তার লজ্জা করছে তাই জিগেস করলেন, "তবে এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে ?"

"কেন বাবা, তোমার কি ভাল লাগছে না ?"

"সে কি কথা ? তোর আসা আমার ভাল লাগছে না ? এ ক'দিন যে আমার কি করে কেটেছে তা তোকে কি করে বোঝাব ?"

"তোমার কাছেই আমায় থাকতে দাও না বাবা।"

"তা হয় না মা। পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে এই, বিয়ের পর আর বাপ-মা কেউ নয়। কষ্ট আমার হবে, সব বাপ-মারই হয় কিন্তু সহ্যও করতে হয়, আমাকেও হবে।"

অলকার ইচ্ছে ছিল সব কথা তাঁকে বলে কিন্তু যে জন্যে শ্বশুর, শাশুড়ীকে বলতে পারে নি ঠিক সেই জন্যে তাঁকেও বলতে পারলে না কিন্তু বলতে যে তাকে হবেই। আজ, না হয় কাল, না হয় ছ'দিন বাদে সব কথা প্রকাশ হবেই আর দুঃখ তাঁরা পাবেনই। তাঁদের কার দুঃখই তার চেয়ে বড় নয় কিন্তু সে কিছুতেই তখন বলতে পারলে না।

সে ভেবে দেখতে চেষ্টা করলে কোন অন্যায় করেছে কিনা কিন্তু কিছু মনে পড়ল না ; তবু তাকে দুঃখ সহ্য করতে হবে, হয়তো সারা জীবনই সে কষ্ট পাবে। স্বামীর কাছে ধরা দেবার জন্যে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিল, হয়তো এখনও তা পারে কিন্তু স্বামী যদি তাকে সহজভাবে না নেয়, অকারণে তাকে অপমান করে তাহলে সে কি করতে পারে ? এ প্রশ্নের জবাব কোন দিন কোন মেয়ে খুঁজে পায় নি, অলকাও পেলে না। দ্বিজেন হয়তো তাকে মুক্তি দিতে পারে কিন্তু সে মুক্তি চায় না, নেবার সাহসও তার নেই। স্বামীর কাছে মুক্তি পাওয়ার চেয়ে চরম দুর্ভাগ্য মেয়েদের আর কিছু থাকতে পারে না এ কথা অন্যের কাছে অস্বীকার করলেও নিজের কাছে কোন মেয়েই অস্বীকার করতে পারে না। যে দেশের

মেয়েরা নতুন করে বন্ধন সৃষ্টি করতে পাবে তারা হয়তো সময় সময় মুক্তি চায় কিন্তু যারা তা পারে না তারা মুক্তি চায় না তাই এদেশের মেয়েরা স্বামীর অনেক দুর্ব্যবহার সহ্য করেও চুপ করে থাকে. কি করে থাকে তা অন্য দেশের মেয়েরা বোঝে না তাই এদের দুঃখে তাদের চোখে জল আসে।

তটিনী অলকার সঙ্গে দেখা করতে এল। অলকা তার কোন বান্ধবীকে জানায় নি যে সে এসেছে, তাই তটিনীর আসায় একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে, "আমি যে এখানে তা জানলি কি করে ?"

তটিনী বললে, "তোর বিয়ের সময় এখানে ছিলাম না বলে আসা'ও পাবি নি তাই তোর শ্বশুর বাড়ীতে ফোন্ করেছিলাম।"

"কবে ফিরলি ?"

"কাল। ফিরতে কি ইচ্ছে করে ? সত্যি, বেঁচে থাকার মধ্যে যে এত আনন্দ তা আগে জানতাম না। ইসাডোরা ডান্‌কানের মত বলতে ইচ্ছে করে, "এর কাছে নাম তুচ্ছ, অর্থ তুচ্ছ, লোকের হাততালির কোন দাম নেই।" তোর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই অলি।"

অলকা বুঝতে না পেরে জিগেস করলে, "আমার কাছে ?"

"তুই যদি ওকে ফিরিয়ে না দিতিস তাহলে তো আমি ওকে পেতাম না। ওর কাছে আমি কত তুচ্ছ, কত ছোট। ও শুধু দয়া করে আমায় কাছে টেনে নিয়েছে।"

অলকার বিশ্বাস হচ্ছিল না। যে তটিনীকে সে জানত এ যেন সে নয়। তটিনীর ছিল রূপের গর্ব্ব, বুদ্ধির অহঙ্কার ; সে বলত তার উপযুক্ত ছেলে খুঁজে পাচ্ছে না বলে সে বিয়ে করছে না, সেই তটিনী এ সব বললে কি করে বিশ্বাস করা যায় ? সে জিগেস করলে, "তোর নিজের দাম কি তার চেয়ে কম ?"

তটিনী জবাব দিলে, "একদিন তাই ভাবতাম কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙে গেছে অলি। যে মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক বাদ দিতে জীবন কাটাতে পারে, নিজের কাছে তার হয়তো কোন দাম আছে কিন্তু যে স্বাভাবিক ভাবে জীবন কাটাতে চায় তার নিজের দাম কষে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। একদিন আমিও ভাবতাম পুরুষকে বাদ দিয়ে জীবন কাটাতে পারব, সেদিন নিজের দামও অনেক মনে করতাম, কিন্তু তারপর একদিন বুঝলাম তা পারব না; জীবনে পুরুষের হল প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে নিজের দাম গেল কমে। তারপর তোর কি রকম লাগছে বল।"

নির্লিপ্তভাবে অলকা বললে, "কাটছে এক রকম।"

নিজের সুখের পরিপূর্ণতার মধ্যে অন্যের দুঃখ লক্ষ্য করবার অবসর কার থাকে না, তটিনীরও ছিল না। সে বললে, "অত সংক্ষেপে কেন? নিজের সৌভাগ্যের অংশ কাউকে দিতে চাস না? আমি কিন্তু তাই একা উপভোগ করে শেষ করতে পারছি না; ইচ্ছে করছে পৃথিবীশুদ্ধ লোককে ডেকে তার ভাগ দি।"

তটিনীর এতখানি তৃপ্তি অলকাকে খুশী করতে পারলে না; নিজের সঙ্গে তুলনা করে হয়তো একটু খারাপও তাব লাগল তাই বললে, "তোর মত ভাগ্য তো সবাইকার নয়।"

তটিনী রীতিমত রকম চমকে উঠে বললে, "তুই যে নতুন কথা শোনালি অলি। এতদিন আমরা বলে এসেছি তোর মত ভাগ্য নিয়ে খুব কম মেয়েই জন্মায়।"

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা তটিনীকে জানাতে তার বাধল; হয়তো সামান্য একটু সে বুঝতে পেরেছে মনে হতেই তার আত্ম-সম্মান মাথা তুলে দাঁড়াল; সে বললে, "তাই তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি।" একটু থেমে আবার বললে, "সত্যি এতটা সৌভাগ্য একটা জীবনে প্রায় দেখা যায় না। এ পৃথিবীর

আলো দেখার পর থেকে মা মারা যাওয়া ছাড়া আর কোন দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়ে না, আর আজ পর্য্যন্ত পুরো মাত্রায় সেই সৌভাগ্য উপভোগ করে যাচ্ছি।" অলকা তার অতীতের আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিল ; কথার সুরে হয়তো কতকটা প্রকাশও করলে। তটিনী আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল ; একটু আগে যে অলকা কথা বলছিল এ যেন সে নয়, অবশ্য সে এই অলকাকেই বেশী চেনে কিন্তু এ পরিবর্ত্তনের অর্থ কি ? এর মধ্যে একটা সত্যি আর একটা অভিনয়, কিন্তু কোনটা সত্যি আর কোনটা অভিনয় তা সে বুঝতে পারলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তটিনী বললে, "একটা কথা ক'দিন ধরে ভাবছি—কিছু যদি মনে না করিস তো জিগেস করি।"

অলকা হাসবার চেষ্টা করে বললে, "অত দ্বিধা কেন ? জিগেস কর।'

"তুই অবনী বাবুকে কি কোনদিন ভালবাসিস নি ?"

আর যে প্রশ্নই আশা করে থাক, অলকা ঠিক এটা আশা করেনি তাই সাহস করে জিগেস করেছিল। তার এতক্ষণ ধরে আত্ম-গোপন করবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল ; বেশ একটু চেঁচিয়ে বললে, "না, না, না। সে কথা বুঝতে আমার এত সময় কি করে লাগল তাই বুঝতে পারছি না। তাকে বুঝতে পারিনি বলেই আজ আমার এই বিড়ম্বনা, সুখের সমস্ত উপকরণ থাকতেও আমি সুখী হতে পারছি না। তাকে সামনে পেলে জিগেস করতাম কেন সে আমার সঙ্গে এ শত্রুতা করলে, আমি তার কি ক্ষতি করেছিলাম ?"

এতক্ষণে তটিনীর কাছে সমস্ত জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল—অলকা তাহলে বিয়েতে সুখী হতে পারে নি। তবে সে দ্বিজেনকে বিয়ে করলে কেন ? এ কথা সে অলকাকে জিগেস করতে পারলে না ; অলকার মানসিক অবস্থা যা তাতে তাকে এ প্রশ্ন করা চলে না, সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি

তটিনীর ছিল। একটু চুপ করে থেকে সে বললে, "বন্ধু হিসেবে যদি দু'একটা কথা বলি কিছু মনে করবি না তো? আমার মনে হয় তুই অবনীবাবুকে এখনও ভাল বাসিস। কোন বিবাহিতা মেয়ের পক্ষে সেটা সম্মানের কথা নয় অলি, আর সে লজ্জা থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অতীতকে মুছে ফেলে স্বামীকে নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া।"

অলকার চোখে জল এল, সে বললে, "অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি, ওকে মেনে নেওয়া যে কত কষ্টকর তা তুই জানিস না—অপমান না করে ও এক মিনিট থাকতে পারে না।"

"কারণ তোর স্বামী মনে করেন তুই এখনও দূরে আছিস; যেদিন বুঝবেন তুই নিঃসন্দেহে তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে পেরেছিস সেদিন থেকে অপমান করতে তাঁর মায়া হবে।"

"ওর সঙ্গে আমার মনের একটুও মিল নেই জেনেও কি করে আত্ম-সমর্পণ করি বল? নিজেকে এত বড় অপমান . ..."

বাধা দিয়ে তটিনী বললে, "তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। বিয়ে যখন করেছিস .."

"ভুল করেছি; এতবড় ভুল জীবনে আর কখনও করি নি।"

"ভুল শোধরাবার উপায় আরও ভুল করে নয়, ভুল না করে; স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে দূরে রেখে তুই ভুল করছিস। স্বামীকে দূরে রাখতে চেষ্টা করলে সে দূরেই থেকে যায়।"

বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। অলকা বললে, "তোর গাড়ী বোধ হয়?"

"হাঁ, কোন বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিল, ফেরবার পথে তুলে নিয়ে যেতে বলেছিলাম। চললাম; আমার কথাগুলো ভেবে দেখিস।"

তটিনী চলে গেল। অলকার মনে হল তটিনী আজ ভাগ্যবতী, স্বামীর

ভালবাসা পেয়েছে, তাকে ভালবাসতে পেরেছে। তারা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি তটিনী কখন বিয়ে করবে বা বিয়ে করে সুখী হবে অথচ তা সম্ভব হয়েছে আর সে যে বিয়ে করে সুখী হবে এ বিষয়ে কা'র কোন সন্দেহ কখন ছিল না অথচ সেইটাই সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তটিনী যখন সুখী হতে পেরেছে সেই বা পারবে না কেন? পারতেই হবে, এ ছাড়া আর তার কোন উপায় নেই।

ঝোঁকের মাথায় শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এসেছে বলে তার নিজের ওপর রাগ হল, সেখানে থাকলে হয়তো কোন উপায় হত কিন্তু এখান থেকে সে কি করতে পারে? দ্বিজেন আসবে না—নিজে থেকে তো নয়ই, হয়তো বললেও আসবে না; সে অপমান অলকা সহ্য করতে পারবে না। এ অচল অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে এমন কা'র কথা তার মনে পড়ল না।

অলকা জানত সন্ধ্যের পর শ্রীকান্ত আসবেন, হয়তো দ্বিজেনের মাও আসবেন কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। তাঁরা যদি তাকে নিয়ে যেতে চান তাহলে বেশ হয় কিন্তু তাঁরা তা চাইবেন না—সে লেখাপড়া জানা আজকালকার মেয়ে, শ্বশুর শাশুড়ী তার ওপর জোর জুলুম করবেন না, আজ তার মনে হল হয়তো করলেই ভাল হ'ত।

লোকে বলে দুঃখের মধ্যে সময় কাটতে চায় না, কিন্তু সমস্ত দিনটা অলকার যে কোথা দিয়ে কেটে গেল সে তা জানতেও পারলে না। লক্ষ্মীকান্তর কাছেও বেশীক্ষণ ছিল না, কোন কাজও করে নি অথচ সময় কেটে গেল। কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে সে খেয়াল তার ছিল না, উঠে আলোটাও জেলে দেয় নি, ঘরের সামনে জুতোর আওয়াজ হতে তার খেয়াল হল। শ্রীকান্ত কিংবা লক্ষ্মীকান্ত তাকে এ অবস্থায় দেখলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাই সে তাড়াতাড়ি আলোটা জেলে বাইরে আসতে গিয়ে দেখলে

দরজার সামনে দ্বিজেন। নিজের চোখকে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না ; কাছে গিয়ে জিগেস করলে, "তুমি ?"

দ্বিজেন বললে, "চিনতে পারছ না না কি ? অন্ধকারে বসে কা'র ধ্যান করা হচ্ছিল ?" এর পর যে কথাগুলো সে বলতে চেয়েছিল তা বললে অলকার মন আবার বিদ্রোহ করত।

অলকা বললে, "যা চাওয়া যায় সব সময় যদি এমনিভাবে তা পাওয়া যেত।"

"তার মানে ? তুমি কি বলতে চাও আমারই ধ্যান করছিলে ?"

"কেন ? সেটা কি এতই অসম্ভব ?"

দ্বিজেনের সন্দেহ হল সে হয়তো ঠিক শুনতে পাচ্ছে না তাই বললে, "আমি তো ভাবলাম বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশের খসড়া এতক্ষণ হয়ে গেছে।"

"আমরা তো পুরুষ নই যে আইনের ফাঁক থাকলেই ফাঁকি দেবার চেষ্টা করব ! তা ঝগড়াটা কি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হবে ?"

"তাহলে তবু শেষ হবার আশা আছে, ভাল করে বসে ধীরে সুস্থে করলে কি আর শেষ হবে ?"

"স্বামী-স্ত্রী কি সব সময় ঝগড়াই করে ?"

দ্বিজেন এ কথার জবাব দিতে পারলে না, সে যেন ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না ; এ রকমটা সে আশা করে নি, একটা বিশ্রী ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুত হয়েই সে এসেছিল কিন্তু অনুকূল অবস্থার সদ্ব্যবহার করতে সে জানে তাই বললে, "তোমার বাবা কোথায় ? তাঁর সঙ্গে এখনও দেখা করা হয় নি ; ভাববেন তাঁর নিমন্ত্রণ রাখলাম না।"

"বাবা তোমায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন না কি ?"

হাসতে হাসতে দ্বিজেন বললে, "নয় তো কি নিজে যেচে প্রথম শ্বশুর বাড়ী এসেছি ?"

"কৈ বাবা তো কিছু বলেন নি।" অলকার মনে হল যার জন্যে সে এত ভাবছিল, আপনা থেকে সে সমস্তার সমাধান হয়ে গেল।

সারা বাড়ী খুঁজে লক্ষ্মীকান্তকে কোথাও না পেয়ে অলকা চাকরদের জিগেস করে জানলে তিনি রান্নাঘরে। শুনে অলকা অবাক হয়ে গেল, লক্ষ্মীকান্ত জীবনে কখন রান্না ঘরের দিকে গিয়েছেন বলে তার মনে পড়ে না, রান্না ঘর যে কোথায় তাও হয়তো তিনি জানতেন না। রান্না ঘরে গিয়ে অলকা দেখলে তিনি একখানা চেয়ার নিয়ে বসে আছেন; তাদের দেখে বললেন, "এই যে এসেছ বাবা! এই একটু দেখা শোনা করছিলাম—কেই বা দেখে।"

অলকা বললে, "তাই বলে তুমি রান্না ঘরে?"

হাসতে হাসতে লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "তাতে হয়েছে কি? তোর জামাই যখন হবে তখন বুঝবি।"

অলকার মনে হল তটিনীকে কোন্ করে বলে সেও সুখী, তারই মত সুখী, হয়তো তার চেয়ে বেশী।

—একুশ—

হুজুগকে অবনী চিরকাল ভয় করে এসেছে কিন্তু হুজুগ বাদ দিলে এ সব আন্দোলনের কিছুই থাকে না, তাই ইচ্ছে না থাকলেও অবনীকে কতকটা সহ্য করে যেতে হচ্ছিল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা ঠিক করলেন ক'লকাতায় তাঁদের এক বিশেষ অধিবেশন হবে; অবনীর ব্যক্তিগত মতামতের সেখানে কোন দাম নেই; ছোট, বড়, মাঝারি সকল রকমের নেতারা আর কর্ম্মীরা এ সব চায়। নেতারা বলেন সব বিষয়েই বাঙলা দেশ পেছিয়ে পড়েছে, বাঙলায় শ্রমিকদের মধ্যে জাগরণের সাড়া আসে নি;

তাদের জাগাতে হলে চাই উত্তেজনা, চাই উৎসাহ। অবনী জানে এর গলদ কোথায় কিন্তু কিছু বলতে পারে না, বলে কোন কাজ হবে না।

সাড়ম্বরে অধিবেশন সুরু হল। প্রকাণ্ড মাঠ, হোগলার চালা, লাউড্ স্পিকার, বিজলীর আলো, মোটর গাড়ী, অভ্যর্থনা সমিতি, বক্তৃতা, প্রস্তাব, প্রতিবাদ কিছুরই অভাব ছিল না। এর জন্যে অর্থের অভাব হয় না, টাকা যে কোথা থেকে আসে তা বাইরের লোক ধারণা করতে পারে না। এত অর্থ অপব্যয়ের বিনিময়ে কি পাওয়া যায় তা কেউ ভেবে দেখার দরকার মনে করে না। কংগ্রেস প্রত্যেক বছর লাখ লাখ টাকা এইভাবে খরচ করে তাই আর সব রাষ্ট্রদলকেও করতে হবে। বাইরের অনেকের মত অবনীর বিশ্রী লাগে কিন্তু সে নিরুপায়। যে জন্যে সে এদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে তার কিছুই করে উঠতে পারে নি, এদের মধ্যে না থাকলে কিছু করতেও পারবে না। যতদিন পর্য্যন্ত তার বিপক্ষে মামলার নিষ্পত্তি না হয় ততদিন ব্রজেশের বিপক্ষে সে আইনের সাহায্য নিতে পারবে না; তারপরও যে খুব বেশী ক্ষতি করতে পারবে তা বলা যায় না। ব্রজেশকে জব্দ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই অধিবেশনে তার স্বরূপ প্রকাশ করা, যাতে সে এ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, নেতাদের মধ্যে আর স্থান না পায়।

নেতাদের সকলের ইতিহাসই তার জানা আছে। তাঁরা অনেকেই সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলনে সুপরিচিত তাই শ্রমিক সঙ্ঘেও তাঁদের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আছে হয় প্রকাণ্ড জমিদারী, না হয় কয়লার খনি, না হয় বিরাট কারখানা আর না হয় চা-বাগান। তাঁরা সবাই শ্রমিক খাটিয়ে বড়লোক হয়েছেন আর সব সময় যে শ্রমিকদের ওপর সুবিচার করেছেন তা অন্ততঃ তাঁদের অধীনস্থ শ্রমিকরা মনে করে না, কিন্তু বক্তৃতা দেবার সময় তাঁরা লেনিন্ ট্রট্স্কিকে ছাড়িয়ে যান।

সে বেশ ভাল করেই জানে এসব কথা ভেবে কোন লাভ নেই, এদের সরান যাবে না, অন্ততঃ এখনও অনেকদিন নয় কাজেই তাদের সাহায্যে যেটুকু কাজ হয় তা করে নেওয়া দরকার।

কমিটিতে ঠিক হয়ে গিয়েছিল এ অধিবেশনে ব্রজেশের কথা তোলা হবে; তার বিপক্ষে যত অভিযোগ প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে তা নেতাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কমল এর জন্যে সভার অনুমতি চাইলে—সে সভায় ব্রজেশ দত্ত উপস্থিত ছিল। সে সময় ব্রজেশের দিকে তাকালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদও হয়তো কিছু খোরাক পেতেন। সভার মধ্যে জনকতক এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইলে কিন্তু যে ভদ্রলোক অবনীর নির্ব্বাচনের আগের দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনি বললেন, "ব্রজেশবাবু একজন বিশিষ্ট নেতা, তাঁর সম্বন্ধে যখন কোন দোষারোপ হয়েছে তখন সে বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া দরকার। যিনি দোষারোপ করেছেন তিনি নিশ্চয় এর গুরুত্বের সম্বন্ধে সচেতন; অনুসন্ধানে যদি জানা যায় ব্রজেশবাবু নির্দ্দোষ তাহলে কমলবাবুর ওপর শাস্তি বিধান করা যাবে—ব্রজেশবাবু আদালতের সাহায্যও নিতে পারবেন।" তিনি এ বিষয় বিবেচনা করবার জন্যে একটা বিশেষ কমিটি গঠন করবার প্রস্তাব করলেন, সকলেই তাতে সায় দিলে। ব্রজেশ সমস্তক্ষণ নির্লিপ্ততার অভিনয় করলে; কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন করা হয়ে গেলে সে চলে গেল।

একজন বিশিষ্ট নেতা আর একজনকে বললেন, "মলিনা ব্রজেশের সম্বন্ধে অনেক কথা জানে, না? কিন্তু সে বলবে কি? ব্রজেশের সঙ্গে তার যে রকম মতের মিল· · · ·"

কমল বললে, "এখন আর তা নেই; হয়তো মলিনাদি এমন অনেক কথা বলবেন আপনারা যা ধারণাই করতে পারেন না।"

নেতারা অনেকেই হাসলেন কিন্তু কমল তার অর্থ বুঝতে পারলে না। সে বললে, "কাল সকালে তিনি জেল থেকে বেরুবেন, আমার মনে হয় তাঁকে অভ্যর্থনা করবার ব্যবস্থা করা উচিৎ।" নেতারা সকলেই সম্মতি দিলেন, অনেকে উপস্থিত থাকতেও রাজি হলেন।

পরদিন সকালে ছোটখাট একটা মিছিল করে তারা মলিনাকে আনতে গেল; সে দলে অবনী ছিল না। তার না থাকাটা অনেকেরই চোখে পড়েছিল। জনতা জেলের গেট থেকে একটু দূরে দাঁড়াল; আর একদিকে ছিলেন রেণুকা আর মালতী। মলিনা গেটের বাইরে আসতেই জনতা "ইংক্লাব্ জিন্দাবাদ্" বলে চেঁচিয়ে উঠল, একজন তার গলায় মালা পরিয়ে দিলে। মলিনা এ সবের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না; এ সব যে তারই জন্যে তা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে নেতাদের প্রণাম করে রেণুকাদের দিকে গেল; তাঁদের প্রণাম করে বললে, "আপনি কেন এলেন মাসীমা?"

রেণুকা বললেন, "এত লোক এসেছে আর আমি আসব না? মালতী তোকে ক'বারইবা দেখেছে সেও না এসে থাকতে পারলে না, আর আমি আসব না?"

কমল কাছে এসে বললে, "আপনাকে এখান থেকে সোজা সভায় যেতে হবে; শ্রমিকরা আসতে চেয়েছিল কিন্তু আমরা আসতে দিই নি গোলমাল হবে বলে; তাদের কথা দিয়েছি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।"

মলিনাকে রাজি হতে হল। কতদিন পরে সে আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে আসছে! কত লোক তাকে চেনে, স্নেহ করে, ভালবাসে, ভক্তি করে; তাদের মধ্যে যাবার একটা আকর্ষণ আছে, আগ্রহ আছে; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল এর কদর্য দিকটার কথা, তার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল। ব্রজেশ হয়তো সঙ্গীহীন নয়! তবু এত লোকের অনুরোধ,

এত সম্মান—এর মোহ্ সে কাটিয়ে উঠতে পারলে না। জনতার মধ্যে একজনকে সে খুঁজছিল, হয়তো পাবে না জেনেও। রেণুকাদের সে ফিরে যেতে বললে; কমল একখানা গাড়ী তাঁদের জন্যে জোগাড় করে দিলে। অনেকগুলো মোটর ছিল; তার মধ্যে যেখানা সব চেয়ে বড় সেইখানায় মলিনাকে উঠতে বলা হল। ব্রজেশের গাড়ীর কথা তার মনে পড়ে গেল: সেখানা যে তার নিজের নয় এ কথা প্রায় সে ভুলে গিয়েছিল।

তাকে বসে বসে ভাববার সময় দেওয়া হল না, অজস্র প্রশ্ন সুরু হল, তার জেলের অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে। কেমন ছিল, কোন কষ্ট হত কি না, কি কি খেতে দিত, বই পড়তে দিত কি না, কোন খবরের কাগজ দেওয়া হত কিনা, চিঠি পত্র সম্বন্ধে বেশী কড়াকড়ি ছিল কিনা এই সব প্রশ্ন। মলিনা যথাসম্ভব জবাব দিচ্ছিল আর ভাবছিল কৌতূহল এদেরও কম নয়, অথচ দোষটা হয় মেয়েদের নামে। তাদের গাড়ীতে অনেক ফুল ছিল আর তার পেছনে একসঙ্গে আরও কতকগুলো গাড়ী ছিল তাই পথচারীর নজর পড়ছিল। কেউ অনাবশ্যক বোধে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, কেউ পাশের লোককে জিগেস করছিল।

সভা মণ্ডপের সামনে শ্রমিকদের বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। মলিনাদের গাড়ীগুলো দেখা যেতে তারা জয়ধ্বনি করে উঠল; তারা অনেকে মলিনাকে চেনে, অনেকে চেনে না কিন্তু ভাবে অত বড় বড় লোক যখন তাকে আনতে গিয়েছিল তখন সে নিশ্চয় মস্ত একজন কেউ, কাজেই তাকে অভ্যর্থনা করা উচিত। মলিনার এর মধ্যে আসতে যেটুকু আপত্তি ছিল তা নিঃশেষে মুছে গেল; এই সে চায়! এই উন্মাদনা, এই চাঞ্চল্য এই তো তার উপযুক্ত জীবন। ছোট্ট একটুখানি একটা সংসারে আবদ্ধ হয়ে থাকার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, ছোট বেলা থেকে সে ঘর ছাড়া, ঘরের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই, এতদিন কোন মোহ ছিল না; সে মোহ যদি

আসে, এই কর্ম্মস্রোতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে সে তার হাত থেকে বাঁচবে।

সভায় তাকে কিছু বলতে বলা হল; সে বক্তৃতা করতে চায় না, তবু তাকে বলতে হল। এতদিন যা করে এসেছে, আজ হঠাৎ তা ভাল লাগছে না বললে লোকে শুনবে কেন? এই মেহের দাবী মেটাতে প্রতিনিয়ত কত লোক কত অত্যাচার সহ্য করছে তা কেউ ভেবে দেখে না! শেষ পর্য্যন্ত মলিনা ছোটখাট একটা বক্তৃতা করলে, হাততালিও পেলে কিন্তু তার নিজের মনে হল যা বললে তা অর্থহীন, অসংলগ্ন, তার মধ্যে প্রাণ নেই। নিজের এত বড মানসিক পরিবর্ত্তন তার নিজের কাছে অজ্ঞাত রইল না।

সভার শেষ পর্য্যন্ত মলিনা অবনীর দেখা পেলে না। সে তাকে সম্মান দেখাতে আসবে এ মলিনা চায় না, জেলে গিয়ে দেখা করতেও বারণ করেছিল কিন্তু সে জন্মে এখানেও কি সে আসবে না? এটা স্বাভাবিক ভদ্রতা, সৌজন্য, সহানুভূতি ছাড়া কিছু নয়; যেখানে তার চেয়ে বেশী কিছু আছে সেখানেই লোকের চোখ পডে, সেটা সে ভয় করে। সকলের কাছেই শুনলে সভা আরম্ভ হয়ে পর্য্যন্ত অবনী প্রায় সব সময়েই সেখানে উপস্থিত থাকে; তার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সভার কাজ সকালের মত শেষ হতে অনেকগুলো গাড়ীই তাকে হোষ্টেলে পৌছে দেবার জন্মে প্রস্তুত হয়ে উঠল। এতক্ষণে মলিনার হোষ্টেলের কথা মনে পড়ল।

হোষ্টেলের সামনে গাড়ী এসে দাঁড়াতে মলিনা দেখলে বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে; তার গাড়ীখানা থামতেই তারা ছুটে এসে তাকে অভ্যর্থনা করলে। তাদের অনেকের চোখেই জল। হোষ্টেলের মেয়েরা তাকে ভালবাসত তা মলিনা জানত, কিন্তু এত ভালবাসত তা জানত না।

কত ছোট খাট সুখ দুঃখের, হাসি গল্পের কথা তার জন্যে জমা হয়ে উঠেছিল, কবে কে কি বলেছে, কে কি করেছে এই সব! জেল ফেরতা মেয়েব কাছে এ সবের দাম না থাকাই উচিত, কিন্তু তার খুব ভাল লাগছিল।

বিকেলের দিকে অবনী এল। শ্লেটে তার নামটা দেখে মলিনার মনে হল তার দেহে রক্তের চাপ হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে। একটু অপেক্ষা করে সে অবনীর সঙ্গে দেখা করলে।

অবনী বললে, "আপনাকে দু'একটা কথা বলে যেতে এলাম। ব্রজেশ দত্তর বিষয় অনুসন্ধান করবার জন্যে একটা কমিটী হয়েছে, কমল কালকের সভার সে প্রসঙ্গ তুলেছিল তাই আজ এখান থেকে ফেরবার পথে একটা মোটর দুর্ঘটনায় ভয়ানক রকম জখম হয়েছে।"

মলিনা তাকে দেখতে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল, অবনী বললে, "এখন দেখতে যাওয়া ঠিক নয়, সে বড্ড দুর্ব্বল। হাঁ, আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি ও রকম বিপদ আপনারও আসতে পারে, তার জন্যে একটু তৈরী হয়ে নিন। যে ক'দিন এখানে না থাকি একটু সাবধানে থাকবেন। ফিরে এসে অনেক কথা জানবার ও জানাবার আছে।"

অবনীর কথা বলার মধ্যে বেশ একটা অভিভাবকের ভঙ্গি ছিল, সেটা মলিনা লক্ষ্য না করে জিগেস করলে, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"আসাম।"

"কেন জানতে পারি?"

"নেতারা ঠিক করেছেন সেখানকার শ্রমিকদের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান আর প্রতিকার করা দরকার। সে ভার আমার আর ক'জনের ওপর পড়েছে।"

"আপনি এর মধ্যে নামলেন কেন?"

"সে কথার জবাব দেবার মত সময় আজ আমার নেই।"

"জানতে খুব কৌতুহল হচ্ছে।"

"আমারও হয়েছিল, আপনার জেলে যাবার কারণ জানতে।"

মলিনা মাথা নিচু করে বসে রইল।

অবনী বললে, "যা বললাম মনে থাকে যেন। নেহাৎ যদি কমলকে দেখতে যেতে হয় একা না যাওয়াই ভাল। আচ্ছা চললাম।"

অবনী চলে যেতে মলিনার মনে হল এ সময় সে অতদূরে চলে না গেলেই ভাল হত।

—বাইশ—

অলকা দ্বিজেনের সঙ্গে সেই রাত্রে ফিরে এল দেখে দ্বিজেনের বাবা মা একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন কিন্তু কোন কথা জিগেস করেন নি; তার নিজের বাড়ী, সে যখন খুশী আসবে, যাবে তাতে কা'র কি বলবার আছে? দ্বিজেনের মা বরং একটু খুশীই হলেন; তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন অলকা-দ্বিজেনের সম্পর্কটা ঠিক নব-দম্পতির সম্পর্ক এখনও হয় নি তাই একটু চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন।

লক্ষীকান্তর বাড়ী থেকে দ্বিজেনের ফেরবার সময় অলকা এসে গাড়ীতে উঠল; দ্বিজেন একটু আশ্চর্য্য হল কিন্তু কোন কথা জিগেস করলে না। অলকা জিগেস করলে, "কবে আসাম যাওয়া হচ্ছে?"

দ্বিজেন একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, "জিগেস করবার কারণ? কৌতুহল, না কর্ত্তব্যবোধ, না অনুগ্রহ?"

"অনুগ্রহ আমরা করি না।"

"তাই নাকি ?" একটু পরে বললে, "পরশু বেলা ১টা ২৪ মিনিটে।"

"এত অল্প সময়ে সব গুছিয়ে নোব কি করে ?"

একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দ্বিজেন বললে, "গুছিয়ে নেবে কি করে ? গুছিয়ে দেবে বল ! অবশ্য অতটা আশা করাও আমার' পক্ষে ঠিক নয়।"

"ভেবে দেখলাম যাওয়াই ভাল।"

"সত্যি ?" দ্বিজেনের কথায় অনেকখানি বিস্ময় প্রকাশ পেল।

"তোমার মনের মত স্ত্রী হবার চেষ্টা করছি।"

দ্বিজেন তার পিঠ চাপড়ে বললে, "এইবার ঠিক করছ।"

অলকার এতবড পরিবর্ত্তনের কারণটা দ্বিজেন ধরতে পারছিল না, অবশ্য বিশেষ চেষ্টাও সে করে নি। কষ্ট করে কোন মেয়ের সঙ্গে মানিয়ে চলা তার পোষায় না, সহজে যে ধরা দেয় তাকে নিয়েই সে সন্তুষ্ট হতে চায়; কেউ যদি দূরে সরে যায়, কেন সরে গেল তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না, যেমন কাছে এলে কেন এল এ নিয়ে একটুও ভাবে না। সেদিন সকালে অলকা চলে যাবার পর তার মনে হয়েছিল তার সঙ্গে অতটা রূঢ়তা কববার কোন দবকার ছিল না কিন্তু করেছিল বলে তার একটুও অনুশোচনা হয় নি। অলকা ফিরে আসতে, তার ওপর আসাম যেতে' রাজি হতে সে খুশী হল এই পর্য্যন্ত।

লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত ও দ্বিজেনের মা দ্বিজেন আর অলকাকে তুলে দিতে এসেছিলেন। একটা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীর সামনে বেশ ভিড় হয়েছিল; সেদিকে একবার তাকিয়ে দ্বিজেনদের দল এগিয়ে গেল; ভিড়ের মধ্যে থেকেও অবনী অলকাকে দেখেছিল কিন্তু ভাবতেও প্যারে নি তারা একই জায়গায় যাচ্ছে।

যতক্ষণ গাড়ী ষ্টেশনে ছিল অলকা বেশ গম্ভীর হয়ে ছিল, গাড়ী চলতে

আরম্ভ করতে সে যেন হঠাৎ বদলে গেল। একেবারে নতুন লোক— দ্বিজেনের বিশ্বাসই হচ্ছিল না এ সেই অলকা। নিতান্ত ছোট্ট মেয়ের মত চঞ্চল হয়ে উঠল। একবার জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়, একবার দ্বিজেনের সামনে এসে বসে, তাকে অজস্র প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যেখানেই গাড়ী দাঁড়াক তার কিছু কেনা চাই; কোন সময় টাকার ফেরৎ পয়সা পাচ্ছে না, কোন সময় হয়তো কেনা জিনিষটাই পড়ে থাকছে। দ্বিজেন বেশ উপভোগ করছিল; হঠাৎ তার হাতটা ধরে জিগেস করলে, "এ জীবনের উৎস, এ চঞ্চলতা এতদিন তোমার কোথায় ছিল অলকা?"

হাসতে হাসতে অলকা বললে, "রাজকন্যে ঘুমিয়েছিল, রাজ পুত্তুর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে জাগিয়ে তুলল।"

দ্বিজেন তাকে কাছে টানলে, সে বাধা দিলে না, আজ যেন ধরা দেবার জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল!

দ্বিজেন বললে, "সেদিনকার অলকার আর আজকের অলকার মধ্যে কত তফাৎ বলত? তোমার কাছে বিচার, বুদ্ধি, মনস্তত্ত্ব চাই না, চাই এই রকম নির্ভরতা, এই রকম সঙ্গ দেবার ক্ষমতা।"

অত্যন্ত অসঙ্গতির মত একটা ষ্টেশন এসে গেল; গাড়ী থামতে অলকা জানলার কাছে এসে বসল, এবার দ্বিজেনও তার পাশে বসল। ছোট ষ্টেশন, বেশী লোকজন ওঠানামা করে না, ফেরিওয়ালাও নেই। দ্বিজেন বললে, "ফেরিওয়ালারা কি বোকা! তোমার মত একজন যাত্রী আছে জেনেও সব ষ্টেশনে আসে না।" অলকা হেসে উঠল। একটা ভিখিরি পয়সা চেয়ে চেয়ে বিরক্ত হয়ে খালি হাতে ফিরছিল; অলকার কাছে হাত পাতলে। অলকা তার হাতব্যাগ খুলে দেখলে ক'টা টাকা ছাড়া খুচরো কিছু নেই। দ্বিজেন সব দেখছিল কিন্তু কিছু বলে নি। অলকা একটা টাকাই ভিখিরিটাকে দিয়ে দিলে। সে অবাক হয়ে অলকার মুখের দিকে চেয়ে

রইল, একটা শুভেচ্ছা জানাতেও ভুলে গেল। অলকা বললে, "লোকটা কি পাজি দেখেছ! কেউ একটা পয়সা দিলে কত আশীর্ব্বাদ করে আর আমি একটা টাকা দিলাম, একটা কথাও বললে না।"

দ্বিজেন বললে, "তোমার দানের ভারে ওর মাথা নিচু হয়ে গিয়েছে, চোখ তুলে চাইতেও পারে নি। মুখের কথায় প্রকাশ করতে না পারলেও অন্তরে ও তোমায় আশীর্ব্বাদ করেছে, আর অনেক দিন ধরেই করবে।"

"বেশ, তোমার কথা মেনে নিলাম; মনে মনেই আশীর্ব্বাদ করেছে কিন্তু কি বলে আশীর্ব্বাদ করলে?"

"কখন ওদের আশীর্ব্বাদ শোন নি? ছেলেদের বলে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক, আর মেয়েদের বলে পাকা মাথায় সিঁদুর পর, স্বামী

বাধা দিয়ে অলকা জিগেস করলে, "মাথা কি আবার পাকে নাকি?'

"সকলের পাকে না এই যেমন তোমার পাকবে না, ও ডাব ডাবই থাকবে, নারকেল কোনদিন হবে না।"

"তার মানে?"

"তুমি বড্ড ছেলেমানুষ; সাংসারিক বুদ্ধি তোমার মোটেই নেই আর কোনদিন হবে বলেও মনে হয় না।"

"সোজা কথায় বলতে চাও আমি বোকা?" এমনভাবে অলকা কথাগুলো বললে যে দ্বিজেন না হেসে পারলে না।

অলকার আচরণে দ্বিজেনের মনে হচ্ছিল এবার সন্ধি করবার সময় হয়েছে—অলকার কাছে অবনীর চেয়ে দ্বিজেন বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে; যতদিন তা না হয় কোন স্বামীই স্ত্রীকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। এক দেবতা যেমন ভক্তের অন্য দেবতায় সামান্য মাত্র অনুরক্তি দেখলে ঈর্ষা করেন, এক পুরুষ তেমনি স্ত্রীর অন্য পুরুষের প্রতি সামান্য দুর্ব্বলতা দেখলে নিজেকে অপমানিত বোধ করে।

—তেইশ—

আসামের একটা ষ্টেশনে সেদিন খুব ভিড় হয়েছিল; ট্রেণ আসবার অনেক আগে থেকে প্ল্যাট্‌ফর্ম জনতায় ভরে গিয়েছিল। ট্রেণ ষ্টেশনে ঢুকতে জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল। অবনী আর তার সঙ্গীরা ট্রেণ থেকে নামতে জনতা সেই কামরার দিকে এগিয়ে এল। অবনী ঠিক এতটা কল্পনা করে নি; তার সঙ্গে সেখানকার একজন লোক ছিলেন; তাঁকে জিগেস করলে, "ব্যাপার কি? এ সব কাণ্ড করবার মানে?"

সে ভদ্রলোক বললেন, "আসাম তার অতিথিদের সম্মান দিতে জানে তাই প্রমাণ করতে চায়।"

জনতার মধ্যে থেকে ক'জন এসে অবনীর আর তার সঙ্গীদের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। অবনী বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছিল; এভাবে বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সং সেজে থাকা সে ভয়ানক রকম অপছন্দ করে। মালাগুলো খুলে ফেলতে গেল কিন্তু সকলে মিলে বারণ করলে। একজন বললেন, "আপনারা খুব সময়ে এসেছেন; এই গাড়ীতেই এক বাঙ্গালী সাহেব আসছেন কোম্পানীর তরফ থেকে কাজকর্ম্ম দেখতে, এর আগেও তিনি ক'বার এসেছেন; তাঁর আসা মানে কুলিদের ওপর জুলুমের চুড়ান্ত—ম্যানেজাররা কাজ দেখিয়ে সাহেবকে খুশী করতে চায়, আর ওদের প্রাণ যায়।"

আর একজন দ্বিজেনের দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে। সাহেবটী যে দ্বিজেন আর তারা যে একই গাড়ীতে আসছে এ জানলে অবনী হয়তো আসতে চাইতো না। ব্যাপারটাকে ঠিক ঘটনাচক্র বলে মেনে নিতে তার ইচ্ছে করছিল না।

ষ্টেশনে গাড়ী ঢুকতে ভিড় দেখে অলকা খুব আশ্চর্য্য হয়েছিল; অবনীর

অভ্যর্থনা সে দেখলে—হঠাৎ এতখানি জনপ্রিয় সে কি করে হয়ে উঠল তা অলকা বুঝতে পারছিল না।

দ্বিজেন বললে, "কে এসেছে দেখেছ?"

অলকা না বোঝার অভিনয় করে বললে, "অনেকেই তো এসেছে। কা'র কথা বলছ?"

"অনেকের মধ্যে যে অদ্বিতীয়, অন্ততঃ তোমার কাছে, তার কথা। তাকে কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে দেখেছ? ঠিক যেন কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে কেষ্টদাস পালের ষ্ট্যাচু।"

কথার মোড় ফেরাবার জন্যে অলকা বললে, "তোমায় নিয়ে যাবার জন্যে লোক আসে নি?"

"এসেছে নিশ্চয় কিন্তু এ ভিড়ের মধ্যে কাছে আসতে পারছে না। না এলেও কোন ক্ষতি নেই, আমি তো আর প্রথম আসছি না।" ভিড়ের মধ্যে সে এগিয়ে যেতে লাগল। অলকা বললে, "ভিড়টা একটু কমে গেলে যাওয়াই ভাল নয় কি?"

"ভিড়টাই বাধা না ওর সামনে আমার সঙ্গে যেতেই লজ্জা?"

বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে অলকা বললে, "তাহলে বিয়ে করতাম না।"

"তাহলে চল ওর সামনে দিয়ে; ও বুঝুক ও ওর ঐ মালা আর হাততালি নিয়ে জয়ী হয় নি, হয়েছি আমি।" দ্বিজেন সাহেবী কায়দায় অলকার হাতের ভেতর হাত দিয়ে এগিয়ে গেল। যেখানে অবনী ক'জনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, সেখানে এসে বললে, 'হ্যালো গুপ্ত! তুমি এখানে কি করতে? তোমায় কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে!" অলকা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। দ্বিজেন হাত বাড়িয়ে দিতে অবনী করমর্দন করে বললে, "এখানকার শ্রমিকদের কোন সঙ্ঘ নেই তাই নিখিল ভারত……"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে দ্বিজেন জিগেস করলে, "কবে থেকে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলার কাজ আরম্ভ করেছ ?"

অবনী বেশ শান্তভাবেই বললে, "শ্রমিকদের ক্ষেপান আমার কাজ নয়।"

দ্বিজেন বললে, "না হওয়াই ভাল। হাঁ, আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করে দি—ইনি হচ্ছেন মিঃ অবনী গুপ্ত, ব্যারিষ্টার, অধুনা-শ্রমিক নেতা, আর ইনি আমার স্ত্রী অলকা।"

অলকা চোখ তুলে চাইতে পারলে না, অবনী একটু ইতস্ততঃ করে হাত তুলে নমস্কার করলে। দ্বিজেন হাসতে, হাসতে বললে, "তোমার এত লজ্জা কিসের ? আচ্ছা পরে দেখা হবে।"

দ্বিজেন আর অলকা চলে গেল। অবনীর ইচ্ছে করছিল দ্বিজেনকে জিগেস করে তার এ রকম ব্যবহার করার মানে কি ? কাকে জব্দ করা তার উদ্দেশ্য ? তাকে না অলকাকে ? অলকা যে বিরক্ত হয়েছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

তাকে বেশীক্ষণ ভাববার সুযোগ না দিয়ে একজন জিগেস করলে, "ওঁকে চেনেন দেখছি।"

অবনী বললে, "হাঁ, বিলেতে পরিচয় হয়েছিল।"

"উনিই তো নতুন সাহেব। ওঁর সঙ্গে আপনার মত লোকের আলাপ থাকা… "

অবনী বললে, "থামলেন কেন ?"

লোকটা বললে, "না, এই বলছি ওঁরা হচ্ছেন ধনিক সম্প্রদায়, শ্রমিকদের শত্রু। উনি এখানে আসেন অত্যাচার করতে, থাকছেন তো ক'দিন, সবই জানতে পারবেন।"

আর একজন জিগেস করলে, "ওর স্ত্রী বলে যার পরিচয় দিলে তাকেও চেনেন না কি ? স্ত্রীলোক নিয়ে ও এই প্রথম আসছে।"

অবনী বিরক্ত হয়ে বললে, "ভদ্র মহিলা ওঁর স্ত্রী।"

লোকটা একটুও বিব্রত না হয়ে বললে, "আপনি বলছেন তাই অবিশ্বাস করতে পারছি না কিন্তু ওর মত লোক যে বিয়ে করা স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আসে তা তো মনে হয় না। অনেক কুলি মেয়ের ...."

অবনী এগিয়ে গেল, কাজেই আর সবাইকে সঙ্গে সঙ্গে যেতে হল।

অলকার সম্বন্ধে তাদের ইঙ্গিতে অবনী যে একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল তা বুঝতে তার সঙ্গীদের একটুও সময় লাগল না। তারা এর কারণ বার করবার জন্তে উৎসুক হয়ে উঠল।

ষ্টেশনের বাইরে একটা প্রকাণ্ড মাঠে শ্রমিকরা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল; অবনীদের দলকে দেখা যেতে তারা জয়ধ্বনি করে উঠল। অবনী তাদের মধ্যে যেতে তারা তাকে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করলে। সেখানকার যে সব ভদ্রলোক অবনীদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন তাঁরা অবনীর কষ্ট হবে বলে বারণ করলেন, কিন্তু এত লোককে নিরাশ করতে তার ইচ্ছে হল না; একটা ছোটখাট বক্তৃতা সে করলে তার সারাংশ হচ্ছে শ্রমিকদের ভার শ্রমিকদেরই নিতে হবে। এ অঞ্চলে শ্রমিক নেতা আসা এই প্রথম, তার ওপর সে পদস্থ লোক আর তার সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর এসে পৌঁছেছিল তাই শ্রমিকরা তাকে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলে।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে দ্বিজেন দেখলে তার অধীনস্থ অনেক লোকই রয়েছে। তারা বললে, "ভেতরেও জনকতক লোক গিয়েছে, বোধ হয় ভিড়ের জন্তে দেখা করতে পারে নি।" দ্বিজেন যে বিয়ে করেছে আর বউ নিয়ে আসছে এ কথা কেউ জানত না, মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কেউ কেউ জানত তাই অলকাকে দেখে বিশেষ আশ্চর্য্য হয় নি। দ্বিজেন তার পরিচয় দিয়ে বললে, "উনিও আসতে চাইলেন, কখন এদিকে আসেন নি কিনা। আপনাদের একটু বিব্রত করলাম।" অলকার

আসাটা যে তাদের সৌভাগ্য তা তারা বারবার করে জানালে। তাদের বিব্রত হলে চলবে না কারণ দ্বিজেন এসেছে তাদের কাজের তদারক করতে, তাকে সন্তুষ্ট রাখা চাই আর সাহেবকে সন্তুষ্ট করার রাজপথ যে মেমসাহেবকে খুশী করা তা সাহেবের অধীনস্থ জীব মাত্রেই জানে। গাড়ীতে উঠতে উঠতে অলকার যতগুলো নিমন্ত্রণ হল সেগুলো রাখতে গেলে দু' বেলার কোন বেলাই বাড়ীতে খাওয়া চলে না।

অবনীর কাছে তাকে ওভাবে অপ্রস্তুত করার জন্যে অলকা ভয়ানক রকম চটেছিল কিন্তু এতক্ষণে তার রাগটা অনেকটা পড়ে এসেছিল ; শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করে দেখতে হবে, তটিনীর কথাগুলো তার মনে পড়ে গেল। যে অভিনয় সে সুরু করেছে যে কোন মুহূর্ত্তে তার যবনিকা পড়ে যেতে পারে, আর যতক্ষণ না পড়ছে সে তাকে মিলনান্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

দ্বিজেনকে অবনীর বিষয় আর কোন কথা তোলবার সুযোগ না দিয়ে অলকা অজস্র প্রশ্ন সুরু করলে। সব কথার জবাব দিতে দ্বিজেনের অসুবিধে হচ্ছিল কিন্তু খারাপ লাগছিল না। নিরীহ মোটর চালক বেচারাও তার প্রশ্নের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাচ্ছিল না।

দ্বিজেন যে সস্ত্রীক এসেছে এ কথা রটে যেতে মোটেই সময় লাগল না। তার স্ত্রীর রীতিমত খাতির যত্ন হওয়া দরকার, তার জন্যে পদস্থ কর্ম্মচারীরা নিজেদের বাড়ীর মেয়েদের তৈরী করতে লাগলেন। মেয়েদের ভয়ের অন্ত নেই, ক'লকাতার কলেজে পড়া, পাশ করা বড়লোকের মেয়ে, বড় লোকের বৌ, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা, আলাপ করা সহজ নয় কিন্তু পারতেই হবে, বাড়ীর পুরুষদের ভবিষ্যৎ অনেকটা তার ওপর নির্ভর করছে, ঠিক এই দায়ে ঠেকলে অনেক মেয়েকেই অনেক কিছু পারতে হয়।

অলকার সম্বন্ধে তাঁরা যতটা ভয় করেছিলেন ঠিক ততটা ভয় করবার

সুযোগ সে দিলে না, বেশ সহজে তাদের সঙ্গে আলাপ করে নিলে, দু' একজনের বাড়ীতেও গেল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে অলকার সুখ্যাতি সহরময় রটে গেল, মেয়েরা তার সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলছিল সেগুলো শুনতে পেলে সে খুশী হত তবে তা না শুনেও সে বুঝতে পেরেছিল তারা তাকে অনেকটা সম্মান ও শ্রদ্ধা দিয়ে ফেলেছে। এই রকম জীবনই সে চায়, বহুর মধ্যে এক হয়ে থাকার মোহ অন্য কা'র চেয়ে তার কম নয়, প্রতিষ্ঠার আকর্ষণ তার পুরুষেরই মত। সে ভাবছিল আসামে আসাটা ভালই হয়েছে শুধু মাঝ থেকে অবনী এসে খানিকটা অস্বস্তির সৃষ্টি করছে। অলক বেশ বুঝতে পেরেছিল দ্বিজেনের মনে অবনীর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে, অবশ্য অভিযোগটা কোন শ্রেণীর তা তার অজানা ছিল না। সে জন্যে দ্বিজেনকে দোষ দেওয়া যায় না, স্ত্রীর অতীতের প্রণয়ীর সঙ্গে পরিচয় থাকলে কোন পুরুষই তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয় না। অলকা তার সন্দেহ দূর করবার চেষ্টা করছিল অবনীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। লোকের কাছে উপেক্ষা দেখান যতটা সোজা নিজের মনের মধ্যে উপেক্ষা করাটা তত সোজা নয়। অলকা আসবার সময় ষ্টেশনে অবনীর অভ্যর্থনা দেখেছে, অনেকের কাছে তার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে, তার বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে আসতে ভিড় দেখেছে, দ্বিজেনের কাছে তার বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে সে এত উঁচু একটা আসন জুড়ে বসল তা সে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, তাই তার সম্বন্ধে কৌতূহলও কমছিল না। তার ইচ্ছে করছিল অবনীকে গিয়ে জিগেস করে এ পরিবর্তন তার মধ্যে কি করে সম্ভব হল ? একা মলিনা কি এর জন্যে দায়ী ? মলিনাকে দেখবারও তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ; সে ভেবেছিল অবনী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তাকে না দেখে একটু আশ্বস্ত হল। মলিনা অবনীর সঙ্গে থাকা না থাকায় তার কি যায় আসে এ কথা সে ভেবে দেখতে পারলে

না, তার কাছে সব চেয়ে বড় কথা হল এই যে অবনীর জীবন থেকে তার চলে আসাটা অবনীকে খুব বড আঘাত দিতে পারে নি; কোন মেয়েই এতে সন্তুষ্ট হয় না, অলকাও হল না। বিশেষ কোন পুরুষকে হতাশ প্রেমিক করতে পারা অনেক মেয়েই জীবনের একটা বড সার্থকতা বলে মনে করে।

অবনীর মধ্যে হতাশ হওয়ার, এমন কি সামান্য দুঃখিত হওয়ার কোন চিহ্নও সে খুঁজে পেলে না। সে দু'চার জন লোক নিয়ে দ্বিজেনের সঙ্গে দেখা করলে—উদ্দেশ্য মালিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এক শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে তোলা; তার আসবার ইচ্ছে না থাকলেও আসতে হয়েছিল কাজের খাতিরে; যতক্ষণ আপষে কাজ চালান যায় সে বিরোধ করতে চায় না। দ্বিজেনের কাছে যে সে বিশেষ সহায়তা পাবে এ বিশ্বাস তার ছিল না, ষ্টেশনে অলকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার মত একটা অভদ্রতার পর অবনী আশা করেনি দ্বিজেন সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখবে।

অবনী আর তার সঙ্গীদের দেখে দ্বিজেন সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত সাহেবী কায়দায় বললে, "আমি আপনাদের কি করতে পারি?" অবনী তাদের আসবার উদ্দেশ্য জানাতে সে চা-বাগানের সাহেবের উপযুক্ত মেজাজ দেখিয়ে বললে, "আপনারা এ লোকগুলোর মাথা খাচ্ছেন, ওদের সর্ব্বনাশ করছেন ওদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। আর আমায় বলেন সে বিষয় সাহায্য করতে? আপনাদের অসীম সাহস।" অবনী বুঝলে দ্বিজেন তাকে অপমান করতে চায় তাই সে আর কোন কথা না বলে চলে গেল।

অবনী চলে যেতে দ্বিজেন অলকাকে ডেকে বললে, "অবনী এসেছিল যে।"

গলার স্বরে যতখানি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা যায় তাই করে অলকা বললে, "তাই নাকি?"

দ্বিজেন একটু আশ্চর্য্য হল তার ব্যবহারে, বললে, "হাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে।" এ কথার প্রতিক্রিয়া অলকার ওপর কি রকম হয়

তা দেখবার লোভ দ্বিজেন সামলাতে পারলে না, তার মনে হল অবনীর সম্বন্ধে অতখানি উদাসীন অলকা আজও হতে পারে নি।

অলকা জিগেস করলে, "আমার সঙ্গে?" তার কথায় অনেকখানি আগ্রহ প্রকাশ পেল।

দ্বিজেন তা লক্ষ্য করে বললে, "হাঁ, তোমার সঙ্গে! তাকে বলে দিলাম তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও না। ঠিক করি নি?"

অলকার এতক্ষণে মনে হল দ্বিজেন তাকে পরীক্ষা করছে। সে আবার নিস্পৃহভাবে বললে, "নিশ্চয় ঠিক করেছ। যারা কুলিমজুর ক্ষেপিয়ে বেড়ায় ভদ্রলোকের ঘরের বৌ তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারে না।" দ্বিজেন অলকার এ পরিবর্ত্তনটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না। একটু সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিজেন শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে সক্ষম হল। তার ব্যক্তিগত দেখাশোনার দৌলতে শ্রমিকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কাজ করবার সময় বাড়াতে গেলে আইনে বাধে তাই সে পথে না গিয়ে সে চাইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেশী কাজ, এত বেশী যা কোন শ্রমিকই করতে পারে না। সে ঠিকেদারদের ওপর জুলুম করতে লাগল আর ঠিকেদাররা তার সুদ শুদ্ধ কুলিদের ওপর তুলে নিতে আরম্ভ করলে। চা-বাগানের কুলির অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না, এখন তাদের পক্ষেও সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। তাদের নিষ্ফল আক্রোশ দেখে দ্বিজেন একটা পৈশাচিক আনন্দ পেত। বিলেত গেলে, স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে এলে বাঙ্গালীর ছেলের মধ্যে যেটুকু উদারতা আসে দ্বিজেনের তা তো আসেই নি বরং নীচু স্তরের লোকের ওপর জুলুম করবার মোহ তাকে পেয়ে বসেছিল; এ রকম অদ্ভূৎ মনোবৃত্তি আজকালকার বিলেত-ফেরতা ছেলেদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।

—চব্বিশ—

দ্বিজেনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে অবনীর সঙ্গীরা তার সঙ্গে তারই বাড়ীতে ফিরে এল। তারা অনেকেই দ্বিজেনের বাড়ী যেতে চায় নি, গিয়ে যে কোন লাভ হবে না তাও বলেছিল কিন্তু অবনী শোনে নি। সেও আশা করে নি দ্বিজেন তার কাজে সাহায্য করবে তবে কোন কাজে হাত দেবার আগে সমস্ত অবস্থাটা ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করা হচ্ছে তার স্বভাব, তাই কোন লাভ হবে না জেনেও সে দ্বিজেনের সঙ্গে দেখা করলে যাতে সে পরে বলতে না পারে তার সহযোগিতা চাওয়া হয় নি। অবনীর সঙ্গীরা অত ভেবে দেখা দরকার মনে করে নি; তাদের মতে ধনিক আর শ্রমিকের মধ্যে রফা করা সম্ভব নয়, শ্রমিক যা পায় তা তাকে আদায় করে নিতে হয়, আপষ করে পায় না। অবনী তাদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে তর্ক করলে না; তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে তোলা, সেটা যদি সহজে হয়ে যায় তাহলে সে খুশী হয় কিন্তু তা হবার আশা কম তা সে জানে।

এর পর কি করা উচিত সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এমন সময় একজন দারোগা এসে ঘরে ঢুকলেন। হাত তুলে নমস্কার করে অবনীকে জিগেস করলেন, 'আপনি অবনীবাবু তো?'

প্রতিনমস্কার করে অবনী বললে, "আজ্ঞে হাঁ, কি দরকার বলুন।"

"সভা-সমিতি না করবার জন্যে আপনার ওপর ১৪৪ ধারায় একটা আদেশ আছে।" দারোগা অবনীর হাতে হুকুমটা দিতে সে সই করে দিয়ে পড়ে দেখলে। দারোগা নমস্কার করে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ভবিষ্যৎ নেতাদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য, একটু উষ্মা দেখা গেল। একজন বললেন, "কি অন্যায় জুলুম! সভা সমিতিও করতে দেবে না।"

আর একজন বললে, "কি করে দেবে? মালিকরা কর্তাদের বোঝাচ্ছে তাতে শান্তি ভঙ্গ হবার ভয় আছে।"

একজন অবনীকে জিগেস করলে, "কি করবেন ঠিক করলেন?"

অবনী অন্যমনস্কের মত বললে, "কিছু ঠিক করি নি।"

আর একজন বললেন, "কিন্তু বেশী সময়ও তো নেই ; আজ বিকেলেই একটা সভা আছে।"

অবনী বললে, "না, আজ সভা হবে না।"

তাঁদের মধ্যে যাঁর বয়েসটা সব চেয়ে কম, আর আগ্রহটা সব চেয়ে বেশী তিনি বললেন, "বলেন কি ? এই উন্মত্ত আবেগ এই উচ্ছল কর্ম্মতৎপরতা "

ভদ্রলোকের অসমাপ্ত বক্তৃতায় বাধা দিয়ে অবনী বললে, "ঠিক এইজন্যেই বন্ধ করতে হবে, আবেগের মধ্যে দিয়ে কাজ করা যায় স্বীকার করি কিন্তু সে কাজ স্থায়ী হয় বলে স্বীকার করি না। আবেগের সঙ্গে বিচারের সম্পর্ক নেই অথচ বিচার ছাড়া সত্যিকার কাজ হয় না।"

কেউ কোন কথা বললে না। অবনী বুঝলে তারা হতাশ হয়েছে, তার আশা হল এখনকার মত অন্ততঃ সে তাদের হাত থেকে মুক্তি পাবে কিন্তু লোক চরিত্রের সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সামান্য তা বুঝতে তার সময় লাগল না। একজন বললেন, "শ্রমিকরা কিন্তু সভা করতে চাইবে।"

বিরক্ত হয়ে অবনী বললে, "তাদের ওপর যদি হুকুম জারি না হয় থাকে তারা করতে পারে।'

যিনি এর আগে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বাধা পেয়েছিলেন তিনি বললেন, 'তা হলে কি আমাদের এই বুঝতে হবে যে আপনি হুকুমের ভয়েই সভা করতে রাজি নয় ?"

কথাগুলোর মধ্যে যে খোঁচাটা ছিল তা উপেক্ষা করে অবনী বললে, "আপনার যা খুশী ভাবতে পারেন ; কি করব আর কি করব না সে বিষয় ভাববার যোগ্যতা আমার আছে।"

আর একজন বললেন, "তা অবশ্য আছে তবে কিনা আপনি হচ্ছেন একজন নেতা, আপনি যদি ভয়ে......"

অবনী বললে, "আমি নেতা হতে চাইনি, আপনারাই জোর করে আমায় নেতা বানিয়েছেন; এতে আমার কিছুমাত্র লোভ নেই। আর নেতা বলতে যদি আপনারা আইন অমান্য করে জেলে যাবার একটা কল বিশেষ মনে করেন তাহলে আমায় মুক্তি দিন।"

তরুণ ভদ্রলোকটী বললেন, "দেশের লোক আপনাকে ভুল বুঝেছিল; তাদের সে ভুল ভাঙতে বেশী সময় লাগবে না; জনকতক লোককে কিছু দিনের জন্যে বোকা বানান যায় কিন্তু দেশশুদ্ধ লোককে বেশীদিনের জন্যে বোকা বানান যায় না।" তাঁর কথায় ঝাঁঝ ছিল।

অবনী হাসতে, হাসতে বললে, "আপনার সম্প্রতি কলেজে শেখা বুলি গুলো যেখানে সেখানে ব্যবহার করে নষ্ট করবেন না, দরকারের সময় হয়তো খুঁজে পাবেন না।"

তরুণটী উঠে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইও উঠে পড়ল।

তারা চলে যেতে অবনীর মনে হল তার আর সেখানে থাকার কোন মানে হয় না। যে কাজের জন্যে সে এসেছিল তা করবার কোন উপায় নেই। দ্বিজেন আপষে মীমাংসা করে কাজ করতে দেবে না, সভা সমিতি করায় পুলিশের আপত্তি! তার ওপর যারা তাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে তারা তার সঙ্গে একমত নয়, এমন কি তার সঙ্গীরাও তার বিপক্ষে; এ অবস্থায় সেখানে বসে থেকে লাভ কি? ক'লকাতা যাবার ট্রেণের বেশী দেরী ছিল না; যেটুকু সময় ছিল তাতে তৈরী হয়ে যেতে গেলে অনেকটা পালানোর মত হয়, তাতে সে রাজি নয় তাছাড়া যদি সত্যি শ্রমিকরা সভা করে তাহলে তার ফল কি হয় তাও দেখা উচিত কাজেই তার তখনি যাওয়া হল না।

সারা দিনের মধ্যে অবনী কোন নতুন খবর পেলে না; যারা খবর দেবে সেই স্থানীয় ক্ষুদ্র নেতারাই তার ওপর চটেছে। বিকেলের দিকে

একদল শ্রমিক তার কাছে এল তাকে সভায় নিয়ে যাবে বলে। তখন সমস্ত সহরে ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে; সে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলে আইন ভেঙ্গে সভা করলে তাদের বিপদ বাড়বে, কাজ কিছু হবে না; মালিকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে আইন ভাঙ্গা উচিত নয় কারণ তাতে বিপদ আসে দু'দিক থেকে, দু'দিক বাঁচাবার শক্তি তাদের নেই। যুক্তিতর্ক শোনবার মত অবস্থা তাদের তখন ছিল না। তারা বললে, "আমাদের দুঃখ কষ্ট আপনি দেখছেন না। কোনদিনই আমরা সুখে ছিলাম না, তার ওপর নতুন সাহেব আসতে আমাদের ওপর জুলুম আরও বেড়ে গিয়েছে। এতদিন যে কাজ দিতে আমরা নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেতাম না, এখন তার ওপর আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, কথায়, কথায় চাকরি যাচ্ছে—দিশি সাহেব বিলিতি সাহেবদের চেয়েও বেশী অত্যাচারী।"

অবনী বললে, 'শুধু আইন অমান্য করে একটা সভা করলেই কি তার প্রতিকার হবে? যে কাজ আগে করতে, এখনও তাই কর, বেশী কোর না আর গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত দাও। মালিক যা বলবে গভর্ণমেণ্ট তা মেনে নেবে না। তোমরা যদি আইন অমান্য না কর তা হলে আমি তোমাদের কথা গভর্ণমেণ্টের কাছে জানাবার ভার নিচ্ছি; যা করবার সমস্ত করব আর তোমাদের ওপর যে অত্যাচার বন্ধ হবে তা জোর করে বলতে পারি।"

অবনী যতদূর সম্ভব সোজা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, তারা অনেকেই হয়তো তার কথা মত কাজ করতে রাজি হত যদি না আরও অনেকে আপত্তি করত। তারা শ্রমিকদের ভুল বোঝাতে চেষ্টা করলে, উত্তেজিত করলে; অবনী যা বলেছিল তার মধ্যে ছিল যুক্তি, জনতার কাছে যুক্তির কোন দাম নেই। তারপর অবনী ভয়ে সভায় আসে নি একথা তাদের বোঝাতে মোটেই কষ্ট করতে হল না।

পুলিশের আপত্তি সত্বেও সভা করবার চেষ্টা হল আর সে চেষ্টার ফলে লাঠি চলল, জনকতক আহত হয়ে হাসপাতালে গেল আর ক'জন গেল হাজতে। অবনী খবর পেলে সন্ধ্যের পর, তার মনে হল এইবার এখানকার শ্রমিকদের আসল দুর্ভাগ্য আরম্ভ হল।

—পঁচিশ—

এক চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজার দ্বিজেনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সাহেব জানতেন না অলকা আধুনিক মেয়ে, সাহেব-মেমের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়ায় তার আপত্তি নেই তাই তিনি তাকে নিমন্ত্রণ করেন নি। অনেকদিন পরে দ্বিজেন তার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশী হয়ে উঠেছিল; কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল সে খেয়াল তার ছিল না। রাত বেশ বেশী হয়ে যেতে মেম-সাহেব তাকে মনে করিয়ে দিলেন ঘরে তার স্ত্রী নামক একটী জীব আছে। তাকে উঠতে হল; সাহেব সঙ্গে একজন লোক দিলেন, দ্বিজেন নিতে চায় নি, যদিও তার পা টলছিল।

অলকা তার ঘরে বসে একখানা বই পড়ছিল বা পড়বার চেষ্টা করছিল। অনেকবার ঘড়ি দেখেছে; রাত বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অস্বস্তি বাড়ছিল—এত দেরী করবার কারণ কি? এ কথা মনে হ'তে তার হাসি এল। ক'দিন আগেও যার সঙ্গে দিন কাটাতে হবে ভাবলে মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত, আজ তার আসতে একটু দেরী হচ্ছে বলে সে ভাবছে। নিজের মনে জবাবদিহি করার চেষ্টা করে সে বললে, "অলকা তোমার অপমৃত্যু হয়েছে আর সেই মৃত দেহ থেকে দ্বিজেনের স্ত্রী নামক এক প্রেতের সৃষ্টি হয়েছে।" তার মনের মধ্যে আর একজন বললে, "হয়ে থাকে হয়েছে।

সত্যিই তো আর অলকা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করতে পারত না। যা হয়েছে এই ভাল, রবার্ট ব্রাউনিং-এর সঙ্গে বলা যাক ঈশ্বর আছেন স্বর্গে আর পৃথিবীতে যা হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে।"

দ্বিজেন এসে ঘরে ঢুকল। অলকা বইখানা রেখে দিয়ে জিগেস করলে, "এত দেরী? ডিনার তো সাড়ে আটটায় শেষ হয়ে গেছে।" দ্বিজেন কথার জবাব না দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে অলকার দিকে চেয়ে রইল। অলকা জিগেস করলে, "অমন করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?'

দ্বিজেন বললে, "তোমায়। তুমি সত্যি খুব সুন্দর।' তার কথাগুলো একটু জড়িয়ে আসছিল, অলকা তা বুঝতে না পেরে বললে, "তাই নাকি? সেটা বুঝতে এত সময় লাগল?" দ্বিজেন অলকার কাছে এসে তার মুখটা তুলে ধরলে, অলকা দূরে সরে গেল। দ্বিজেন জিগেস করলে, "কি হল?'

অলকা বললে, "তুমি মদ খেয়েছ?"

চেঁচিয়ে হেসে উঠে দ্বিজেন বললে, 'ও, এই কথা? হাঁ, খেয়েছি তাতে হয়েছে কি?"

"জিগেস করতে লজ্জা করছে না?"

"নিশ্চয় নয়। আমি মদ খাই না এ ধারণা তোমার কোথা থেকে হল? কোন্ ভদ্রলোকে মদ না খায়?"

"আমার বাবা খান না।"

"অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি, তাঁকে আমি ভদ্রলোক বলে মানতে প্রস্তুত নই।'

"কোন সাহসে তুমি এ কথা বল?"

"ক্ষমা প্রার্থনা করছি শ্রীমতী। আমি মদ খেয়েছি, খেয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতে খাব, ক'দিন তোমার ওপর একটু করুণা হয়েছিল তাই বাড়ার বাইরে, আর একটু কম করে খেয়েছিলাম, মদের ওপর এত ঘৃণা কেন?"

"যে কোন ভদ্রলোকের মেয়ে... " দ্বিজেনের ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ধারণা মনে পড়ে যেতে সে থেমে গেল।

দ্বিজেন বললে, "তোমরা আধুনিক হয়েছ, সাগরপারের মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চল, পুরুষকে ভয় কর না আর মদের নামে শিউরে ওঠ? লজ্জা হওয়া উচিত! অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ নেই, শোবে এস।" সে পকেট থেকে ফ্লাস্ক বার করে মদ খেতে আরম্ভ করলে। অলকা ঘর ছেড়ে চলে যেতে চেষ্টা করলে, বাধা দিয়ে দ্বিজেন জিগেস করলে, "কোথায় যাবে?"

'যেখানে হোক! অনেক চেষ্টা করেছি, আর নয়—তোমাকে মেনে নেওয়া যায় না। আমায় যেতে দাও।"

"অবনীর কাছে যাবে? তাই তো বলি হঠাৎ আসতে বাজি হলে কি করে? অবনী আসবে জানতে, না? না, তোমার যাওয়া হবে না। তুমি যে অবনীর কাছে গিয়ে বলবে তোমার দেহের পবিত্রতা বাঁচিয়ে ফিরে গিয়েছ, তা হবে না।" সে অলকার হাত ধরলে। অলকা জোর করে হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দ্বিজেন তার বিদেশী বেয়ারাকে ডাকলে, সে ঘরে আসতে জিগেস করলে, "তুমারা ইঁহা কৈ আওরাৎ মিলেগা? আচ্ছাওয়ালা?" বেয়ারাটা ঠিক বুঝতে পারলে না, ভাল হিন্দি জানেনা বলেই হোক আর নিজের শোনবার শক্তির উপর বিশ্বাস করতে পারছিল না বলেই হোক। সাহেব সে অনেক দেখেছে, অনেকে এ রকম প্রশ্নও করেছে কিন্তু তাদের কা'র সঙ্গে ও রকম মেম্‌ সাহেব ছিল না। তার জবাব দিতে দেরী হচ্ছে দেখে দ্বিজেন চীৎকার করে বললে, "এই শুয়ার কি বাচ্চা, হামারা বাৎ সমঝা হ্যায়?"

"জী হুজুর" বলে লোকটা চলে গেল। সে জানত এ সব ব্যবস্থা কর্ম্মচারীরা করে দেয়, তাই সে তাদের মধ্যে একজনের কাছে গেল। কথাটা শুনে ভদ্রলোক প্রথম বিশ্বাস করতে পারেন নি কিন্তু না করেও

উপায় নেই কাজেই যাকে বললে উপায় হয় তার খোঁজে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বিজেনের প্রার্থিত বস্তু তার ঘরে পৌঁছে দেওয়া হল।

খাসিয়া মেয়েটী দ্বিজেনের ঘরে ঢুকতে দ্বিজেন নেশার আমেজের মধ্যেও তাকে চিনতে পারলে; তার কাছে এসে জিগেস করলে, "তুমি? তুমি এ সময়ে এখানে কি করে এলে? আমি এসেছি জানলেই বা কি করে?"

খাসিয়া মেয়েটা বললে, "খবর আমাদের রাখতে হয়। মোহ কেটে গেলে তোমরা সরে দাঁড়াও আর বোঝা বইতে হয় আমাদের। আরও অনেকের মত মুখ বুজে তোমাদের অত্যাচার সহ্য করতে আমি রাজি নই।"

"কি করবে?"

"নিজে যখন সুখী হতে পারি নি তখন অন্ততঃ তুমি যাতে সুখী হতে না পার সে চেষ্টা করব।"

"সে কথা বলতেই কি এত রাত্রে এখানে এসেছিলে?"

"না তোমার নতুন আমদানি করা মেয়েটীকে দেখতে।"

"সে আমার স্ত্রী।"

"তাই নাকি? এক সময় আমারও তো ঐ পরিচয় দিয়েছিলে অনেক জায়গায়।"

"তোমার বলবার কিছু থাকতে পারে না, পয়সার অভাব তোমার কোনদিন রাখি নি।"

"পুরুষ মানুষের কাছে পয়সাটাই সব হতে পারে কিন্তু মেয়েদের কাছে সেটাই সব নয়। সে কথা তুমি বুঝবে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দ্বিজেন বললে, "বিয়ে করেছি সত্যি কিন্তু যাকে বিয়ে করেছি তাকে স্ত্রী বলে মেনে নিইনি, আর কোনদিন নিতেও পারব না। ও নিজেই চলে যাবে; বোধ হয় দু'এক দিনের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনবে।"

"তবে বিয়ে করেছিলে কেন ?"

"সে অনেক কথা, পরে বলব ; আজকের এমন রাতটা নষ্ট হতে দিও না।" দ্বিজেন মেয়েটীর হাত ধরে বিছানায় বসালে। দ্বিজেনের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে সে মেয়েটীর ব্যবহারে আশ্চর্য্য হত—আত্মরক্ষার প্রয়াস তার মধ্যে ছিল না কিন্তু আত্ম-বিক্রয়ের নির্লজ্জতাও ছিল না ; একটা বিতৃষ্ণার ভাব সে চেপে রাখতে পারছিল না।

দ্বিজেন আর এই খাসিয়া মেয়েটীর সম্পর্ক কর্ম্মচারীরা জানত। অন্তবার দ্বিজেন আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে হাজির হয় কিন্তু এবার এসেছে বলে তারা জানতে পারে নি তাই বেয়ারাটা খবর দিতে যে অনুচর এ সব কাজে বিশেষ দক্ষ তাকে বলতে হ'ল। সে ওখানকারই লোক, সব খবরই রাখে ; এই খাসিয়া মেয়েটী যে এসেছে তাও জানে আর সে যে ভয়ানক রকম রেগে আছে তাও জানে। সে ভদ্রলোককে মেয়েটীর কথা বলতে তিনি খুসী হয়ে তাকেই পাঠিয়ে দিতে বললেন।

খাসিয়া মেয়েটী প্রথম যেতে চায় নি তার মাও শুনে ভয়ানক রকম চটে গিয়েছিল কিন্তু কি মনে হতে সে রাজি হল। যাবার আগে তার মা'র কানে কানে কি বলে গেল, তার মা বেশ খুশী হয়ে উঠল। সেই ভদ্রলোকটী বা তার অনুচর কেউই এ সবের কোন অর্থ করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করলে না।

—ছাব্বিশ—

ভাগ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করার অবসাদ মানুষকে অনেক অসম্ভব কাজ করতে বাধ্য করে ; অন্য সময় যা সে কল্পনাও করতে পারে না, এ সময় বেশ সহজে তাই করে যায়। দ্বিজেনের সঙ্গে মানিয়ে চলবার আপ্রাণ

চেষ্টা অলকা করেছে ; অবনীকে ভোলবার চেষ্টাও করেছে, দ্বিজেন একটু সাহায্য করলে হয়তো তাদের বিবাহিত জীবন সুখেই কাটত কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাক দ্বিজেন যেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অলকার চেষ্টা ব্যর্থ করতে চেয়েছে। অলকা আশা করেছিল শেষ পর্য্যন্ত হয়তো সে জিতবে কিন্তু তারও সহ্যের একটা সীমা আছে। দ্বিজেন তাকে শেষ যে কথাগুলো বলে তা শুনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু সে বেয়ারাকে যা বললে তা শুনে তার অন্তরের সমস্ত কোমলতা, সমস্ত করুণা নিঃশেষে মুছে গেল, একটা বিজাতীয় রাগে সে প্রায় সমস্ত অন্ধকার দেখলে। কি যে তার করা উচিত খানিকক্ষণ তা ভেবে ঠিক করতে পারলে না, একটা কিছু তাকে করতে হবে, ভয়ানক একটা কিছু যাতে ওর মত অন্য পুরুষরা সাবধান হয়ে যায়, কিন্তু কিছু করবার মত শক্তি তার ছিল না। অনেক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, চাকরটা কাছে এসে দাঁড়াতে তার খেয়াল হল দ্বিজেন তাকে যে অপমান করেছে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে নিজেকে তার চেয়ে ঢের বেশী অপমান করছে। সে চাকরটাকে জিগেস করলে, "তুমি ষ্টেশন চেন তো?"

চাকরটা বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে বললে, "হাঁ চিনি মেমসাহেব।"

"আমার সঙ্গে চল।"

চাকরটা একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "এত রাত্রে ষ্টেশনে?"

"হাঁ, দরকার আছে।"

চাকরটা আর কোন কথা বলতে সাহস করলে না।

অলকা ঠিক যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থায় রাস্তায় নেমে এল। রাত্রের অন্ধকার, পথের নির্জ্জনতা, বিপদের কথা, দুর্ণামের ভয় কিছুই তার মনে হল না। এ ঘরে আর থাকা চলে না তাই পথে নামতে হবে, সে পথ সুগম না হলেও। সে নিজের মনে অসংলগ্ন সব কথা ভাবতে

ভাবতে চলছিল। চাকরটা বললে, "ষ্টেশনে তো এখন বিশেষ কেউ নেই, ওয়েটিং রুমের দরজাও বন্ধ।" অলকা কোন কথা বললে না। রাতটা ষ্টেশনে কাটিয়ে সকালের প্রথম গাড়ীতে উঠে বসবে—এ ক'ঘণ্টা কাটাতে তার কোন কষ্ট হবে না। আজ তার মনে হল সে বড় একা, আসামের এই ছোট্ট সহরটায় তাকে সাহায্য করবার মত কেউ নেই। তার মনের মধ্যে কে যেন ভীষণ প্রতিবাদ করে উঠল; সে চাকরটাকে জিগেস করলে, "ক'লকাতা থেকে যে সব লোক কুলিদের সাহায্য করতে এসেছেন তাঁরা কোথায় আছেন জান?"

এ প্রশ্নে লোকটা বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "জানি, আপনার সঙ্গে তাঁদের চেনা আছে?"

"আছে, আমায় সেখানে পৌঁছে দিতে পারবে?"

"কেন পারব না।"

চাকরটার নির্দ্দেশ মত একটা বাড়ীর সামনে এসে অলকা দাঁড়াল, সেখানে কা'র জেগে থাকার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অলকা ভাবলে ফিরে যায়—তার এ লাঞ্ছনার কথা অবনীকে জানান ঠিক হবে না কিন্তু সে ফেরবার আগেই চাকরটা দরজায় ভীষণ রকম ধাক্কা দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে অবনী জিগেস করলে, "কে?"

চাকরটা বললে, "শিগ্গির দরজা খুলুন।" অলকার ইচ্ছে করছিল ছুটে সেখান থেকে চলে যায় কিন্তু কে যেন তাকে জোর করে আটকে রেখেছিল, তার চলবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না।

দরজা খুলে অবনী সামনেই চাকরটাকে দেখলে, অন্ধকারের মধ্যে অলকাকে দেখতে পায় নি তাই জিগেস করলে, "কি চাই? এত রাত্রে দরজা ঠেলছ কেন?"

চাকরটা অলকার দিকে ফিরে বললে, "এ বাবুটীকে আপনি চেনেন

মেমসাহেব ?" অবনী কিছু বুঝতে পারলে না, এত রাত্রে তাকে ডাকলে অথচ তার কথার জবাব না দিয়ে কোন মেম্‌সাহেবের সঙ্গে কথা আরম্ভ করলে। এত রাত্রে কোন মেম্‌সাহেব তার কাছে এলেন আর কেনই বা এলেন তা সে বুঝতে পারছিল না। অলকা চাকরটাকে বললে, "হাঁ, তুমি যাও।" অলকার গলা শুনে অবনী চমকে উঠল। বিদেশে, এত রাত্রে অলকা তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এ কথা সে কি করে বিশ্বাস করে? সে অলকার কাছে গিয়ে জিগেস করলে, "তুমি?" অলকা বললে, "হাঁ, চিনতে পারছ না?" সে ঘরের ভেতর গেল, তার পিছনে অবনী এসে ঘরে ঢুকল; চাকরটা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবনী জিগেস করল, "ব্যাপার কি? ও লোকটা কে? তোমাদের চাকর?"

অলকা শুধু বললে, "হাঁ।"

"তুমি এখানে এসেছ দ্বিজেন নিশ্চয় জানে না?"

"না।"

"হাঁ, না ছাড়া কি আর কোন কথা জান না? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

"ভয় করছে?"

"করলে বোধ হয় অন্যায় হয় না! তুমি বিবাহিতা, স্বামীর অনুমতি না নিয়ে এসেছ। আমার মত অনাত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করবার এটা ঠিক উপযুক্ত সময় বা যায়গা নয়।"

"অর্থাৎ যদি কেউ দেখতে পায়, এই তো? সে ভয়টা আমারই বেশী হওয়া উচিত নয় কি? তা সত্ত্বেও আমি এসেছি।" একটু খানি চুপ ক'রে থেকে বললে, "স্বামীর অনুমতির কথা জিগেস করছিলে? যাকে বিয়ে করেছি তাকে স্বামী বলে স্বীকার করতেই হবে, না?"

"একটু স্পষ্ট করে বলবে?"

একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ে অলকা বললে, "কিছুই কি বুঝতে পার নি ?"

"না।"

"বেশ তা হলে স্পষ্ট করেই বলছি, "স্বামী নামক জীবটাকে ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি।"

"স্বামীকে ছেড়ে এসেছ ? তুমি ? অলকা ?" তার কথাব মধ্যে অনেকখানি বিস্ময়, অনেকখানি সন্দেহ প্রকাশ পেল।

"হঠাৎ আসিনি। এ ক'দিন ধরে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, নিজের সত্ত্বাব সঙ্গে বিরোধ করে চেষ্টা করেছি, স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে চলবার ; ভেবেছিলাম শেষ পর্য্যন্ত জিততে পাবব কিন্তু তা হল না। দেখলাম একদিকে শুধু জড়তা থাকলে অন্যদিকের প্রাণশক্তি তাকে চৈতন্য দিতে পারে না—জড়তা শুধু দেহের নয়, মনেরও। তাই চলে এলাম ; অন্যায় করেছি কি ?"

একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ না করে অবনী বললে, "হাঁ, অন্যায় করেছ।"

"তুমি বলছ অন্যায় করেছি ? যদি জানতে এই ক'দিন কি সহ্য করেছি তাহলে বলতে পাবতে না।" তার স্বর আর্ত্ত হয়ে উঠল, একটু থেমে বললে, "এ ছাড়া আর একটী মাত্র উপায় ছিল—আত্মহত্যা করা কিন্তু তা পারি নি। কেন করব ? আমার দোষ কি ? একজন আমায় ভুল বুঝে মুক্তি দিলে ; তার ওপর প্রতিশোধ নিতে আর একজনের কাছে ধরা দিলাম, সে করলে অপমান—অপরাধ আমার ?"

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে অবনী বললে, "অপরাধ তোমার কি আর কা'র সে কথা তুলে এখন আর লাভ নেই। যে পথ তুমি নিজে বেছে নিয়েছিলে তার জন্যে দায়ী তুমি একা।"

"তা জানি তাই সহ্যও করেছি এতদিন, কিন্তু সে পথ যদি ভুল হয় তাহলেও তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে ?"

"তাছাড়া কি করবে? তুমি হিন্দুর মেয়ে . "

বাধা দিয়ে অলকা বললে, "তোমার পায়ে পড়ি সতীত্বের সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিও না, ও সব কথা আমারও কিছু জানা আছে।"

"বক্তৃতা আর যেখানেই দি, তোমার কাছে দেব না।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ্ করে রইল; অলকা অবনীর টেব্লের কাগজ পত্রগুলো নাড়তে লাগল। অবনী জিগেস করলে, "এখন কি করবে?"

"তুমি বলে দাও না, তাই তো তোমার কাছে এলাম।" খুব আস্তে আস্তে অলকা বললে।

"তাহলে আরও আগে আসা উচিত ছিল।"

"সময় পাই নি। ও যে অতটা নীচ তা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না।"

অবনী যেন তার কথা শুনতেই পায় নি এমনভাবে বললে, "আমি যা বলব করতে পারবে?"

"বল, শুনি" অলকার কথার মধ্যে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

অবনী সহজ, শান্তভাবে বললে, "তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও।"

জমা করা পেট্রোলে আগুন লাগার মত ফেটে পড়ে অলকা বললে, "তুমি কি বলছ? সে মাতাল, সে····· "

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অবনী বললে, "জানতাম পারবে না।"

"সে চরিত্রহীন, আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে বাড়ীতে স্ত্রীলোক আনতে বলে।"

"বেশ তাহলে তোমার বাবার কাছেই যাও, আমি যা বলেছি তিনিও হয়তো বলবেন।"

"না, বলবেন না। তিনি আমায় ভালবাসেন, তাঁর কাছে আমার দাম

আছে ; যদি তোমার কাছে আমার একটুও দাম থাকত তাহলে আজ এমনি করে আমায় তাড়িয়ে দিতে পারতে না।" অলকার গলা ভারি হয়ে এল ; সে টেবিলের ওপর মাথা রাখলে।

অবনী বললে, "আমার কাছে তোমার দাম আছে কিনা সে কথা তুলে আজ আর লাভ নেই। আমাদের সব হিসেব মিটে গেছে, সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে—আজ তুমি আর একজনের স্ত্রী।"

মুখ তুলে অলকা জিগেস করলে, "সে কথা কি ভুলতে পার না ?"

দৃঢ়তার সঙ্গে অবনী বললে, "না"

"আমি একজনের স্ত্রী, আমি ভুলতে পারি, আর কা'র স্বামী না হয়েও তুমি পার না ?"

এবার অবনীর কথায় আবেগের চিহ্ন ফুটে উঠল ; সে বললে, "তুমি কি বলছ অলকা ? তোমার মাথার ঠিক নেই। আজকের রাতের কথায় তুমি কাল সকালে মুখ দেখাতে পারবে না। তুমি ভুল করছ, ভয়ানক ভুল করছ . আমি যদি তোমায় আরও ভুল করবার সুযোগ দি তাহলেই কি প্রমাণ হবে আজও আমার কাছে তোমার দাম আছে ?"

"আর ভুল করতে চাই না , যে ভুল করেছি তার ভারই অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমায় আর ভুল করতে দিও না।" অলকার কথাগুলো কান্নার চেয়ে করুণ হয়ে উঠল।

অবনী নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললে, "তাইতো বললাম তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও।"

"তাতে আমায় আরও ভয়ানক রকম ভুল করতে বাধ্য করা হবে . সেখানে আমি এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারব না। আজ তুমি এখানে ছিলে তাই তোমার কাছে এলাম ; যেদিন তুমি এখানে থাকবে না সেদিন আমি কোথায় দাঁড়াব ?" অলকা অবনীর কাঁধে হাত রাখলে ; অবনী আস্তে

আস্তে তার হাত নামিয়ে দিয়ে বললে, "এ প্রশ্নের জবাব দেবার আজ আর আমার উপায় নেই।"

"কেন উপায় নেই ?" অলকার কথাগুলো অনুনয়ের মত শোনালো।

অবনী কোন জবাব দিলে না। অলকা অবনীর কথাগুলো আর একবার ভেবে নিলে। তার আজকের সমস্ত আচরণটার সঙ্গে তার কথাগুলো মিলিয়ে মনে হল অবনী এতক্ষণ ধরে তাকে যা বোঝাতে চেয়েছে সে তা বোঝে নি। তার মনে হল অবনীর এখন আর উপায় না থাকার কারণ হচ্ছে মলিনা, সে আর কিছু বললে না। সে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে অবনী বললে, "চল তোমার পৌঁছে দিয়ে আসি।"

শ্লেষের সঙ্গে অলকা বললে, "অতটা দয়া না করলেও চলবে। একদিন হয়তো মনে পড়বে আমি একটু আশ্রয় ভিক্ষে করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলে।" খুব তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে গেল, হয়তো তার চোখে জল এসেছিল অবনীকে সেটা দেখতে দিতে চায় নি তাই।

সে ঘর থেকে চলে যেতে অবনীর মনে হল কাজটা ভয়ানক অন্যায় হয়েছে, এই অন্ধকার রাত্রে, অচেনা জায়গায় তাকে একা যাবার সুযোগ দেওয়া মোটেই উচিৎ হয় নি। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তাকে অনুসরণ করবে বলে কিন্তু বেশীদূর যাবার আগেই একজন তার সামনে এসে জিগেস করলে, "অবনীবাবু তো ?" অবনী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে, "হাঁ, কি চাই বলুন, আমার একটু কাজ আছে।"

"শিগগির চলুন, মজুমদার সাহেবের বাড়ী।"

"কেন ? সেখানে কেন ? আপনি কে ?"

"কুলিরা মজুমদার সাহেবের বাড়ী ঘেরাও করেছে, তাদের ফেরান যাচ্ছে না, পুলিশ এসে পড়বার আগে আপনি গিয়ে যদি তাদের না ফেরান, তাদের মধ্যে অনেকেই ভয়ানক বিপদে পড়বে।"

"শ্রমিকরা ঘেরাও করলে কেন জানেন ?"

"বিশেষ কিছু না, চলুন দেবী কববেন না।"

অলকাকে তার ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে অবনীকে তার স্বামীর সাহায্যে যেতে হল।

—সাতাশ—

খাসিয়া মেয়েটীর মা মেয়ের উপদেশ মত খাণিকক্ষণ অপেক্ষা করে রটিয়ে দিলেন দ্বিজেন তাঁব মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত কুলি বস্তিতে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। একে তাবা দ্বিজেনের ওপব মর্মান্তিক চটেছিল তার ওপর কেউ কেউ তাদের বুঝিয়েছিল দ্বিজেনের পরামর্শেই পুলিশ তাদেব ওপব সেদিন বিকেলে লাঠি চালিয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে ক'জন আহত হয়েছে, ক'জন হাজতেও গিয়েছে, এব পব আর অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করবার মত শক্তি তাদের ছিল না—এ বারুদেব স্তূপে আগুন দিলে দ্বিজেনের নারী-হবণেব খবর। একটী মেয়েকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শুনলে প্রত্যেক পুরুষেরই রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে তা সে শিক্ষিতই হোক আর অশিক্ষিতই হোক, তফাৎ কেবল তার প্রকাশে। শিক্ষিত সম্প্রদায় যেখানে সভ্য উপায়ে শাস্তি বিধান করবার জন্যে অপেক্ষা করে, অশিক্ষিত সম্প্রদায় সেখানে সভ্য সমাজের আইন, আদালত ভুলে অন্যায়ের শাস্তি বিধান করে বর্ব্বর যুগের আদিম উপায়ে। শিক্ষিত সমাজ অন্য বিষয়ে এদের সভ্যতার অভাবে শিউরে উঠলেও এ বিষয়ে অন্তর থেকে তাদের শ্রদ্ধা করে, যদিও ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারে না নিজেদের ভেতরকার বর্ব্বরতা প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে।

খবরটার মধ্যে কিছু সত্যি আছে কিনা, মেয়েটী কে, কে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে, কি করে কথাটা রটল এ নিয়ে সভ্য সমাজের মত তারা গবেষণা করলে না; কোন সভা করে প্রস্তাব করবার দরকার মনে করলে না, অল্প সময়ের মধ্যে দলে দলে কুলি এসে দ্বিজেনের বাড়ীর চারদিকে জমা হ'ল দ্বিজেন জানতেও পারলে না, জানবার মত অবস্থাও তার ছিল না কিন্তু সেই মেয়েটী জানতে পেরেছিল আর প্রতিহিংসার পৈশাচিক আনন্দে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কিন্তু লক্ষ্য করবার মত অবস্থা দ্বিজেনের ছিল না, থাকলেও বোধ হয় বুঝতে পারত না। ভীষণ ষড়যন্ত্র করে, চরম শাস্তি পাবার জন্যে এগিয়ে দেবার মুহূর্ত্তেও প্রেমের অভিনয় করতে পারে শুধু নারী—এই মেয়েটীই মানুষের ইতিহাসে তার প্রথম দৃষ্টান্ত নয়।

জনতা যখন ক্ষেপে ওঠে তখন তাকে দিয়ে অন্যায় করানোর মত সহজ আর কিছু হতে পারে না, যে কোন লোক সে সময় তাদের নেতা হতে পারে। কে একজন বললে, "এ রকম করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, ও আমাদের ওপর অনেকদিন ধরে অত্যাচার করেছে, আজ শাস্তি দেবার সুযোগ পেয়েছি, দেরী করলে হয়তো সব নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে ডাক, দরজায় ধাক্কা দাও।" সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মিলে দরজায় ধাক্কা দিলে। খাসিয়া মেয়েটী দ্বিজেনকে বললে, "বাইরে কিসের গোলমাল হচ্ছে, কারা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।"

দ্বিজেন বললে "দুনিয়ায় ওরকম অনেক গোলমাল সব সময় হচ্ছে, তাতে তোমার আমার কি?" দরজায় আবার ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ হ'ল, মেয়েটী জানলা দিয়ে দেখার অভিনয় করে বললে, "একি? চা-বাগানের কুলিরা তোমার বাড়ী ঘেরাও করেছে।" দ্বিজেন টেবিলের টানা খুলে তার রিভলভার নিয়ে নেমে গেল, মেয়েটী জানলায় এসে দাঁড়াল।

দ্বিজেন দরজা খুলতে তার হাতে রিভলভার দেখে জনতা পেছিয়ে গেল।

যদিও তার গায়ের রং সাদা নয়, তবুও দ্বিজেনের নেশা কেটে গেল, বোধ হয় সাহেবিয়ানা করে আর সাহেবদের জন্মভূমি দেখে এসেছে বলে। সে জিগেস করলে, "এর মানে কি? তোমরা কি চাও? যদি এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে চলে না যাও ."

একজন এগিয়ে এসে বললে, "আমাদের ঘরের মেয়ে ধরে এনেছ, জোর করে আটকে রেখেছ, তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি……" দ্বিজেন তাকে লাথি মারলে, সে পড়ে গেল। আর একজন এগিয়ে এল, দ্বিজেন তাকেও লাথি মারলে, উন্মত্ত জনতা তার দিকে ছুটে এল, ঠিক সেই সময় অবনী আর তার সঙ্গী এসে পৌঁছল। দ্বিজেনের হাতে রিভলভার দেখে অবনী ছুটে তার কাছে আসতে চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না তাই চেঁচিয়ে বললে, "দ্বিজেন কি করছ?" জনতা একবার পিছন দিকে তাকালে, সেই অবসরে একজন এগিয়ে এসে দ্বিজেনের মুখে ঘুঁষি মারলে, দ্বিজেন আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়লে। অবনী তার পাশে এসে বললে, "কি করছ? থাম।"

"চুপ কর, তোমার উপদেশ আমি চাই না।"

"তুমি পাগল হয়েছ? ঐ ক'টা গুলিতে ক'জন মরবে? তার পর কি করবে?" জনতা একটু পেছিয়ে গিয়েছিল; তার মধ্যে থেকে সেই খাসিয়া মেয়েটীর মা বললে, "আমার মেয়ে এ বাড়ীতে আছে। ও তাকে আটকে রেখেছে।" জনতা আবার এগিয়ে এল। অবনী তাদের উদ্দেশ করে বললে, "তোমরা নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা করছ। যদি তোমাদের কা'র মেয়েকে উনি ধরে এনেই থাকেন তাহলে তাকে উদ্ধার করবার কি আর কোন উপায় নেই? তোমরা জনকতক আমার সঙ্গে এস, বাড়ী খুঁজে দেখবে।"

দ্বিজেন বললে, "তুমি বেরিয়ে যাও রাস্কেল। যে এগুবে তাকে গুলি করব।"

জনতা আবার এগিয়ে আসতে লাগল, দ্বিজেন আবার আগের মত গুলি ছুঁড়লে। অবনী বললে, "তোমরা এগিও না, ফিরে যাও, আমি তোমাদের·· "

তার কথার শেষটা শোনা গেল না, জানলা থেকে খাসিয়া মেয়েটী জনতাকে এগিয়ে আসতে বললে তাকে উদ্ধার করবার জন্যে, জনতা চীৎকার করে উঠল। অবনী দ্বিজেনকে বললে, "ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও, পুলিশকে ফোন্ কর।" তাদের পাশ থেকে একজন চেঁচিয়ে বললে, "সাবাস্ অবনীবাবু। শ্রমিক নেতা হয়ে শ্রমিকের বিপক্ষে পুলিশ ডাকতে উপদেশ দিচ্ছেন! আপনিই না ব্রজেশবাবুকে শ্রমিকের শত্রু বলেছেন? তোমরা শোন। তোমাদের বন্ধু·· ··" তাকে কথা শেষ করতে হল না, জনতা অবনী আর দ্বিজেনকে ঘিরে ফেললে। দ্বিজেন বাদবাকি গুলিগুলো. ছুঁড়লে, অবশ্য ওপর দিকে; কাউকে গুলি করতে সে চায় নি, চেয়েছিল ভয় দেখাতে। জনতা প্রত্যেকবার একটু করে পেছিয়ে গেল, আবার এগিয়ে এল। গুলি শেষ হয়ে যেতে দ্বিজেনের খেয়াল হল তার বিপদের কথা! তখন আর কোন উপায় নেই তবু শেষ চেষ্টা করে দেখবার জন্যে দ্বিজেন বললে, "যে মেয়েটী আমার বাড়ীতে আছে তাকে জিগেস কর সে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে কিনা " মেয়েটী তখন তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বললে, "মিথ্যে কথা, আমায় জোর করে আনা হয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেনের মাথায় লাঠির ঘা পড়ল, দ্বিজেন বসে পড়ল, অবনী তাকে তোলবার চেষ্টা করতে জনতা তাকে আক্রমণ করলে, পিছনে পুলিশের লরি এসে দাঁড়াল। একজন ইন্সপেক্টার আর ক'জন বন্দুকধারী পুলিশ নেমে জনতাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুললে। ইন্সপেক্টার বললেন, "এ জনতা বে-আইনী, যদি এক মুহূর্তে তোমরা চলে না যাও, আমরা গুলি করতে বাধ্য হব।" জনতা অদৃশ্য হতে সময় লাগল না। ইন্সপেক্টার বললেন, "দেখলেন অবনীবাবু এদের ক্ষেপিয়ে তোলার ফল?"

অবনী বললে, "দেখলাম কিন্তু এখন সে আলোচনা করবার সময় নেই, দ্বিজেনবাবু জখম হয়েছেন, তাঁর ব্যবস্থা করতে হবে।" ইন্সপেক্টারের আদেশে সেপাইরা দ্বিজেনকে নিয়ে গিয়ে লরিতে তুললে, অবনীকেও সেইসঙ্গে যেতে হল। খাসিয়া মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

লরিতে উঠে ইন্সপেক্টার একজন লোককে দেখিয়ে বললেন, "ভাগ্যিস এ ভদ্রলোক খবর দিলেন। ইনি হচ্ছেন একটা বাগানের ম্যানেজার।"

ম্যানেজারটা বললেন, "কি করে জানব মশায় এ রকম কাণ্ড হবে। আমার এক চাকর এসে খবর দিলে দ্বিজেনবাবু কোন মেয়েকে আটকে রেখেছেন বলে কুলিরা তাঁর বাড়ী ঘেরাও করেছে। বিশ্বাস করি নি, ও মেয়েটা তো আর এই প্রথম দ্বিজেনবাবুর কাছে যাচ্ছে না।"

অবনী বললে, "তবে যে সে বললে ওকে দ্বিজেন জোর করে ধরে এনেছে?"

ইন্সপেক্টার বললেন, "ও শ্রেণীর মেয়ে সব পারে।"

অবনী বললে, "কিন্তু কেন? হঠাৎ এ রকম করবার কারণ কি?"

ইন্সপেক্টার হাসতে হাসতে বললেন, "কারণ খুব সোজা! দ্বিজেনবাবুর স্ত্রীর ওপর ঈর্ষ্যা। আশ্চর্য্য হচ্ছি ও রকম সুন্দরী স্ত্রী থাকতে এদের এ রকম জঘন্য প্রবৃত্তি হয় কি করে?" দ্বিজেনের জ্ঞান ফিরে আসছে বলে এ প্রসঙ্গ এখানেই থেমে গেল।

ডাক্তার দ্বিজেনকে পরীক্ষা করে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই বলেই মনে হয় তবে ঘণ্টা কতক হাসপাতালে থাকা দরকার।" দ্বিজেন বাড়ী ফিরে যেতে চাইলে, ইন্সপেক্টার বললেন, "আপনাকে এখন সেখানে ফিরে না যাবার জন্যে অনুরোধ করছি, আপনি সেখানে গেলে যে কোন সময় তারা আবার ক্ষেপে উঠতে পারে। আপনি একটা এজাহার লিখিয়ে দিয়ে কাল ক'লকাতায় ফিরে যান, মকর্দ্দমার সময় আবার আসবেন।"

দ্বিজেন আপত্তি করে বললে, "তা কি করে হয়? আমার এখনও এখানে অনেক কাজ রয়েছে।" কাজ তার বিশেষ কিছু ছিল না কিন্তু মনে পড়ে গেল অলকা রাগ করে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আ গোলমালের সময় তাকে দেখা যায় নি। তার কোন খবর না পেলে ক'লকাতায় ফিরে যাওয়া অসম্ভব। ইন্‌সপেক্‌টার বললেন, "আপনি এখন এখানে থাকলে কাজ তো হবেই না বরং অকাজ হবার সম্ভাবনা বেশী। আমার মনে হয় অবনী বাবুকেও ফিরে যেতে হবে।"

অবনী বললে, "আমার এখানে থাকবার আর কোন দরকার নেই, যারা আমায় এখানে নিয়ে এসেছিল তারা আমায় আর চায় না। আজ সকালেই চলে যাব ভেবেছিলাম।"

ইন্সপেক্‌টার বললেন, "আপনি নিষেধাজ্ঞাটা মেনে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, আপনি যখন অশান্তি সৃষ্টি করতে চান নি আশা করেছিলাম ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াবে না। নিন দ্বিজেন বাবু এজাহারটা দিয়ে দিন।"

দ্বিজেন তার বক্তব্য শেষ করবার পর অবনীর কাছ থেকেও একটা বৃত্তান্ত আদায় করে নেওয়া হল। ইন্সপেক্‌টার দ্বিজেনকে জিগেস করলেন, 'আপনার স্ত্রী কোথায়? তিনিও নিশ্চয় অনেক কিছু বলতে পারেন।"

দ্বিজেন একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "তিনি সে সময় সেখানে ছিলেন না।"

'কোথায় ছিলেন অত রাত্রে?"

"তা ঠিক বলতে পারি না।"

"বলেন কি? তিনি কিছু বলে যান নি? কখন গিয়েছেন? বেশ ভাবনার কথা! খোঁজ করা দরকার।"

"হাঁ, ক'লকাতা যেতে না চাওয়ার এটাও একটা কারণ।"

"নিশ্চয়। তিনি কখন গেছেন জানেন?"

"ঘটনার একটু আগে।"

ইন্সপেক্‌টার কি ভাবলেন তারপর ষ্টেশনে ফোন্ করতে উঠে গেলেন। অবনী ভাবছিল বলে, ফোন করবার দরকার নেই, সে সেখানেই আছে কিন্তু সে যে অংশকার সম্বন্ধে কিছু জানে তা দ্বিজেনকে জানতে দিতে চাইলে না; তাছাড়া তার মনে হল পথেও সে কোন বিপদে পড়ে থাকতে পারে। ফোন্ করে এসে ইন্সপেক্‌টার বললেন, "হাঁ, তিনি ষ্টেশনেই আছেন।"

দ্বিজেন জিগেস করলে, "তাঁকে কিছু বলেছেন?"

ইন্সপেক্‌টার বললেন, "না, আমার দরকার ছিল তাঁর খবর নেওয়া। আচ্ছা, আমি এখন চললাম। অবনী বাবুও চলুন না বাকি ক' ঘণ্টার মত আমার অতিথি হবেন, মানে আমার বাড়ীতে, থানায় নয়।" তিনজনেই হেসে উঠল, অবনী বললে, "এখানেই থাকি না। দ্বিজেন একা থাকবে।"

"আপনারা যে পরস্পরকে চেনেন তা ভুলে গিয়েছিলাম।" বলে ইন্সপেক্‌টার চলে গেলেন। জন কতক সেপাই হাসপাতালের বাইরে রইল।

দ্বিজেন বললে, "তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত অবনী; আমি ভেবেছিলাম কলিদের এ বাঁদরামোর প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে।"

অবনী বললে, "শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি আর তাদের বাঁদরামোর প্রতি সহানুভূতি এক নয়।"

"আসল কথা কি জান? ওদের সঙ্গে তোমার আমার মিশ খায় না, খেতে পারে না: দেখলে তো তোমায় অভ্যর্থনা করবার জন্যে দেশশুদ্ধ লোক ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হল, অথচ শয়তানি করবার সময় তোমায় পাত্তাই দিলে না।"

"তার একটা কারণ আছে; আমার বিপক্ষে একজন ওদের উত্তেজিত করছে। তুমি হয়ত শোন নি জনতার মধ্যে একজন ব্রজেশ দত্তর নাম করেছিল।"

"মনে নেই, সে লোকটা কে?"

"একজন মস্ত বড় শ্রমিক নেতা; নির্ব্বাচনে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আমি জিতেছি। তাছাড়া তাঁর বিপক্ষে অনুসন্ধান করবার ভার আমার আর ক'জনের ওপর পড়েছে।"

"সে জন্য তিনি তোমাকে এখানে পর্যন্ত খাওয়া করেছেন?"

"না তিনি নয়, তাঁর অনুচররা।" কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করে থাকার পর দ্বিজেন বললে, "একটা কাজ করবে?"

'কি?'

'অলকাকে আসতে ফোন্ করবে?"

একটু সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে চেয়ে অবনী বললে, "তুমি ফোন করলেই ভাল হয় না কি? আমি ফোন্ করলে সে মোটেই সন্তুষ্ট হবে না।'

হাসতে হাসতে দ্বিজেন বললে, "ঠিক জান?"

"জানি।

দ্বিজেন একটু গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি হাসপাতালে জানিয়ে যদি তুমি ফোন্ কর তাহলে হয়তো আসতেও পারে, আমি ফোন্ করলে আসাতো দূরের কথা, ষ্টেশন থেকেও হয়তো চলে যাবে।"

"বেশ তো অত ব্যস্ত কেন? এক গাড়ীতেই তো কাল ফেরা হবে। সে নিশ্চয় ক'লকাতায় যাবে।"

"বিশ্বাস নেই। আজ তোমায় সব কথা বলছি। তার সঙ্গে ঠিক ভাল ব্যবহার আমি কোনদিন করিনি, কারণটা অবশ্য বুঝতে পারছ। এখন মনে হচ্ছে অন্যায় করেছি। সে যদি সত্যিই বিয়ের পরও তোমায় ভালবেসে থাকে তাহলেও আমার চেয়ে বেশী অন্যায় করে নি। আমার সন্দেহ যদি ঠিক হ'ত তাহলে সে আমার কাছ থেকে তোমার কাছে যেত, ষ্টেশনে গিয়ে বসে থাকত না।"

সত্যি কথা গোপন করা অন্যায় জেনেও অবনী বলতে পারলে না অলকা তার কাছে গিয়েছিল ; এ টুকু মিথ্যাচারের জন্যে যদি কোন শাস্তি পেতে হয় তাতে সে রাজি আছে। দ্বিজেনের এ বিশ্বাসে আঘাত করার অর্থ হচ্ছে তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদটা চিরস্থায়ী করে দেওয়া। অবনী বললে, "আচ্ছা আমি ফোন্ করছি।"

অলকাকে ফোনে পেয়ে অবনী বললে, "এখনি হাসপাতালে চলে এস, দ্বিজেন আহত হয়ে সেখানে রয়েছে।"

আশ্চর্য্য হয়ে অলকা জিগেস করলে, "কি করে আহত হল ?"

"সে অনেক কথা, পরে শুনবে। একটা কথা বলে দি আমার কাছে গিয়েছিলে সে কথা তাকে বোল না।"

"নিজের লাঞ্ছনা ঢাক পিটিয়ে বেড়াতে আমার লজ্জা করে।"

"একা আসবে কি করে ?"

"যাবার দরকার আছে কি ?"

"আছে, সে তোমায় খুঁজছে ; তার ভুল শোধরাবার সুযোগ দাও। লোক পাঠাব কি ?"

"না, যার সঙ্গে তোমার কাছে গিয়েছিলাম সে আমার কাছে আছে ; সকলের চেয়ে আজ সেই চাকরটাই আমার বড বন্ধু হয়েছে।"

অবনী ফিরে আসতে দ্বিজেন জিগেস করলে, "কি বললে ? আসবে না ? আমারও মনে হয়েছিল··· "

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অবনী বললে, "না, সে আসছে ; পার তো একটু অভিনয় কোর।"

"না, আর অভিনয় করতে চাই না ; অভিনয় করে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী হয়। এবার থেকে স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটাবার

চেষ্টা করব। অলকার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে যা উপেক্ষা করা যায় না ; তুমি পারলে কি করে ?"

"সেই আমাকে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছে।"

"বিয়ের পর থেকে ওকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছি কিন্তু কোথায় যেন বেধেছে। হয়তো এই রকম দুর্ঘটনাই আমি চেয়েছিলাম যাতে তার আমার মধ্যে ব্যবধানটা ঘুচে যায়।" অবনী ভাবলে কিছুক্ষণ আগে তার সত্যি কথা গোপন করা সার্থক হয়েছে। অলকার সঙ্গে অতখানি রূঢ় ব্যবহার না করলে সে এমনি করে তার স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারত না।

অলকা আসতে অবনী সেখান থেকে সরে গেল। দ্বিজেন বললে, "অবনীর প্রতি অন্যায় করেছিলাম, ক্ষমা চেয়েছি, তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছি তার জন্যে ক্ষমা চাইতে আমার সাহস হয় না।"

অলকা বললে, "সাহস করে দরকার নেই। কি হয়েছে বল, অবনী বাবু তো কিছুই বললেন না।"

"নেহাত তোমার সিঁদুর পরা বরাতে আছে তাই বেঁচে গেছি।' সে সমস্ত ঘটনাটা অলকাকে বললে। অলকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "এখানে আর থাকবার দরকার নেই।"

"হাঁ, কালই ফিরছি ; তাছাড়া এ চাকরীও ছাড়তে হবে।"

"কেন ?"

"মকর্দ্দমা হলে এ সব কেলেঙ্কারী চাপা থাকবে না, তারপর এ কাজে কোম্পানী আর আমায় রাখতে পারবে না।"

"কাজ না করলেও আমাদের পয়সার অভাব হবে না আর হলেও তাতে দুঃখ নেই। তোমাকে যে পেয়েছি এইটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"আর তোমাকে পাওয়াটা কি আমার কাছে কিছুই নয় ?" দ্বিজেন অলকার হাত ধরলে ; ঠিক সেই সময় একজন নার্স ঘরে এসে ফিরে

যাচ্ছিল ; দ্বিজেন বললে, "আমি বেশ ভালই আছি, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।" নার্স হাসতে হাসতে চলে গেল।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

—আঠাশ—

অলকা-দ্বিজেনের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যেতে অবনীর বোধ হল তার মন থেকে একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল ; অলকার সম্বন্ধে তার যেন একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ব এসে গিয়েছিল। সে বেশ জানত অলকার প্রতি সে কোন অন্যায় ব্যবহার করেনি তবু তার ভবিষ্যতের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছিল না। সকাল বেলা অলকা তার কাছে এসে জিগেস করলে গুলি ছোঁড়ার জন্যে দ্বিজেনের কি শাস্তি হতে পারে। অবনী জানালে যেখানে আত্মরক্ষার অন্য উপায় নেই সেখানে আক্রমণকারীর জীবন হানি করেও নিজেকে বাঁচান যায়, এ ক্ষেত্রে তো কেউ মরে নি। অলকা নিশ্চিন্ত হল। ফেরবার সময় দ্বিজেন অবনীকে তাদের সঙ্গে এক কামরায় আসতে বললে, অবনী এর জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল ; দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দেখিয়ে বললে, "তোমাদের সঙ্গে তো যেতে দেবে না, তোমাদের সাদা টিকিট।"

অবনী প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তার বিপক্ষে একটা মামলা ঝুলছে। ক'লকাতায় ফিরে তার সব মনে পড়ল। মিষ্টার সেনের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, "এবারও কাগজে ভুল খবর ছাপিয়েছে নাকি ?" অবনী ট্রেনেই কাগজ পড়েছিল, বললে, "না, সেই জন্যেই তো সেখান থেকে চলে এলাম ; পালিয়ে আসাও বলতে পারেন। আমার মনে হয় ব্রজেশ দত্তর অনুচররা এর মধ্যে আছে, মানে আমার বিপক্ষে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলার মধ্যে।"

মিষ্টার সেন বললেন, "ব্রজেশ দত্তর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঠিক তার হাত আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে কি করে আগে থেকে জানবে যে তুমি ঐ রাত্রে ওখানে যাবে আর শ্রমিকরা তোমার কথা শুনবে না?"

"একজন এসে আমার বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যায়; তাকে আমি চিনি না। তখন কোন সন্দেহ হয়নি কিন্তু এখন ভাবছি সে আমায় ডাকতে এসেছিল কেন? সেখানকার শ্রমিকরা আমায় এত বেশী চিনত না যে আমার কথায় শান্ত হতে পারত বরং যে ডাকতে এসেছিল সে জানত সে সময় আমি তাদের সংযত করতে গেলে তারা ক্ষেপে উঠবে।"

"যাক্, তাতে তোমার বিশেষ ক্ষতি হয় নি, অন্ততঃ এর ফলে যদি ঘাড় থেকে ভূত নেমে যায়···।"

"ব্রজেশ দত্তর ব্যবস্থা কি করছেন বলুন? ভূত যদি নামে, তাকে জব্দ করাতে পারলেই নামবে, নইলে নয়।"

"তোমার মামলা আদালতে উঠুক, দেখা যাক্ কি হয়। তাছাড়া তোমরাও তো অনুসন্ধান কমিটি তৈরী করেছ।"

"তাতে আর কি হবে? আমরা ওকে না হয় শ্রমিক সঙ্ঘ থেকেই তাড়ালাম, তারপর?"

"তারপর? দেখা যাক কি হয়।" অবনী বুঝলে মিষ্টার সেন সব কথা বলতে চাইছেন না। সেও আর জানবার চেষ্টা করলে না।

মালতী অবনীকে ব্রজেশের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন অবনী মিষ্টার সেনকে যে সব কথা জানিয়েছিল। মিষ্টার সেন তখন বিশেষ কোন আগ্রহ দেখান নি; সে চলে যেতে তিনি পুলিশের এক বড় অফিসার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলেন যাতে পুলিশ ভেতরে, ভেতরে খোঁজ ক'রে দেখে কথাগুলো সত্যি কিনা। তাঁকে বসতে বলে সেই অফিসার একজন সহকারীকে ডেকে

পুরোণ কাগজপত্র দেখতে বললেন; ক'মিনিটের মধ্যে পলাতক স্থরেন ঘোষের সম্বন্ধে সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া গেল। ব্রজেশ দত্তই স্থরেন ঘোষ কিনা সে বিষয় খোঁজ করবার বন্দোবস্ত হয়ে যেতে মিষ্টার সেন অবনীর মামলার পেছনে ব্রজেশের কীর্ত্তির কথা তাঁকে জানালেন। ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে এ রকমের ঘটনা আর কখন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে অবনীবাবুর বিপক্ষে মামলা তুলে নেওয়াই দরকার। আপনার সেই সংবাদদাতাটীকে তার কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলুন, তারপর আইন বিভাগের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

মিষ্টার সেন সেই নিউজ এজেন্সীর ক'লকাতার অফিসকে জানালেন সেই সংবাদ দাতাটীকে হাজির করাবার জন্তে। সে ক'লকাতায় পৌছবার আগেই অবনী ক'লকাতায় ফিরে এল তাই মিষ্টার সেন তাকে সব কথা বললেন না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত ঠিক হয়ে যায় তিনি অবনীকে ভরসা দিতে চান না।

ব্রজেশ দত্তর সম্বন্ধে খোঁজ করবার ভার যার ওপর পড়েছিল তার পক্ষে মালতীব সন্ধান পাওয়া শক্ত হল না। মালতী যে কথা অবনীর কাছে গোপন করেছিল তা গোয়েন্দার কাছে চেপে রাখতে পারলে না। পুলিশ তাকে ক'লকাতা ছেড়ে যেতে বারণ করলে, একটু নজরও তার ওপর রাখলে। মালতী বুঝলে ব্রজেশ ধরা পড়বেই আর সেই সঙ্গে তার সম্বন্ধে সব কথা প্রকাশ হয়ে যাবেই। তার নিজের কিছু যায় আসে না কিন্তু মলিনার সমস্ত জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। তার উপকার করতে গিয়ে এতবড় সর্ব্বনাশ করবে একথা জানলে সে অবনীর সঙ্গে দেখা করত না। নিরুপায়ের একমাত্র সম্বল চোখের জল, মালতীরও সে ছাড়া অন্ত উপায় ছিল না।

মিষ্টার সেন একদিন হঠাৎ অবনীকে আইন বিভাগের সেক্রেটারীর

অফিসে ডেকে পাঠালেন। ও রকম জায়গা থেকে মিষ্টার সেন তাকে ডাকছেন শুনে সে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। জরুরী তলব, তখনি যেতে হল। সেখানে গিয়ে সে আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল মলিনা, কমল, সেই সংবাদদাতাটী আর ক'জন পুলিশ অফিসারকে দেখে। সেক্রেটারী তাকে দু' একটা প্রশ্ন করে বললেন, "আপনাকে যেটুকু কষ্ট দেওয়া হয়ে গেছে তার জন্যে আমরা দুঃখিত; আমরা মামলা উঠিয়ে নিচ্ছি, ওখানকার ইন্সপেক্টারের উপযুক্ত শাস্তি হবে।" অবনী যেন কথাগুলো ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না, সেক্রেটারীকে ধন্যবাদ দিয়ে বাইরে এসে মিষ্টার সেনকে বললে, "এ সব ব্যাপার কি?"

হাসতে হাসতে মিষ্টার সেন বললেন, "ব্যাপার আর কি, ভূত ছাড়াবার চেষ্টা; ব্যারিষ্টারী ছেড়ে রোজাগিরি করছি কিনা।"

কমল অবনীকে বললে, "মলিনাদি ফরিদপুরে একটা স্কুল মাষ্টারী পেয়েছেন।"

অবনী কিছু বলবার আগেই মিষ্টার সেন বললেন, "পেলেই যে করতে হবে তার কি মানে আছে? কি বল অবনী?"

অবনী বললে, "এতে আমার কি বলবার আছে?"

"কিছুই কি বলবার নেই? আচ্ছা, আমার আছে। দেখ মলিনা তুমি যে ছোট ছোট মেয়েদের মাথায় ও সব শ্রেণী-বিদ্বেষ ঢোকাবে তা হবে না। আমি বললাম বলে রাগ করলে না তো?"

মলিনা হেসে বললে, "না, রাগ করি নি। ছোট ছোট মেয়েদের কেন কা'র মাথায় আর ওসব ঢোকাব না, নিজের মাথা থেকেও তাড়াবার চেষ্টা করব, তাই চাকরি নিচ্ছি। তাছাড়া চাকরি না নিলেই বা আমার চলবে কি করে?"

"চাকরি নিয়ে খুব কম মেয়েরই চলে, তোমারও চলবে না। যাক্ সে

সব পরে ভেবে দেখা যাবে ; এক মাসের মধ্যে তোমার ক'লকাতা ছেড়ে যাওয়া হবে না ; রাজি থাক তো বল, নইলে পুলিশের কাছ থেকে একটা হুকুম জারী করিয়ে দি।"

মলিনা বললে, "ততদিন তো স্কুল চাকরি আমার জন্যে রেখে দেবে না ! চাকরি জোটান যে কত শক্ত, বিশেষতঃ আমাদের ..."

"রেখে দেয় কিনা সে আমি বুঝব, এতদিন তো নিজের মতে চলেছ এবার একটু পরের মতে চলে দেখ। তোমার বাবার বয়সী না হলেও বড় ভাইয়ের বয়সী তো বটেই। তোমার যাওয়া হবে না।" তাঁর এভাবে কথা বলার অর্থ কেউ বুঝলে না, অবনী ভাবলে তিনি যা করছেন ভালর জন্যেই করছেন, সে নিজেও চায় না মলিনা অতদূরে চলে যায়, মলিনা ভাবলে অন্যায় রকম জুলুম তার ওপর করা হচ্ছে, কমল কিছু ভাবলেই না।

মলিনাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে মিষ্টার সেন অবনীকে নিয়ে তাঁর বাড়ী ফিরে এলেন। লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে বললেন, "তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে, আশা করি আমার কাছে কোন কথা লুকোবে না। তুমি কি অলকাকে আজও ভালবাস ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবনী বললে, "এ কথার জবাব দেওয়া খুব কঠিন। একদিন তাকে সমস্ত অন্তরের সঙ্গে চেয়েছিলাম এ কথা যেমন সত্যি, আজ তাকে চাই না এ কথাও তেমনি সত্যি কিন্তু ভালবাসি কিনা তা ভেবে দেখবার সুযোগ পাই নি। আমি চেয়েছিলাম সে তার বিবাহিত জীবনে সুখী হোক।"

"ঐতেই হবে। এ বার তুমি কি করবে ? অন্ততঃ হতাশ প্রেমিক হয়ে থাকতে নিশ্চয় রাজি নও ?"

"কিছু এখনও ঠিক করি নি।"

"যদি বলি ঠিক করেছ কিন্তু নিজের কাছে স্বীকার করবার সাহস তোমার নেই ?"

হাসতে হাসতে অবনী বললে, "রোজা থেকে শেষে মনস্তত্ত্ববিদ্ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন যে।"

"তোমাদের কাঁধে চাপে আধুনিক ভূত তার জন্যে আধুনিক রোজা দরকার। আচ্ছা, মানুষকে তার নিজের দোষ ত্রুটী দিয়ে বিচার কব, না তার আত্মীয়-স্বজনের দোষ ত্রুটী দিয়ে বিচার কর ?"

"নিশ্চয় তার নিজের দোষ ত্রুটী দিয়ে কিন্তু এ সব কথা কেন ?"

"এমনি জিগেস করলাম, তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হয় কিনা দেখছিলাম। আচ্ছা, তোমার মা তোমায় নিশ্চয় খুব ভালবাসেন, আর তোমার সুখের জন্যে সব রকম ক্ষতি স্বীকার করতে পারেন ?"

"সব মা-ই পারেন. কিন্তু এ সব কথা জিগেস করছেন কেন ?"

"আজ শুধু আমি জিগেস করে যাই তুমি জবাব দাও, পরে একদিন তুমি জিগেস কোব আমি জবাব দোব।" অবনীর ভয়ানক কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু এর পর আব কিছু জিগেস করতে পারলে না। মিহার সেন হঠাৎ আক্রমণ করার মত জিগেস করলেন, "মলিনাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে ?" অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবনী জবাব দিতে পারলে না, নিজের মন যাচাই করে দেখবার চেষ্টা করলে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল ; সে বললে, "কখন ভেবে দেখি নি। আপনি কি করে ধরে নিলেন আমি বিয়ে করতে রাজি থাকলেই সেও রাজি থাকবে ?"

"বলেছি তো, আজ তুমি কোন প্রশ্ন করবে না। অন্ততঃ ধরে নিতে পারি তাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি নেই ?"

"ভেবে দেখতে হবে।"

"বেশ আজ সারা দিন রাত ভেবে দেখে কাল আমায় জানিও।" অবনী

স্বীকার করে চলে গেল কিন্তু যতবার স্থির হয়ে ভেবে দেখতে চেষ্টা করলে, তার সমস্ত ধারণা গোলমাল হয়ে যেতে লাগল।

সকালে উঠে কাগজ খুলে প্রথমেই অবনীর নজর পড়ল বড় বড় অক্ষরে ছাপা, "বিখ্যাত শ্রমিক নেতা ব্রজেশ দত্ত গ্রেপ্তার—উনিশ বছর আগে মালতী নামে একটী মেয়েকে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগ—ব্রজেশ দত্তর আসল নাম সুরেন ঘোষ বলিয়া প্রকাশ।" সমস্ত বিবরণ পড়া শেষ হবার আগেই মিষ্টার সেন তাকে ফোন্ করে এগারটার সময় আদালতে যেতে বললেন, সেইদিনই ব্রজেশকে আদালতে হাজির করান হবে।

আদালতে গিয়ে অবনী দেখলে অসম্ভব জনতা। অনেক কষ্টে ভেতরে গিয়ে দেখলে মলিনা, মালতী, রেণুকা, কমল আরও অনেক আছে। মালতীকে সাক্ষ্য দিতে হল। পাবলিক্ প্রসিকিউটার তাকে দিয়ে সব কথা বলিয়ে নিলেন, শুধু মলিনার সম্বন্ধে কোন কথা তুললেন না, এ মামলায় তার কোন প্রয়োজন ছিল না। আরও জন কতকের সাক্ষ্য হয়ে যাবার পর ব্রজেশ দত্ত তার জবানবন্দি দিতে আরম্ভ করে সমস্ত অস্বীকার করে বললে, "আমি মালতীর শ্বশুর বাড়ীর পাশেই থাকতাম। বিধবা হবার পর একটী ছোট মেয়ে নিয়ে সে গৃহত্যাগ করে সে কথা আমি জানতাম। তারপর তাকে দেখি মলিনাদের হোষ্টেলে, সেও আমায় দেখেছিল। পরে সে আমার সঙ্গে শ্রমিক অফিসে দেখা করে বলে সে তার মেয়ের ভাল বিয়ের ঠিক করেছে, আমি যেন কোন কথা প্রকাশ না করি। পাত্রটী আমার বিপক্ষ হলেও তাঁর ওপর এত বড় প্রতারণা হয় এ আমি চাইনি তাই মালতীকে এ বিয়ে বন্ধ করতে বলেছিলাম, সে রাজি হয় নি।"

পাবলিক্ প্রসিকিউটার বললেন, "ধর্ম্মাবতার এ মামলায় এ সব কথার কোন দরকার নেই। মালতীর মেয়ে বা তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে আমাদের

মামলার কোন সম্পর্ক নেই।" ব্রজেশ বুঝেছিল তার বাঁচবার কোন আশা নেই তাই মলিনা-মালতীর যতটা পারে ক্ষতি করবার চেষ্টায় সে বললে, "আমার কথা এখন শেষ হয়নি। আমি রাজি হইনি বলে আমায় জব্দ করবার জন্যে মালতী পুলিশের কাছে আমার নামে মিথ্যে কথা বলে। সেই পাত্রটী অবনী গুপ্ত ব্যারিষ্টার·· ·· " পাবলিক্ প্রসিকিউটার আপত্তি করতে ওঠার সঙ্গে, সঙ্গে ব্রজেশ বললে, "আর মালতীর মেয়ে হচ্ছে·· ·· মালতী চীৎকার করে উঠল, "থাম।" আদালতে গোলমাল আরম্ভ হল, সার্জ্জেণ্ট সকলকে চুপ করতে বললে। হাকিম বললেন, "এ সব কথা বলবার কোন দরকার নেই; নিজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে যেটুকু দরকার তা ছাড়া আর কিছু বলা চলবে না।"

ব্রজেশ বললে, "আমি প্রমাণ করব দরকার আছে। অবনী বাবু যার জন্যে অলকাকে ছেড়েছেন, তাঁর সেই ভাবী স্ত্রী হচ্চে এই কুলটার মেয়ে মলিনা।" মালতী মাথা নীচু করলে, মলিনা অবাক হয়ে ব্রজেশের দিকে চেয়ে রইল, অবনীর মনে হল তার অনেক আগে বোঝা উচিত ছিল। হাকিম সার্জ্জেণ্টকে আদেশ করলেন ব্রজেশকে নামিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। মলিনা মালতীর কাছে উঠে গিয়ে বললে, "তুমি আমার মা? এতদিন এ কথা বলনি? কলঙ্কিনী হলেও তুমি আমার মা।" মিষ্টার সেন তাদের কাছে এসে বললেন, "উঠে এস মলিনা, আদালতের বাইরে চল।"

আদালতের বাইরে এসে মিষ্টার সেন মলিনা আর মালতীকে তাঁর গাড়ীতে তুলে দিয়ে অবনীকে সেখানে ডেকে জিগেস করলেন, "কাল যার জন্যে সময় নিয়েছিলে তার জবাব?"

অবনী বললে, 'আমি তো বলেছি মানুষকে তার নিজের দোষ ত্রুটী দিয়ে বিচার করি।"

"আর একটু স্পষ্ট করে বল!"

"অতীতের জীবনের ওপর যবনিকা ফেলে মলিনা যদি নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে চায়, আমি তার সঙ্গী হতে রাজি আছি।"

মালতীর চোখে জল এল ; মলিনা কিছু বুঝতে না পেরে মিষ্টার সেনের দিকে চেয়ে রইল। মিষ্টার সেন বললেন, "বেশ মেয়ে তো তুমি! এমন একটা ভাল বিয়ের ঠিক করে দিলাম একটা প্রণামও করলে না ?"

মলিনা গাড়ী থেকে নেমে এসে তাঁকে প্রণাম করে উঠতে মিষ্টার সেন বললেন, "আরে অবনীকে একটা প্রণাম কর, করতে হয়।" মলিনা অবনীকে প্রণাম করলে তারপর অবনী আর মলিনা উভয়ে মিষ্টার সেনকে প্রণাম করলে। মিষ্টার সেন বললেন, "তাহলে মলিনা কথা রেখেছি, স্কুল মাষ্টারীর চেয়ে ভাল চাকরী তোমার জোগাড় করে দিয়েছি। চল অবনী তোমার মা'র কাছে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলে আসি।"

মালতী কিছুতেই সেখানে যেতে রাজি হল না, বললে, "আমায় হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে দিন। মলিনা এতদিন জানতিস তোর মা নেই, এখনও তাই জানবি : দূর থেকে আমি তোদের মঙ্গলের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।"

অলকা আর দ্বিজেন সেখানে এসে হাজির হ'ল ; অলকা বললে, "তাহলে আমি অন্যায় সন্দেহ করি নি, কি বল মলিনা ?"

সমাপ্ত